১

মা গো মা— তোর বালক আইল বনে,
শত্তুর-দুশমন দমন করে রাখিস ছি-চরণে—

জঙ্গলের মুখে আইট একটা। উঁচু জায়গা—কোটালের সময়েও জোয়ার-জলে ডোবে না। ঢেউয়ের আঘাতে আইটের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়ছে—প্রতি বছরই গাঙের নিচে দশ-বিশ হাত তলিয়ে যাচ্ছে। এমন খাড়া এদিকটা যে নৌকা ঘুরিয়ে লা-ভাঙার খালে না নিয়ে ডাঙায় ওঠা মুশকিল।

সন্থ ভেঙে-পড়া ঐ সব জায়গায় নজর করে দেখলে পাতলা-পাতলা সেকেলে ইট চোখে পড়বে। মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। ইট রয়েছে যখন, বসতি ছিল নিশ্চয়। মানুষ ছিল, ঘরবাড়ি ছিল, মানুষের সুখ-দুঃখ ছিল। এখন কিছু নেই—হেঁতাল ও বলাঝোপে সমাচ্ছন্ন ভূমি-প্রান্তে নোনা জলের ঢেউ দিনরাত আছাড়ি-পিছাড়ি খায়।

ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে অনতিদূরে ফাঁকার মধ্যে এক বকুলগাছ। বকুল এই অঞ্চলের গাছ নয়—কেমন করে এখানে এল, তার কোন পাকা ইতিহাস নেই। বাড়-বৃদ্ধি নেই বকুলগাছের—ফুল-ফল ধরে না, নতুন একটা ডাল গজাতে দেখা যায় নি বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে।

বনবিবি-তলা এটি। বাদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। এই একটি কেবল নয়—বনের এখানে-সেখানে তাঁর অনেক আস্তানা। জঙ্গলে ঢুকবার আগে বাওয়ালিরা থানে এসে সিন্নি মানত করে,

পূর্ব-প্রতিশ্রুত মানত শোধ দিয়ে যায়। কেউ জীবন্ত মুরগি ছেড়ে দিয়ে যায় দেবীর তুষ্টির জন্য, কেউ বা বকুলগাছের গোড়ায় নিরামিষ ছাঁচ-বাতাসা সাজিয়ে দেয়। প্রতি বছর চৈত্র-পূর্ণিমার দিন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সমারোহে দেবীর পূজা হয় এখানে। বছরের মধ্যে এই বিশেষ একটি দিন। দূর-দূরান্তর থেকে বিস্তর লোক জমায়েত হয়। আমোদ-স্ফূর্তি হয়। আলো-আলোময় হয়ে যায় জঙ্গলরাজ্য।

এইবারের পুজোয় ভারি জাঁকজমক। আটটা ঢাক এবং তিনটে ঢোল-কাঁসি। ধামা ধামা বাতাসার হরির লুঠ। পাঁঠা পড়েছে পনেরটা—রক্তের স্রোত গড়িয়েছে বনবিবি-তলা থেকে প্রায় লা-ভাঙা অবধি। কবন্ধ পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে মহাপ্রসাদ এক পাশে চাঙারি ভরতি করে রেখেছে—পূজা অন্তে বখরা হ মাতব্বরদের মধ্যে।

পূজার মতো পূজা। একা মধুসূদন রায় পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কম পড়ে যায়—ভাবনার কি আছে—আরও দেবেন তিনি। যে-সে লোক নন মধুসূদন—রামনিরঞ্জন রায় নবাব সরফরাজ খাঁর দেওয়ান ছিলেন, সেই সুবিখ্যাত বংশের ছেলে। বিত্তেও নাকি অঢেল—কিন্তু আলাপে আচরণে ধরতে পারবে না। ভাইরা কলকাতায় থাকেন। মাটিতে পা দেন না তাঁরা—গাড়িতে যোরেন, গাড়ি থেকে নেমে পালিশ-করা উঠোন-মেজের উপর দিয়ে দোতলা-তেতলায় উঠে যান। মধুসূদন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়ে রায়গ্রামের পৈতৃক বাড়ি এবং এই বনবিবি-তলার অনতিদূরবর্তী মৌভোগের কাছারিবাড়িতে পড়ে থাকেন অধিকাংশ সময়। জঙ্গল হাসিল করে চাষবাসের ব্যবস্থায় মেতে আছেন। এমন দরের লোক, তা বলে বাছবিচার নেই। চাষা-ভুষোর আসরে বসে হল্লা

করেন। মন্দ লোকে আরও নানা রকম রটনা করে। তাঁর জন্যে একখানা পিঁড়ি বা জলচৌকি—সকলের সঙ্গে এইটুকু মাত্র স্বাতন্ত্র্য।

সম্প্রতি আর একজন এসে জুটেছেন—মতিরাম সাধু। সাধু ব্যক্তি সত্যিই, পুজো-আচ্চার ব্যাপারে মুক্তহস্ত। মায়ের কৃপাও আছে তাঁর উপর—সচ্ছল সংসার, কোন রকম অভাব-দৈন্য নেই। বনবিবির পূজা এবং আনুষঙ্গিক সকল ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে বাজি পোড়ানো হবে—এই প্রস্তাব এবং যাবতীয় ব্যবস্থা মতিরাম করেছেন। খরচপত্র তাঁরই। বাজি পরমাশ্চর্য বস্তু। নামই শুনেছে সকলে, চোখে আর দেখেছে কজন? মায়ের পূজা তো ফি বছর হয়ে থাকে কিন্তু এত বেশি ভক্তের সমাবেশ (দোহাই মা, দোষ নিও না) দেখেছ কেউ কখনো?

আরও আছে। বাজির আগেই সেটা। কুস্তির পাল্লা হবে। পুরন্দর ও লা-ভাঙার মোহনায় নোনা-ওঠা চৌরস চরের উপর খানিকটা জায়গায় গরানের বেড়া দেওয়া। পূজা শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এল—যত মানুষ তখন ভেঙে পড়ল এদিকে। মেয়েলোকও কিছু কিছু জুটেছে—ছায়ার দিকটায় একধারে একটু আলাদা মতো হয়ে তারা দাঁড়িয়েছে। ঢাকের বাজনা বন্ধ,—তিনটে ঢোল বাজছে শুধু এক তালে। কাঁসি খ্যান-খ্যান করছে। লম্বা এক বাঁশের মাথায় অনেক উঁচুতে টাঙানো পিতলের কলসি—পড়ন্ত রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। সকলকে যে হারাতে পারবে, এ কলসি তার। যারা হারবে, তারাও যে একেবারে খালি-হাতে ফিরে যাবে, তা নয়—এক-একখানা লাল গামছা দেওয়া হবে প্রত্যেককে।

ঘেরা জায়গায় এক প্রান্তে মাদুর পেতে দিয়েছে—মতিরাম সাধু ও মধুসূদন রায় সেখানে বসেছেন। এঁরা বিচারক। আর এক-

দল লোক লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—কুস্তির মধ্যে যদি মারামারির উপক্রম হয়, সামাল দেবে। বেড়াও ঐ কারণে—কুস্তিগিররা মারামারির মুখে দর্শকজনের মধ্যে এসে না পড়তে পারে!

তবে কথা দাঁড়াচ্ছে, মারামারি করবে কারা? তাগত আছে ঐ রোগা পুঁটকে লোক দুটোর—যারা মল্লক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? জানুতে থাবা মেরে যখন প্রতিপক্ষকে তারা আহ্বান করছে, আর পায়তারা কষছে—হাসি চেপে রাখা দায়। পা হড়কে পায়তারার মুখেই পড়ে যাচ্ছিল একজন—ছোকরা ঢুলিটা আর পারে না, বাজনা থামিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

হাসো কেন?

পড়ে যাচ্ছ—আমি বলি ওস্তাদ, লাঠি-নড়ি একটা কিছু দিয়ে দাঁড়াও—

বলেই জোরে জোরে বাজিয়ে উঠল। গরম হয়ে লোকটা কি গালিগালাজ করল, কারো তা কানে গেল না। হাসির লহর বয়ে গেল চারিদিকে।

তড়াক করে বেড়া টপকে ভিড়ের একজন বিচারকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি লড়ব এক হাত—

মধুসূদন বললেন, বেশ তো! নামটা কি বলো—

কেতুচরণ ঢালি—

খাতায় লেখা হল কেতুচরণের নাম। মতিরাম বলেন, ওধারে ঐ বাইরে গিয়ে দাঁড়াও বাপু। আর কে কে লড়বে—ভিতরে আসতে হবে না, ঐখান থেকে নাম বলো। পর পর ডাক পড়বে।

শেষটা বিষম জমে উঠল। বুড়োরাও ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে, দু-দশ বছরের মধ্যে এমন খেলা দেখে নি কেউ। মুহুর্মুহু বাহবা দিচ্ছে। প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে আসছে বনস্থলী থেকে। আকাশ বুঝি ফেটে যাবে!

পূজা উপলক্ষে সাঁকো বাঁধা হয়েছে লা-ভাঙার খালে। নিতান্তই অস্থায়ী সাঁকো—তোড়ের মুখে থাকবে না—আজকের দিনটেই যদি ভালোয় ভালোয় টিকে যায়, খুব রক্ষা। নইলে লোকজনের পারাপারে কষ্টের অবধি থাকবে না। ভর সন্ধ্যা। পূর্বাকাশে থালার মতো পরিপূর্ণ চাঁদ দেখা দিয়েছে। কলসি জিতে নিয়ে কেতুচরণ সাঁকো পার হয়ে এল।

মধুসূদনের বন্দোবস্ত-নেওয়া লাট এপারে। বাদা একবার কাটা হয়েছে; ছিটে-বন জন্মেছে। আগামী বছর আর এক কাটা দিয়ে ধান ছড়ানো হবে। অল্পস্বল্প জন্মাবে। পুরো হাসিল হতে এখনো তিন-চার বছর। বেশিও লাগতে পারে—ঢেউয়ের মুখে মাটির বাঁধ কতটা টিকবে, সমস্ত নির্ভর করছে তার উপর।

সদ্য মাটি-ফেলা সঙ্কীর্ণ বাঁধের উপর দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিল কেতু। পায়ের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! সেই মেয়েটা—ভিড়ের মধ্যে অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কুস্তির প্রাণান্তক প্যাঁচ-কষাকষির মধ্যেও কেতু লক্ষ্য করেছে। হাজার জনের মধ্যেও চোখ পড়ে যায়, এমনি মেয়ে। হাত বাড়ালে ধরা যায়—এত কাছে—পিছন পিছন আসছে। কতক্ষণ এমনি আসছে, কে জানে?

কে গো ?

আমি—

আমি বললে কি চেনা যায় ?

নাম যদি বলি এলোকেশী দাসী, তাতেই বা কি চিনবে গো ? মতিরাম সাধু হলেন আমার ঠাকুর। উই যে মৌভোগ—ঐ গাঁয়ে বাড়ি আমাদের।

জঙ্গলের ধারে ধারে নূতন বসতি গড়ে উঠছে। এলোকেশী একদিকে আঙুল দেখাল। দেড়-ক্রোশ দু-ক্রোশ দূর তো হবেই।

কেতুচরণ বলে, সোমত্ত মেয়ে একটা চলেছে, ডর লাগে না ? সাধু মশায় ছেড়ে দিলেন যে বড় !

টের পেয়েছেন কিনা ? রায়বাবুর সঙ্গে কি রকম জমে গেছেন, দেখলে না ? কত রাত অবধি চলবে—আমি বাপু বসে থাকতে পারি নে, ভাল লাগে না। তুমি যাচ্ছ দেখে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে এসেছি।

হেসে উঠল এলোকেশী। হাসি ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে যেন নির্জন বনভূমির মধ্যে। হু-হু করে গাঙের হাওয়া আসছে—চুল উড়ছে এলোকেশীর, আঁচল উড়ছে।

কেতু বলে, ধরো—আমি যদি কোন রকম বে-ইজ্জতি করে বসি এখানে। কার কেমন রীতিপ্রকৃতি, উপর দেখে তো জানা যায় না ?

এলোকেশী আরও হাসতে লাগল।

তা পারো বোধ হয় তুমি। কী রকম দেখালে—উঃ ! ধোপার ঘাটে কাপড় আছড়াবার মতো বেটাদের আছড়াতে লাগলে। মেয়েমানুষ আমি—আমার তো কথাই নেই।

প্রতিযোগীদের এক-একটাকে ধরে কেমন জব্দ করেছে, সেই

সব গল্প চলতে লাগল। নিজের বীরত্বের ব্যাখ্যানে কেতুচরণ বা
খুশি। পথ দেখে চলছে না এলোকেশী, কেবল বকবক করছে
বাঁধের উপর পা ফসকে পড়ে গেল সে হাত দেড়েক নিচে পাশে
জমির উপর। বসে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকেছে।

কেতু বলে, কি হয়েছে? লাগল?

নাক-মুখ ছিঁড়ে গেছে হরগোজা-কাঁটায়। উ—হু-হু—

কাতরাচ্ছে, ঠোঁটে তবু হাসির রেশ। হরগোজা-ঝোপ আছে
বটে, কিন্তু এ একেবারে গা বাঁচিয়ে হিসেব করে পড়া। জ্যোৎস্না
ঝিকমিক করছে মুখের উপর। তবু কিন্তু কেতু ঠাহর করতে পারে
না। কি হয়েছে তার—চোখে দেখছে ঠিকই, কিন্তু দেখেও যেন
বুঝতে পারে না কোন-কিছু। আন্তরিক সমবেদনার সঙ্গে সে নিচু
হয়ে ভাল করে দেখতে যায়।

এলোকেশী সরে বসল।

বেগার-দেওয়া দেখা দেখতে হবে না—

বেগার-দেওয়া হল কি করে?

বকের মতো উঁচু হয়ে অদ্দূর থেকে দেখা যায় নাকি? তুমি
যাও গো যেমন যাচ্ছিলে, চলে যাও—দাঁড়ালে কেন?

কেতু অতএব বাঁধ থেকে নেমে সামনে এসে উবু হয়ে
বসল।

দেখ, দেখতে পাচ্ছ—রক্ত বেরিয়ে গেছে এই দেখ।

ছুটো আঙুল গালের উপর বুলিয়ে চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে
ঘুরিয়ে এলোকেশী রক্ত দেখছে। কেতু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।
কিন্তু সেটা প্রকাশ করে বলা চলে না। বরঞ্চ বিশেষ সহানুভূতি
দেখানোই উচিত।

আ-হা-হা—

কিন্তু তাতেও এলোকেশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

উড়ো-দরদে কাম নেই। আমি হাঁড়ি-মুচি না কালো-কুচ্ছিৎ যে বিশ হাত দূরে অমন করে গিয়ে বসেছ ?

বিশ হাত কেন—ব্যবধান বোধ করি বিশ ইঞ্চিও নয়। অকস্মাৎ এলোকেশী এক কাণ্ড করে বসল—কেতুর দু-চোয়াল সজোরে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এলো একেবারে নিজের মুখের কাছে।

দেখতে পাচ্ছ না—কানা নাকি তুমি ?

দু-হাতের বজ্র-আঁটুনি সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে। বলে, দেখ—

দেখবে কি কেতুচরণ—সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দুঃসাহসী মেয়েটার রকম-সকম দেখে। একবার মনে হল, বাঘিনী ধরেছে তাকে। হিংস্র বটে, কিন্তু অতি মনোরম বাঘিনী।

হেসে উঠে হঠাৎ এলোকেশী ছেড়ে দিল কেতুকে। দিয়ে ভালমানুষের মতো বাঁধের ওধারে সরে বসতে যায়। কেতুচরণের রক্ত গরম হয়েছে, কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সে-ই বাগ মানবে না এখন। এত গৌরবের পিতল-কলসি পায়ের আঘাতে গড়িয়ে পড়ল—ছুটে গিয়ে ধরল এলোকেশীকে। কোমল এক-তাল কাদার মতো দু-হাতে চেপে ধরেছে। পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে অবহেলায়।

এইবার ?

এ কি কাণ্ড! কি কৌশলে ছিটকে পড়ে এলোকেশী জোড়-পায়ে লাথি দিল কেতুকে। আচমকা আঘাতে কেতু ভুঁয়ে পড়ে গেল। হি-হি করে উচ্চ হাসি হাসে এলোকেশী। বাঁধ-ভাঙা

বন্যার মতো হাসির স্রোত। বেকুব হয়ে কেতু গায়ের ধুলো ঝাড়ে। রাগও হচ্ছে তার।

পারলে না কিন্তু। আমি জিতলাম। একেবারে চিত হয়ে পড়েছ, পুরোপুরি হার হয়ে গেল। চালাকি আমার সঙ্গে?

কেতুচরণ এত সহজে হার স্বীকার করবে? আর এক-হাত সে লড়তে চায় বুঝি! এলোকেশী পালাচ্ছে। দৌড়, দৌড়। ছোট ছেলে-মেয়ে যেমন কুমির-কুমির খেলে, সেই রকম। ঝুপসি-ঝুপসি গেঁয়োগাছ—তারই মাঝে এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছে। বসে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে।

আর পেরে উঠছে না—হাঁপাচ্ছে এলোকেশী। চেঁচিয়ে ওঠে আর্তকণ্ঠে। চিৎকার শুনে কেতুচরণ থমকে দাঁড়ায়। এলোকেশী বলছে, তুমি নচ্ছার, অতি বজ্জাত—

সোঁ করে একটা হাউইবাজি উঠল আকাশে। লাল সাদা সবুজ তারা কাটছে। বনবিবি-তলায় বাজি পোড়ানো শুরু হল তবে এইবার! আনন্দে এলোকেশী হাততালি দিয়ে উঠল।

বাঃ, বাঃ—

কখন কেতুচরণের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণের এত ব্যাপার—কিছুই আর মনে নেই। হঠাৎ শিউরে খানিকটা দূর পিছিয়ে যায়।

মাগো! বাজির আগুন গায়ের উপর পড়বে না তো?

কেতুচরণ বলে, বাজি না দেখে ফিরে যাচ্ছ যে

তুমি যাচ্ছ কেন?

আমার সঙ্গে তোমার পাল্লা? আমি থাকি সাঁইতলায়—হয়তো বা এখনই ধর্মখেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ফলুইমারি সাঁতরে পার

হতে হবে। তারপর যদি গিয়ে দেখি, খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে—আস্ত এক-এক কুম্ভকর্ণ তো—সারা রাত তা হলে পেটে কিল মেরে গোয়ালঘরে পড়ে থাকতে হবে।

এলোকেশী বলে, আমারও সেই বিত্তান্ত। গিয়েই হাঁড়ি-বেড়ি ধরব। নইলে এক-সংসার লোকের নিরম্বু উপোস।

কাঁচাবয়সি মেয়ের ভারিক্কি কথায় কেতুচরণের বড় কৌতুক লাগে।

সংসারের গিন্নি নাকি তুমি?

হুঁ—। যে দিকটা না দেখব, একখানা অনাছিষ্টি ঘটিয়ে বসে আছে। আর পারি নে বাপু! চু-উ-উ—

দায়িত্বের কথা স্মরণ হতেই বিচলিত গিন্নি দৌড় দিল। দম ধরে ছুটেছে কপাটি-খেলার মতো। অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে—তবু ভ্রমরের একটানা গুঞ্জনের মতো মিষ্টি আওয়াজটা ভেসে আসছে। মুগ্ধ কেতুচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। সবিস্ময়ে ভাবে, মানে কি মেয়েটার হঠাৎ এইরকম সঙ্গ নেওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার? কেতু সকলকে হারিয়েছে—কেতুকে হারিয়ে দিয়ে আমোদ পেতে চাইল? তা হারিয়ে দিয়েছে ঠিকই।

গুঞ্জন অনেকক্ষণ আর শোনা যায় না। চৈত্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সেই বনঝোপের ধারে কেতু তবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা পথ যেতে হবে, সে কথা আর মনে নেই। বনবিবির জকার উঠছে ঘন ঘন—উৎসব শেষ হল এতক্ষণে।

২

চৈত্র-পূর্ণিমায় দেবী নাকি ঐ বকুলতলায় চাক্ষুষ হয়েছিলেন। বাওয়ালিদের মুখে মুখে সেই গল্প। মধুসূদন রায়ের ম্যানেজার দুর্লভচন্দ্র হালদার জঙ্গল-কাটা ও বাঁধবন্দির রোজগণ্ডা মিটিয়ে দেবার সময় ঈশ্বরবৃত্তি খাতে জনপিছু দু-পয়সা চার পয়সা—এই রকম আদায় করে। সকলে স্বেচ্ছায় দিয়ে যায়। মাঝিরাও মর্জাল বনকর-স্টেশনে নৌকার কুত করবার সময় মায়ের নামে কিছু কিছু জমা রেখে আসে। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, মায়ের নামে দেওয়া একটি আধেলা কেউ এদিক-ওদিক করে না। বার্ষিক পূজায় সমস্ত খরচ করা হয়।

করুণাময়ী বনবিবি; বাদাবন তাঁর রাজ্য। হিংস্র বাঘ-কুমির ও দাঁতাল তাঁর কাছে পোষা মেষের মতন। খলসি ফুল, হেঁতাল ফুল, গরান ফুল—এই তিন ফুল ফোটে চৈত্রমাসে। তার মধু সঞ্চয় করে মৌমাছি। সাদা রং—এক এক ফোঁটা অবিকল মুক্তোর মতো। রেখে দিলে গড়িয়ে পড়বে না। সেই মধু মায়ের পুজোয় দাও, মা বড় খুশি হবেন! বাদাবনের এখানে সেখানে বনবিবির অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে আছে। দেড় হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া একটুখানি জায়গা মেপে নাও, হাতখানেক উঁচু গোলপাতার একটু ছাউনি করো, ঘরের সামনে উবু হয়ে বসে 'মা-মা' বলে ডাকো বার কয়েক—ব্যস, হয়ে গেল মায়ের মন্দির। ফুল যদি না-ই জোটাতে পারো, গরান-পাতায় পুজো কর, মা-জননী তাতেই তুষ্ট!

তবে বকুলতলার কথা হল আলাদা। এর নামডাক বেশি—অত্যন্ত জাগ্রত স্থান। উত্তর অঞ্চল থেকে যারা বাদাবনে আসে, তারা সর্বাগ্রে নৌকা বাঁধে এখানে—এই লা-ভাঙার মোহনায়। পুরুত-পাণ্ডা অথবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই, মায়ের বালক নিজেরাই গিয়ে বকুলতলার রজ সর্বাঙ্গে মাখে (অশীতিপর ঝুনো বাওয়ালি মায়ের কাছে বালকই)। বাদার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই মুহূর্তেই বাদা ছেড়ে চলে যাওয়ার বিধি—তিলার্ধ গড়িমসি করতে নেই, দেবী কুপিত হন তা হলে। এর পর আবার যখন আসে, আগের বারের মানত শোধ দিয়ে [illegible] জঙ্গলে ঢোকে।

বনবিবির করুণার অন্ত নেই। সাংঘাতিক রকম গোনাহ্ না থাকলে কেউ মরে না বাদায় এসে। বাদাবনের নীতি-নিয়ম তোমাদের জনসমাজের মতো নয়। সেই সব নিয়ম জেনে নাও আগেভাগে, সাবধান হয়ে প্রতিপালন করো, সাবধানে বেড়াও, কথাবার্তা সামাল হয়ে বলো—কোন ভয় নেই, মায়ের দয়া সব সময় তোমায় ঘিরে থাকবে। কাজকর্ম চুকিয়ে ঘরের মাণিক ঘরে ফিরে যাবে, কেউ কোন রকম ক্ষতি করতে পারবে না।

থানের মাহাত্ম্য বলছি, শ্রবণ করো। সেই যে দেবী প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন, সেই উপাখ্যান। ভক্তিযুক্ত হয়ে শুনবে। অবিশ্বাসী যদি কেউ থাকো, পুঁথি বন্ধ করো এখানেই।

মোম-মধু সংগ্রহের মরশুম হচ্ছে চৈত্রমাসের মাঝামাঝি থেকে পুরোপুরি জ্যৈষ্ঠ অবধি। নানারকম ফুল ফোটে জঙ্গলে, গাছে গাছে বিস্তর চাক হয়। মধুর প্রাচুর্যে চাকের রং ঘষা-কাচের মতো হয়ে ওঠে, টলমল করতে থাকে চাক। বাতাস এলে মধুর ভারে চাকের অংশ ভেঙেও পড়ে কখন কখন।

মউলেরা দলের পর দল এই সময় বাদায় ঘোরে। এক দল এসেছিল কেশবপুর অঞ্চল থেকে। সে অনেক দূর—জোয়ার মেরে উঠতে হয়, দু-তিনটে গোন লাগে। আকাশমুখো তাকিয়ে তাকিয়ে তারা ঘাড় ব্যথা করে ফেলল—আশ্চর্য ব্যাপার, মৌমাছি উড়তে দেখল না কোথাও। নিয়ম হচ্ছে, মৌমাছি দেখলেই বনবাদাড় ভেঙে তার অনুসরণ করবে। এমনি ভাবে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গাছের মাথায় চাকের আবিষ্কার হয়। কিন্তু মরশুমে এসে এমন ডাহা বেকুব আজ অবধি কেউ হয় নি। কি দোষে কি হচ্ছে—সকলের মন খারাপ—রাত্রিবেলা রান্নাবান্না করল না তারা, রান্নায় মন নেই। খালের মধ্যে নৌকো বেঁধে চুপচাপ শুয়ে পড়েছে।

ওদের মধ্যে নিমাই কপালি উৎকৃষ্ট গুণিন—নীতি-নিয়ম মেনে ষোল-আনা শুদ্ধাচারে থাকে। নিমাই স্বপ্ন দেখছে, ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ, মুলোর মতো দংষ্ট্রাপংক্তি, গালপাট্টা গোঁফদাড়ি—এক বিরাট পুরুষ বলছেন, মহামাংস খাই নি অনেক দিন—খাইয়ে তুষ্ট কর্, সব দোষ খণ্ডন করে দেবো। মধুর ভরা নিয়ে যাবি আমার বরে।

গুণিন বলল, জলে-জঙ্গলে ঘুরি, ধ্যান জানি নে, জ্ঞান জানি নে—কি করে পুজো করব, বিধান দাও ঠাকুর—

মহাভোগ ছেড়ে দিয়ে যাবি ডাঙার উপর। বাঘের মূর্তি ধরে আমি নেবো। তারপর যে বনে পা দিবি, মাথা তুলে দেখতে পাবি গাছে গাছে মধুর ভাণ্ডার। এক যাত্রায় দশ ক্ষেপের মধু নিয়ে যাবি।

গুণিন ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠল। ভরা পূর্ণিমা—আরণ্য রাত্রি দিনমানের মতো ফুটফুট করছে। দিনমান ভেবে পাখি

ডাকছে ডালে ডালে। তাড়াতাড়ি নিমাই সকলকে ডেকে তুলল, শলাপরামর্শ চলল অনেকক্ষণ ধরে।

দলের মধ্যে ফেলনা নামে বোকাটে ধরনের এক ছোকরা—কোন কাজের নয়। সে উঠল না কিছুতে, অঘোরে ঘুমুতে লাগল। তাকে জাগিয়ে তোলবারও অবশ্য প্রয়োজন নেই। ফেলনার মা দশ বাড়ি ধান ভেনে গোবর-মাটি লেপে দিন গুজরান করে। ফেলনা পালিয়ে চলে এসেছে, বুড়ি কিচ্ছু জানে না। বাদায় আসবার লোক জোগাড় করা কঠিন হয় অনেক সময়, ভয়ে সকলে আসতে চায় না। এদের দাঁড়ের লোক কম পড়েছিল—নিমাই কাপালিই ভুজুং-ভাজাং দিয়ে ফেলনাকে এনেছে। এনে ঠকেছে। ধরো, কোন মুল্লুক থেকে চাল-ডাল নুন-তেল, রান্নার জল, খাবার জল বয়ে আনতে হয়—তিন বেলা তিন কাঁসর ঐ দুষ্প্রাপ্য ভাত গিলছে, খাবার জলটুকু গড়িয়ে নেবার মুরোদ নেই, এক ফেরো খাবে তো তিন ফেরো জল ঢেলে ফেলবে। অকর্মার ধাড়িটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে তারা।

চোখ টেপাটেপি করে নিজেদের মধ্যে অবশেষে তারা সাব্যস্ত করল, ফেলনাকে দিয়ে দক্ষিণ রায়কে তুষ্ট করা যাক। কঠিন ব্যাপার কিছু নয়—যেমন গোগ্রাসে সে খায়, তেমনি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়। রাত দুপুরে গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে নামিয়ে বনের প্রান্তে রেখে দিলে টেরই পাবে না। বাঘরূপী দক্ষিণ রায় যথাসময়ে পরমানন্দে মুখে গ্রাস তুলে নেবেন, দাঁতের আঘাতে তখনই যদি তার কিছু সাড় হয় এক লহমার জন্য। গাঁয়ে ফিরে সত্যি কথাই বলবে তারা—ফেলনা বাঘের পেটে গেছে। এ কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়—অনেক ক্ষেত্রেই তো ঘটে এ রকম। ভালমতো মাল

যদি মেলে, তার থেকে কিছু মধু ও নগদ দু-পাঁচ টাকা ফেলনার মা বুড়িকে দিয়ে দিলে হাঙ্গামা মিটে যাবে।

তখন ঘন জঙ্গল বনবিবি-তলা এবং পুরন্দর ও লা-ভাঙার এপার-ওপার জুড়ে। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে ফেলনা। নৌকা এগিয়ে মোহনায় নিয়ে এল। কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছে এত বড় জাগ্রত স্থান এটা? রাতে বাদায় নামা বিধেয় নয়। কিন্তু নিমাই কাপালি মন্ত্র পড়ে বাঘবন্ধন করেছে। এ ছাড়া কাচের চৌখুপির মধ্যে টেমি জ্বলছে। আলোর নিকটে জানোয়ার এগোয় না। খুব সতর্ক হয়ে তারা নামল। আর বনের ভিতরে যাবারও প্রয়োজন হবে না। ভাঁটা সরে গেছে, ফেলনাকে চরের উপর ফেলে রেখে সরে পড়বে।

ধরাধরি করে নামাতে কিন্তু ফেলনা জেগে উঠেছে। এটা অভাবিত। বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি নিমাই সামলে নিল। বলল, লা বানচাল হয়েছে রে ফেলনা, জল উঠছে। নাম্ একটু—সবাই আমরা নামছি। জলটা সেঁচে ফেলব।

ঘুমের ঘোরে ফেলনা বুঝতে পারে নি—যেমন বলেছে, তেমনি সে নেমে দাঁড়াল। ভাল করে বুঝবার আগে এরা নৌকায় এক ধাক্কা দিয়ে বেশি জলে নিয়ে গেল। ভাটার খরস্রোতের সঙ্গে চারখানা দাঁড় পড়ে নৌকা যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

ফেলনা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। এতক্ষণে বুঝেছে এদের ষড়যন্ত্র। ভয় করছে।

চরের কাদায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, ফেলে যেও না—নিয়ে যাও তোমরা। আর অত ভাত খাবো না। যে কটা দেবে, চাইব না আর তার উপর।

দাঁড় টানার ছপছপানি হচ্ছিল, সে শব্দ ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে আর শোনা যায় না। জলের তরঙ্গে ঝিলিক দিচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো হয়ে বনপ্রান্তে সে দৌড়তে লাগল। হাপুস-নয়নে কাঁদছে হাঁদা ছেলেটা ; মায়ের কথা মনে হচ্ছে, আকুল হয়ে ডাকছে, মা-মা-মা—

শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখে, মানুষ-জন কেউ নয়—বাঘ। তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে—লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে এইবার।

মা গো—বলে মর্মান্তিক চিৎকার করে বকুলতলায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। তোমরা বলবে, ফেলনা যদি অজ্ঞান হয়েই থাকে, এ কাহিনী দশজনার কাছে প্রচার করল কে? প্রচার করেছে ফেলনাই। স্বপ্নে দেখেছে, তবু ব্যাপারটা সত্যি—নইলে বেঁচে আবার দেশে-ঘরে ফিরে এল কেমন করে, সে কথা বলো? দেখল, এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বকুলতলায় নেমে এলেন। মাথায় সোনার মুকুট ঝিকমিক করছে, পূর্ণিমার আলোর মতো ফুটফুটে গায়ের রং। ফেলনার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন তিনি। বাঘ মুহূর্তে পোষা কুকুরের মতো শুয়ে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে ফেলনার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। মধুর আবেশে তার সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে এল। জঙ্গলে হঠাৎ যেন কত ফুল ফুটেছে, চিত্তহরা মৃদু বাজনা বাজছে যেন চারিদিকে!

মেয়েটি হালকা পালকের মতো তাকে তুলে নিলেন। নিয়ে ঘাটের জলে নামলেন। প্রকাণ্ড আয়তনের কালো এক কাঠের গুঁড়ি ভেসে ছিল সেই জায়গায়। এখন জোয়ার আসছে, ভরা

কোটালের দুরন্ত দুর্বার স্রোত। গুঁড়ি দুলছে একটু একটু। সেই গুঁড়ির উপর ফেলনাকে শুইয়ে দিলেন। শিমুলের গুঁড়ি নাকি ? সেই রকম কাঁটা-কাঁটা। কাঁটা বিঁধছে ফেলনার পিঠে, উঃ-আঃ করছে। বুঝতে পারলেন দেবকন্যা। কাশের গোছা তুলে এনে বিছানার মতো পেতে দিলেন কাঁটার উপর। তারপর পরম যত্নে ফেলনাকে শুইয়ে একটা থাবড়া দিলেন গুঁড়ির গায়ে—

যা, চলে যা—

গুঁড়ি খরবেগে ভেসে চলল। ভাঁটা শেষ হয়ে গিয়ে জোয়ার—তবু উজান কেটে একমুখো ভেসে চলেছে। আবার জোয়ার এল। আবার ভাঁটা। চলেছে, চলেছে।

দু-দিনের পর বাড়ির ঘাটে এসে লাগল। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে ফেলনার মা বুড়ির চোখ অন্ধ হবার দশা। এমনি সময় পাড়ার কে যেন এসে বলল, ও বুড়ি, দেখসে এসে—ছাওয়াল তোর পালঙ্কে শুয়ে ভেসে ভেসে আসছে।

লোকারণ্য ঘাটে। জনতার কোলাহলে ফেলনার ঘুম ভাঙল। এত মানুষ—কিন্তু একজন কেউ জলে নামছে না তাকে তুলে আনতে।

ওরে ফেলনা, কিসের সওয়ার হয়ে এসেছিস ?

ফেলনা তাকিয়ে দেখে, গাছের গুঁড়ি নয়—সুবিশাল কুমির। কুমির চুপচাপ গা ভাসান দিয়ে আছে। ফেলনা নেমে এল, কুমির জলতলে অদৃশ্য হল ধীরে ধীরে।

এর অনেক দিন পরে মউলের দল ফিরল। কুমিরের সওয়ার ফেলনা তখন মায়ের নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে। যে শোনে, সে-ই অবাক হয়। সেই থেকে মহিমা প্রচার হল বনবিবির পীঠস্থান ঐ বকুলতলার।

বনবিবির অপার করুণা। বাদাবনে তাঁর রাজত্ব—বাদার এলাকায় প্রবেশ করার আগে সির্নি মানত করে যাও। বনের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভরা নিয়ে ফিরবে।

৩

সে রাতে সেই যে এলোকেশী গুঞ্জন তুলে ছুটে পালাল, কেতুচরণ তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে চলে গেছে। বিদ্যুতে যেন ঝলসে দিয়ে গেছে হিয়ে-মন-প্রাণ।

হিয়ে-মন-প্রাণ ইত্যাদি গোলমেলে বস্তুর খবরাখবর কেতুচরণ কস্মিনকালে রাখত না। সম্প্রতি কেবল কিছু কিছু শুরু করেছে উমেশের কাছ থেকে। সাঁইতলার মান্যধর মোড়লের ছেলে উমেশ—কেতু তাদের বাড়িতে আছে। দুর্বুদ্ধি হয়েছিল মান্যধরের—উমেশকে শৈশবে পাঠশালা পাঠায়। ফলে হতভাগাটা বাড়ির কাজকর্মে কোনদিন মন দিল না—গান গায়, ছড়া বাঁধে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে। মান্যধরের সে দুচক্ষের বিষ—রাগ করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিল একবার। কিন্তু একটিমাত্র ছেলে—কয়েকটা দিন না দেখে মন কেমন করতে লাগল। আবার উমেশ ফিরে এল। তারপর থেকে মান্যধর বিশেষ কিছু বলে না, সাঁইতলার মোড়লঘরের ছেলের অধোগতি পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে নীরবে নিশ্বাস ফেলে শুধু।

কেতুচরণ প্রায় সম্বিত হারিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বনমোরগের ডাকে চমক ভাঙল। মোরগ ডাকছে—সকাল হয়ে গেল নাকি? না—জ্যোৎস্নায় ভুল করে সকাল বলে ভেবেছে। বাদাবনে মোরগ অজস্র। লোকে মানত-করা মোরগ ছেড়ে দিয়ে যায়—বনবিবির সেই সব মোরগ বনে চরে বনমোরগ হয়ে গেছে। সকাল হবার আগে এদিকে-সেদিকে শুনতে পাবে, অগণন মোরগ ডাকছে। দিনমানেও যখন-তখন শুনবে। হঠাৎ ভুল হয়ে যায়, গ্রামে এসে পড়লাম নাকি? বনবিবির জীব, ধরে স্বচ্ছন্দে বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারো—বাধা নেই। যাবার সময় শুধু মুখের কথা বলে যেও, নিয়ে যাচ্ছি মা—। তারপর মুরগির ছা-বাচ্ছা হলে অর্ধেকগুলো বনে ছেড়ে দিয়ে যেও বনবিবির নামে। নিশ্চয় দিয়ে যেও, অবহেলা কোরো না। নইলে দেখবে, সমস্ত মরে যাচ্ছে—একটাও টিকে থাকবে না শেষ অবধি।

কেতু বাড়ি পৌঁছল, তখনও খানিকটা রাত আছে। জয়-করে-আনা সেই কলসি উঠানে নামিয়ে রাখল, ভারবোঝা নামিয়ে যেন বেঁচে গেল। ডাকাডাকি করল না কাউকে। চোখের ঘুম পেটের ক্ষিধে সমস্ত লোপ পেয়েছে, শুতে বসতেও মন চায় না। কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—উঠোন এবং বাইরের অনেক দূর অবধি ঘুরে ঘুরে সে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল।

মান্ধর কাশতে কাশতে সকলের আগে দোর খুলে বেরুল। জ্বলে উঠল কেতুকে দেখতে পেয়ে।

সেই যে দুপুরবেলা এক পাথর গিলে বেরিয়ে পড়লে—ব্যস, আর কোন পাত্তা নেই। কোন লাটসাহেবের দরবার আলো করে বসেছিলে বল দিকি বাপু?

কেতু ভালমন্দ জবাব দেয় না। কথা-কাটাকাটি করতে তার এখন রুচি নেই।

মাগুধর বলে, তিন বেলায় খোরাকি পাকি তিন সের লাগে—লাটসাহেব সেই ঝক্কিটা নিয়ে নিলে তো পারে। তাহলে আর কাজের কথা বলতে যাব না।

খোঁটার জবাবে কেতুচরণেরও বলার ছিল। বলতে পারত, এই যে ঘর ছাওয়া, ভুঁই নিড়ানো, হাটবাজার করা, যখন যা আটকাচ্ছে, সর্বকর্ম করে বেড়াচ্ছি—সে কি শুধু তিন বেলা রাঙা চালের ভাত আর গোটাকয়েক লঙ্কা-পোড়ার জন্য? আসল ব্যাপারে তো, বোঝা যাচ্ছে, একেবারে ফক্কিকার। নামে তালপুকুর, এখন আর ঘটি ডোবে না। রোসো, আবার কোন একটা সুলুকসন্ধান পেলে হয়। সুড়ুত করে সরে পড়ব, চোখ গরম করা বেরিয়ে যাবে। তোমার ঐ ছড়াদার ছেলেকে ভুঁই নিড়াতে বসিয়ে দিও, ঘাসে-ধানে যে তফাত বোঝে না—ধান মেরে সাফ করে ঠিক সে ঘাসগুলোই রেখে আসবে।

এসব কিছুই সে বলল না। দিন এলে তখন বলবে। বলে, সমস্ত সেরে-সুরে তো বেরিয়েছিলাম। গরুর জাবনা অবধি মেখে রেখে গিয়েছি। কোন কাজটা আটকে আছে শুনি?

আটকায় নি? কোটালে ঘোলাজল এসেছে। গাঁয়ের মানুষ কেউ বাড়ি-ঘরে ছিল না, বিকাল থেকে সবাই গাঙের ধারে।

সত্যি নাকি?

কেতু খবর শুনে বিচলিত হল। মনে মনে হায়-হায় করছে গ্রামে না থাকার জন্য। ঘোলাজল গাঙে হামেশাই আসে না—বছরে দু-চারবার মাত্র। এমনও হয়েছে, কোন বার আদৌ

আসে নি। দেদার চিংড়ি পড়ে ঘোলা জলে। অঞ্চল জুড়ে সাড়া জাগে।

সদুঃখে মাঝধর বলতে লাগল, ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ মারল সকলে, ঝোল-অম্বল-চচ্চড়ি-ভাজা খাচ্ছে, খটিতে দু-চার টাকার বিক্রিও করেছে। সারা গাঁয়ের মধ্যে আমরাই কেবল নিরামিষ খেলাম। করব কি, একজন বুড়ো থুথ্‌ড়ে আর একটি অকালকুষ্মাণ্ড—

অনুতাপে কেতু বিগলিত হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে বলে, একা ওমশা কি করবে, তার কি দোষ? একলা মানুষের কর্ম তো নয়! ডিঙি বাইবে না মাছ ধরবে? তা বেশ তো—একটা রাতের মধ্যে কি শেষ হয়ে গেল? এখনই রওনা হচ্ছি—

উমেশের মায়ের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে কৌতুককণ্ঠে বলে, ডয়াকলার কাঁদিটা কেটে রেখো মামি। দু-ভেয়ে বেরুচ্ছি। গলদা চিংড়ি আর ডয়াকলায় মজে ভালো।

রাতে উপোস গেছে—তবু ফ্যানসা ভাত রান্না হওয়া অবধি সবুর সইল না। কাঁচা-চিড়ে কোঁচড় ভরে নিয়ে তাই চিবোতে চিবোতে উমেশের সঙ্গে গাঙমুখো চলল। উমেশের কাঁধে বৈঠা ও ধ্বজি, কেতুচরণ খেপলা-জাল নিয়েছে। একটা টোকাও নিল, রোদ চড়ে উঠলে কাজে লাগবে।

তাই বটে, ঘোলা জলের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। নাম বটে ফলুইমারির গাঙ, কিন্তু আসলে বড় খাল একটা—নদী একে বলা চলে না। জলের ধারে যেন হাট বসে গেছে। কাল বিকাল থেকে চলছে—রাতের মধ্যে আরও জানাজানি হয়ে দূর-দূরান্তরের লোক এসে পড়েছে। কত নৌকা! নৌকা যাদের নেই, পারে দাঁড়িয়ে জাল ফেলছে। কিন্তু এখন আর মাছ পড়ছে না

তেমন। এত হৈ-চৈর মধ্যে বনের বাঘ পালিয়ে যায়, এ তো জলের মাছ।

উমেশ বোঠে ধরেছে, কেতু জাল বাইছে। দেড় প্রহর বেলা হল, এখনো একটা ঝুড়ি বোঝাই হল না।

উমেশ বলে, দূর দূর! এ কি হচ্ছে? কালকে গাদা-গাদা মেরেছে। এমন হল, শুনলাম, শেষটা খটিতেও আর নিতে চায় না—

আসবার মুখে স্বচক্ষে তার নমুনা দেখে এসেছে বটে! চারটে চিংড়ির খটি—মাছ শুকিয়ে তারা বাইরে চালান দেয়। গরানের আগুনে যেন অনির্বাণ রাবণের চিতা জ্বালিয়েছে। তবু দেখে এল, ঝুড়ি ঝুড়ি চিংড়ি বাইরে পচছে—এখনো তার ব্যবস্থা করতে পারে নি।

উমেশ প্রস্তাব করে, আর পারা যায় না—নৌকো বেঁধে একটু ছায়ায় গিয়ে বসা যাক—

উঁহু, দোখালায় চলো। দুদিক থেকে মাছ উঠে এক জায়গায় জমেছে।

ভাঁটার টান ধরেছে—কোটালের টান। উজান কেটে নৌকা দোখালায় নেওয়া শক্ত। কিন্তু দুই মরদ-জোয়ান রয়েছে, আর ঐটুকু এক ডিঙি। দরকার বুঝলে ডিঙি কাঁধে করে বয়েও তো খালে নিয়ে ফেলতে পারে!

দোখালায় এসে মাছ পাওয়া যাচ্ছে বটে—কিন্তু নিতান্ত গুঁড়ো-চিংড়ি। ঝুড়িখানেক এই বস্তু নিয়ে কেতু হেন লোক ঘরে ফিরছে, এর চেয়ে হাস্যকর কি হতে পারে? চিৎকার করে উমেশের মাকে যে গলদা-চিংড়ির আশ্বাস দিয়ে এল, তারই বা উপায় কি?

উমেশকে বলে, পাড়ে ধরো দিকি—

উমেশ পরমোল্লাসে বলে, সেই ভাল। গীত গাওয়া যাক গাছতলায় বসে বসে। যা হয়েছে, এতেই দু-বেলা বেশ চলে যাবে। আর দরকার কি?

কেতু বলে, তুমি গাও—আমি শুনি। শুনতে শুনতে আর এক রকমে চেষ্টা দেখি।

ধ্বজিটা হাঁটুর নিচে ধরে দু-হাতে চাপ দিল। মড়মড় করে ভেঙে গেল সেটা। বেশ দু-খানা লাঠির মতো হল। তার একটা হাতে নিয়ে টোকাটা মাথায় চড়িয়ে জলের কিনারে অতি সন্তর্পণে সে এগুচ্ছে।

উমেশ গান ধরেছে। কেতুচরণ গান শুনছে ঠিকই, কিন্তু নজর ওড়ার জঙ্গলের দিকে। জলের আবর্তে চিংড়ির দাড়ির রক্তাভ ক্ষীণ চিহ্ন ভেসে উঠছে এক একবার। অনভ্যস্ত চোখ কিছুই দেখবে না, আঙুল দিয়ে দেখালেও ধরতে পারবে না। কিন্তু কেতুর নজর জলের তল অবধি চলে যায়। দু-হাতে দিচ্ছে লাঠির বাড়ি জলের উপর চিংড়ির দাড়ি লক্ষ্য করে। আহত আধ-মরা মাছ চিত হয়ে পড়ছে। স্রোতে ভেসে যাবার আগে তাড়াতাড়ি খালুইতে নিয়ে তুলছে সেগুলো। বাছাই মাছ—খেপলা-জালে এ বস্তু কদাচিৎ ওঠে। যাক—নিশ্চিন্ত! মামি ডয়াকলার কাঁদি সত্যি সত্যি যদি কেটে থাকে, বৃথা যাবে না।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল। অনেক দূরে একটা বাঁকের মুখে কারা ডাকাডাকি করছিল পারে যাবার জন্য। মেয়েলি গলা। কেতুচরণের তত ইচ্ছা নয়—অনেকখানি উল্টো যেতে হবে। বেলা দুপুর, পরোপকার করতে গেলে বিস্তর দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু বোঠে

উমেশের হাতে—ঝপ-ঝপ করে বেয়ে পারার্থীদের কাছে সে চলে এল। গলা শুনে আন্দাজ করেছিল হয়তো। সামনাসামনি এসে উমেশ কেতুর গা টেপে।

পদ্ম—সেই যে…

পদ্ম, তার মা মুখ্যি-বুড়ি ও বড় ভাই পাঁচু। উমেশ পদ্মর গল্প সুগোপনে করেছে কেতুর কাছে। বনবিবির পুজো দেখতে কাল দল জুটিয়ে এরা গিয়েছিল। বাজি ইত্যাদি দেখে অনেক রাত হয়ে গেল বলে মৌভাগে কোন্ কুটুম্বের বাড়ি কাটিয়েছে। অনেকক্ষণ বসে আছে খাল-ধারে—একটা নৌকা কোন দিকে নেই, মাছ ধরতে সমস্ত ফলুইমারি গিয়ে জমেছে।

এই তবে পদ্ম? নিটোল কালো মেয়ে—আর যাই হোক, পদ্মফুলের রংটা কিন্তু পায় নি। কেতুচরণ ইতিমধ্যে ধাঁ করে টোকা ফেলে বড়-চিংড়ির খালুই ঢেকে দিয়েছে। লোভনীয় মাছ—সকলের চোখের সামনে আলগা রাখা উচিত নয়।

কিন্তু পদ্মর গতিক দেখ—তিন ক্রোশ পথ দিব্যি মেরে এল, আর ডিঙিতে পা দিয়েই ননীর পুত্তলি উত্তাপে গলে পড়েন। কেতু হাঁ-হাঁ করে ওঠে—কিন্তু তার আগেই সে হোগলার টোকা মাথায় দিয়ে মেমসাহেব হয়ে বসেছে।

এবং যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল—বাঃ, খাসা চিংড়ি তো! ধরলে বুঝি তোমরা?

উমেশ কেতুর মনোভাব বোঝে; ভয়ে ভয়ে সে তার দিকে তাকাল। কেতুচরণ কানে নেয় নি। তাড়াতাড়ি এখন আপদ-বালাইগুলোকে পারে পৌঁছে দিতে পারলে যে হয়।

পাঁচু স্পষ্টাস্পষ্টি চেয়ে বসল, জলের মাছ তো! খেতে দাও কটা আমাদের—

নির্জীব কণ্ঠে উমেশ একটা শব্দ করল, যার অর্থ হাঁ-না—দুই-ই হতে পারে।

পদ্ম মারমুখি হয়ে ওঠে—

না-না—মাছ-টাছ কেন দেবে? অত খাতির কিসের? একটুখানি এগিয়ে শুধু যদি বাড়ির ঘাটে আমাদের তুলে দিয়ে এসো—

উমেশ ঘাড় নিচু করেছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছে, ভাব দেখে বোঝা যায়। বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে, তার উপর, কেতু আপত্তি করে উঠল।

বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে, এখন পেরে উঠব না—

পদ্ম সুর নরম করে বলল, সে-ও গেরস্তবাড়ি গো! ক্ষিধের উপায় হবে। সত্যি, আর পারা যাচ্ছে না—হেঁটে হেঁটে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।

ফিক করে সে হেসে ফেলে। আজব মেয়ে—এই মেঘ এই রৌদ্র খেলা করে তার মুখে—

উমেশও জুত পেয়ে বলল, তা হলে মাছও নেবে বলো। পাঁচু-দা সরল মানুষ—ভালো দেখেছে, মুখ ফুটে বলল—তোমার মতো মনে তার জিলিপির প্যাঁচ নেই।

ভালো রে ভালো! ভালোবাসা করবি—তা নিজের যা আছে, দানসত্র করগে না! কেতুর কষ্ট-করে-ধরা মাছ জিজ্ঞাসাবাদ না করে দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিন্তু এই অবস্থায় মুখের উপর কিছু বলা চলে না—তা কেতুচরণ যত বড় স্পষ্টভাষীই হোক।

উমেশ বলছে, পাঁচটা কি ছটা চিংড়ি আছে বেশ মোটা মতন। ও কটা সমস্ত নিয়ে নিতে হবে। আর নয় তো, নেমে পড়ো এখানে। নৌকো আর এগোবে না।

পদ্ম বলে, নিতে পারি এক কড়ারে। গান শোনাতে হবে।

উমেশ ঘাড় তুলে সগর্বে তাকাল কেতুর দিকে। কেতু এখন বোঠে ধরেছে আর বিটির-বিটির করে পদ্মর সঙ্গে গল্প জমিয়েছে কাড়ালে বসে। উমেশের দিকে তাদের নজর নেই। উমেশ তখন শব্দ করে জানান দেয়, যাঃ—আমার আবার গান!

ভবী ভোলে না। পদ্মদের ঘাটে পৌঁছে গিয়েও সেই কথা।

গান শোনাবে তো বলো। নইলে খালুই ছোঁব না।

উমেশ কথাও বেশ কইতে পারে,—লেখাপড়া শিখেছে, পারবে না কেন? বলে, ফাঁকি দিয়ে এদ্দূরে নিয়ে এসে···এই বুঝি কলির ধর্ম পদ্ম?

নির্দয় পদ্ম বলে, গান গাইবে, আর খেয়েও যাবে দু-জনে। তবে মাছ নেবো। আমার হাতের তরকারি খেলেই বা একদিন।

পদ্মর মতো মেয়ে আর একটি যদি দেখতে পাও। খাওয়াচ্ছে সামনে বসে—তা-ও রণমূর্তি।

উমেশ এমনই একটু কম খায়। তার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে পরম ভব্য ভাবে বসবার দরুন গলা দিয়ে ভাত বেশি নামছে না। কিন্তু কেতুচরণের সম্পর্কে তো কিছু বলতে পারবে না। সাধারণ জন তিনেকের ভাত-ব্যঞ্জন ইতিমধ্যে শেষ করে বসে আছে, তবু পদ্মর সন্তোষ নেই।

উঠছ? গুড় আনলাম কার জন্যে তবে? গুড়-তেঁতুল দিয়ে মেখে জল ঢেলে নাও—

ঢেঁকুর তুলে কেতু বলে, ওরে বাবা, আর পারব না—

খেতেই হবে।

গুড়ের বাটি পাতে উপুড় করল। ঘটি থেকে হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল।

উমেশ বলে, যা খাওয়ান খাওয়ালে পদ্মমুখী, পাতের কো[illegible] থেকে হাত ধরে ওঠাতে হবে। নিজের বলে পেরে উঠব না।

মাতুর পেতে দিয়েছি। হাত ধুয়ে গড়িয়ে পড়োগে। কি কাজ আর এখন ?

সত্যি, ভারি যত্ন করল। কেতুচরণ পদ্মকে এই প্রথম দেখল। এর অনেককাল পরে আবার ভিন্ন অবস্থায় দেখা হয়েছিল। সেদিন সর্বপ্রথম কেতুর মনে উঠেছিল, পরম যত্নে এই দিনের এই সামনে বসে খাওয়ানোর কথা।

ঘুমানো হবে না, কিছুতে না, ঘুমোলে বিষম মুশকিল হবে— এমনি বলাবলি করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে কেতু দেখল, বেলা একেবারে পড়ে গেছে। আরে সর্বনাশ! উমেশের মা কলা কুটে হয়তো বসে আছে তাদের অপেক্ষায়, লোভী মান্থধর ঘর-বার করছে। ছি-ছি! নিতান্ত স্বার্থ-পরের মতো কাজ হয়েছে। কি কৈফিয়ত দেবে তারা ফিরে গিয়ে ?

উমেশকে ডেকে তুলে তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়ে দেখে আর এক বিপদ। বোঠে নেই—জোয়ারের তোড়ে ডিঙিটা দুলছে শুধু।

বিনা বোঠেয় যাবে কি করে, কে নিয়ে নিল বোঠে ? খোঁজ— খোঁজ—

বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না। গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে চোর উঠে এলো পশুরতলার দিক থেকে। হি-হি-হি—হেসে একেবারে শতখান হয়ে পড়ে।

সত্যি, এমন হাসি হাসে এই বাদারাজ্যের মেয়েগুলো। হাসির তোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে জোয়ার-লাগা দেহের যৌবন।

উমেশের দিকে চেয়ে পদ্ম বলে, গান না শুনিয়ে পালাচ্ছিলে। যাও—চলে যাও না। আমি কিচ্ছু জানি নে।

বিপন্ন উমেশ বলে, দিয়ে দাও মাইরি। তাড়া আছে।

কেতুচরণ কিছু গরম হয়ে বলে, কাজের সময় কি রকম মস্করা তোমাদের? দিয়ে দাও।

পদ্ম বাগ মানবার মেয়ে নয়। উদাসীন কণ্ঠে বলে, তোমাদের বোঠে জলে পড়ে ভেসে গেছে বোধ হয়। আমি তার কি জানি?

তারপর কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বলে, আচ্ছা—গান তো আরম্ভ হোক। দেখি খুঁজে-পেতে—পাড়ের জঙ্গলে কোনখানে যদি আটকে থাকে।

উমেশ বলে, এ কি একটা গান গাওয়ার জায়গা? যখন যেখানে হোক, গাইলেই হল?

পদ্ম আবার হেসে ওঠে।

কি রকম জায়গা চাই? সামিয়ানা-ঝাড়লণ্ঠন লাগবে, আসর বসাতে হবে?

অতএব নিরুপায় উমেশ একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে ডিঙির উপর জুত করে বসল।

পদ্ম বলে, রোসো—ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি। আর তোমাদের বোঠে এনে দিই। আসছি এখুনি।

দোয়েল-পাখির মতো যেন নাচের ভঙ্গিতে সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোঠে নিয়ে ফিরে এল অনতিপরেই। সঙ্গে এসেছে পান-খাওয়া তেল-জবজবে এক ছোকরা।

ছোকরাটাকে উমেশ ইতিপূর্বে দেখেছে। হাঁ—দেখেছে বই কি! বেজার মুখে উমেশ সম্ভাষণ করে, কখন আসা হল? এতক্ষণ দেখতে পাই নি তো।

• পদ্মই জবাব দেয়, তোমরা ঘুমুচ্ছিলে—সেই সময় এসেছে। দাদা দোকান দিয়েছে—তাই একে খবর দিয়ে নিয়ে এলো। আমাদের দোকানে থাকবে।

উমেশ বলল, গান কিন্তু হবে না। গলা ভেঙে গেছে।

কে ভেঙে দিল গো?

বহু-প্রচলিত এদের এই স্থূল রসিকতা। কিন্তু পাল্টা জবাব দিতে উমেশের মন হল না। বলে, কাঁচা-তেঁতুলের ঝোল খেয়েছিলাম কি না!

হলই না হয় গলাখান আছে ভালো! কত খোশামুদি করাবে আমায় দিয়ে?

বোঠে মাটিতে ফেলে তার উপর পাশাপাশি চেপে বসল পদ্ম আর সেই লোকটা। হঠাৎ বোঠে হাতে তুলে নিয়ে যে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে, তার উপায় নেই।

উমেশ অগত্যা গান ধরল—রাবণ-বধ পালার গান—'কও দেখি হে লঙ্কাপতি, রাম কি বস্তু সাধারণ? চলো, রামের সীতে রামকে দিয়ে হইগে গিয়ে শরণাপন্ন।'

অতি-পুরানো গান—কথাগুলো তবু কেমন গোলমাল হয়ে

যাচ্ছে। গলা ভাঙার কথা মিথ্যে করে বলেছিল, কিন্তু সত্যিই যে ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরুচ্ছে হাঁসের মতো!

শেষ হয়ে গেলে উমেশ কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না। পদ্মই মন্তব্য করে, মন্দ নয়। কিন্তু যা-ই বলো—সেবারে শুনিয়েছিলে, সে রকমটা হল না।

উমেশ নিজেও জানে সেটা। যাত্রা শুনতে সে এসেছিল এখানে। রাবণ-বধ পালা—অনেকবার শোনা। গান শুনে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। পালা শেষ হবার পর আসরের লোকজন বিদায় হয়ে গেল, উমেশ তখন অধিকারীকে ধরে বসল।

পালা গাওয়া নয়—এ হল তোমাদের লাঠিবাজি করে বেড়ানো।

অধিকারী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, লাঠিবাজি বলছ কাকে?

হাঁ, গানের মাথায় লাঠি মারা—

সে নিজে গেয়ে শুনাল। অনেকদিন ধরে অনেক যত্ন করে শেখা গানটা। বড় উতরে গিয়েছিল—এতকাল পরেও পদ্ম যে আজ গান শোনানোর বায়না ধরল, এই তার একটা প্রমাণ। পদ্ম সেদিন ঘুরঘুর করছিল তাদের আশেপাশে। কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল বলে উমেশও দলের সঙ্গে খেতে বসেছিল। পদ্ম দেওয়া-থোওয়া করছিল পরমোৎসাহে।

পদ্ম বলছে, কি হয়েছে আজকে বলো তো? বড় মুখ করে আমি পদাকে টেনে নিয়ে এলাম।

জবাব না দিয়ে উমেশ বোঠে তুলে নিয়ে নৌকায় উঠল। বিদেশি মানুষটা—পদা হল বুঝি ওর নাম—হেসে ওঠে। পদ্মও তো হাসে,

কিন্তু ও লোকটার ঝকমকে দাঁতের ঐ বস্তু, হাসি কক্ষনো নয়—শাণিত ছুরি দিয়ে খোঁচা-মারা। হাসতে হাসতে সে হিতোপদেশ দেয়, বোঠে বাইতে জানো—তাই কোরো। গান গাইতে যেও না, ও তোমার হবে না।

ছপছপ ছপছপ বোঠে বেয়ে ফিরে চলেছে। কেতুচরণ বলে, বাড়ি গিয়ে কি জবাবদিহি করবে, ভেবে-চিন্তে বের করো দিকি একটা-কিছু—

উমেশ অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠে বলল, ও—সে হবে। কিন্তু শুনলে তো ঐ কি বলল? গান নাকি হবে না আমায় দিয়ে! গানই গাইব আমি—গান গেয়ে কাঁদিয়ে যাবো, এই আমার পণ।

৪

মৌভোগ নাম দিয়েছেন মধুসূদনই। নিজ নামের সঙ্গে একটু মিলও আছে। গ্রাম বসে গেছে—চাষী ইতিমধ্যেই পঁচিশ-ত্রিশ ঘর এসে বসত করছে। আরও আসবে। মধুসূদনের প্রখর দৃষ্টি—যারা আসছে, সর্বরকম সুবিধা দিচ্ছেন তাদের তিনি।

মতিরাম সাধু মাস চারেক আগে এসে ঘর তুলেছেন। সাধু তাঁর কৌলিক উপাধি—অথবা রক্তাম্বর ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন বলে লোকে সাধু নামে অভিহিত করে, সেটা জানা যায় না। সাধু—অথচ কারো কাছে সিকি পয়সার প্রত্যাশী নন। বরং দান-ধ্যান তাঁরই অনেক। এ হেন ব্যক্তি কোন আশায় বাদা অঞ্চলে এলেন,

কে জানে ? এলোকেশী আর ছোট ভাই পতিরামকে নিয়ে সংসার। উঁহু—সংসার তাঁর বিষম ভারি। কত জনে যে নিয়মিত পাত পাড়ে এবং রাত্রিবেলা এক-একটা মাদুর বিছিয়ে বাইরের দাওয়া ও ঘরগুলোয় শুয়ে পড়ে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। ঘরের পর ঘর তুলে উঠোন গোলকধাঁধা করে তুলেছেন, তবু জায়গার অকুলান পড়ে কখনো কখনো। পতিরাম সোনা-রুপার কাজ করে—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—রাস্তার ধারে চালাঘরে তার দোকান। দেখতে পাওয়া যায়, সারাদিন প্রদীপের সামনে ঘাড় নিচু করে ঠুক্‌ঠুক করে সে কাজ করছে। এত বড় সংসারের সমস্ত দায়ঝক্কি—মতিরামেরও ঠিক বলা যায় না—ঐ এলোকেশী মেয়েটার। কেতুর কাছে সে মিথ্যে বড়াই করে নি।

বিকালবেলা নিদ্রোত্থিত মতিরাম রক্তচক্ষে জলচৌকির উপর পা ছড়িয়ে বসে কুলকুচা করছেন। কাঁধে কলসি—কলসির মুখে গোঁজা গামছার পুঁটুলি—কেতুচরণ এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। ভক্তিযুক্তভাবে সে সাধুর পদধূলি মুখে মাথায় দিল।

কোত্থেকে আসছ বাপু ? চিনি-চিনি করছি—ও হ্যাঁ—

মতিরাম বারকয়েক তার আপাদমস্তক চেয়ে দেখলেন। এক গাল হেসে কেতুচরণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমায় না চিনলেও কলসিটা ঠিক চিনবেন।

এই কলসি তো সেদিন জিতে নিলে ? বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

কেতুও খোশামুদি করে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মতিরাম চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, দৃষ্টি অন্দরের চৌরিঘরের দিকে।

চশমা চোখে এক শৌখিন ব্যক্তি কানাচের দিক দিয়ে বেরুচ্ছে টিপিটিপি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। মতিরাম মধুকণ্ঠে আহ্বান করলেন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয় ম্যানেজার মশায়। ওদিকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

থতমত খেয়ে লোকটি বলে, আপনার খোঁজে—

আমি বাইরের ঘরে ঘুমোই। জানা নেই বুঝি ?

দেখতে পেলাম না। তাই মনে করলাম—

লোকটি দুর্লভচন্দ্র—মধুসূদন রায়ের কর্মচারী। দুর্লভ নিজে বলে ম্যানেজার। ম্যানেজার জঙ্গলের মধ্যে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে গাছগাছালি কাটায়, নিজেও কুড়াল ধরে কখনো-সখনো। বাঁধ-বন্দির মাটি কাটা হচ্ছে, নিজেই গজকাঠি নিয়ে কূয়ো মাপতে লেগে যায়—

আড়ে চার, দীঘে সাড়ে-পাঁচ। চার ইণ্টু সাড়ে-পাঁচ কত হবে, হিসেব কর্ না রে পুঁটে। আঠারো। খাড়াই দুই, তা হলে মোট কালি হল আঠারো দুনো বত্রিশ। পুঁটে, তোর পাওনা তা হলে দাঁড়াচ্ছে—

আবার কাজকর্ম অন্তে কে বলবে, এ সেই দুলভ ? চোখে চশমা, পরনে ধোপদস্ত জামা-কাপড়, পায়ে বার্নিশ-করা চিনাবাড়ির জুতা। ফুরফুরে গন্ধ বেরোয় সর্বাঙ্গে, মস-মস করে হাঁটে, কারণে-অকারণে পকেটের রঙিন রুমাল বের করে মুখ মোছে।

মতিরামের ডাকে দুর্লভ কাছে এসে দাঁড়ায় অগত্যা।

তারপর—কি বৃত্তান্ত ? বাদাবনে সোনা ছড়ানো আছে—সেই তো ?

দুর্লভ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, ঠাট্টা করেন কেন ? সত্যি কথা, সোনাই

বটে। সুঁদুরকাঠের ভরা সাজিয়ে মাতলায় চালান দেবো। মুনাফার টাকায় যত খুশি গিনি গেঁথে নেবেন। তা হলে সোনা কুড়ানো হল কিনা, বিবেচনা করুন। বনকরের বাবুদের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে—দামের দিকে সুবিধা তো হবেই। তা ছাড়া চালানে যা লেখা থাকবে, তার দেড়া মাল নৌকো বোঝাই হবে।

পুঁজি মিলবে কোথা? আমার টাকাকড়ি নেই। গরজও নেই টাকার। ধনে সারবস্তু কি আছে, সমস্ত মনে। মায়ের নাম জপ করে কোন রকমে দিন কেটে গেলেই হল।

কিন্তু একথা দুর্লভ বিশ্বাস করে না। এ অঞ্চলের কেউই করবে না। খরচপত্রের বহর দেখে ইতিমধ্যে রটনা হয়ে গেছে, মতিরাম সাধু মন্ত্রবলে সোনা তৈরি করতে পারেন। মধুসূদনের কাজ করে দুর্লভ খুশি নয়—সে জীবনে উন্নতি করবে। যার নেই মূলধন, সে-ই যায় বাদাবন। সেই বাদাবনে এসে পড়েছে সমাজ-পরিজন ছেড়ে। কিন্তু সে কি এই জন্যে? ক-পয়সা আয় করা যায় মাটি-কাটার তদারকে? লোকজনও সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। আঠারো দুনোঁ বত্রিশ নয়, ছত্রিশ—শিখে যাচ্ছে ধারাপাতের মহিমায়। সামান্য দশ-পাঁচ টাকার জন্য নোনা জল, শুলোর আঘাত ও পিশুর কামড় খাওয়ার মানে হয় না।

নানা সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বলে এবং কাঠের ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে দুর্লভ চলে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে অনুচ্চ কণ্ঠে মতিরাম বললেন, হারামজাদা!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ সুরে কেতুচরণের সঙ্গে মুলতুবি আলাপন শুরু করলেন।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কিছু বললে না তো বাবা।

কেতুচরণ বলে, দূর বেশি নয়। সাঁইতলায় মান্যধর মোড়লের বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম—

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে মতিরাম বলেন, সাঁইতলা মানে—

ঘাড় নেড়ে কেতু বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুকদাঁড়া-সাঁইতলা। বাড়ি আমার এদিগরে নয়, নামডাক শুনে এসেছিলাম। তা ঘেন্না ধরে গেল সাধু মশায়। এখন একেবারে কিচ্ছু নেই—যত ছ্যাঁচোড়ের বসতি।

মতিরাম প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিলেন।

বেলা তো একেবারে গেছে। এখন আবার চান-টান করবে নাকি?

চান খুব ভালো রকম হয়ে গেছে। গেরো কেমন! ধর্মখেয়া বন্ধ—মাঝি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। অত বড় ফলুইমারি সাঁতরে পার হয়ে এলাম। কুমির-কামটে গন্ধ পায় নি, তাই বাঁচোয়া।

আহা-হা, বড় কষ্ট পেয়েছ—

কেতু হাসছে, কিন্তু মতিরাম শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কে আছিস? সন্ধ্যে হয়ে যায়, বাবার খাওয়া-দাওয়া হয় নি— এলোকেশীকে বল, তাড়াতাড়ি পাক-শাকের জোগাড় করে দিক।

কেতু বলে, পাক করতে যাব কোন দুঃখে? আপনার নাম শুনে এসেছি সাধু মশায়, মনে মনে আপনাকে গুরুবরণ করেছি।

মতিরাম জিভ কেটে বলেন, গুরু? ও কি বলছ—কীটস্য কীট আমি—

কেতু একগাল হেসে বলে, বড়রা বলে থাকেন ঐরকম। খবরাখবর না নিয়ে কি এসেছি? মন্তোর দিতে হবে, অমনি দুটো দুটো পাতের প্রসাদও পাবো। স্বজাত হই আমি আজ্ঞে।

মতিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর-একবার তাকালেন তার দিকে। আর কিছু বললেন না, খড়ম খটখট করে ভিতরে চলে গেলেন।

অতএব কেতুচরণও আর সকলের সঙ্গে দুপুর ও রাত্রিবেলা যথারীতি দাওয়ায় পাত পেতে বসে, খাওয়ার পর বাইরের ঘরে মাদুর পেতে গড়ায়। এই রকম প্রতিপাল্য সাকুল্যে কত জন— কেতু চেষ্টা করছে, কিন্তু গুণে ঠিক করতে পারল না। কখন কে আসছে, চলে যাচ্ছে—কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। অতিথি-বাৎসল্য নিয়ে কেউ প্রশংসা করলে মতিরাম জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি— কেন তোমরা লজ্জা দাও বলো দিকি? কার কে-বা খায়? সবাই মায়ের সন্তান—মা যা জুটিয়ে দেন, সকলে মিলে ভাগযোগ করে খাই।

কখনো বা বলেন, আগের জন্মে ধেরে খেয়েছিলাম—এ-জন্মে ধার শোধ দিয়ে যাচ্ছি। ওঁরা উত্তমর্ণ—ওঁরাই মান্য। ওঁরা ঋণমুক্ত করছেন আমায়।

পতিরাম সারাদিন কাজ করে—স্নান ও খাওয়ার সময় একবার মাত্র বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বড় ভাল কারিগর। আশ্চর্য লাগে, এ হেন লোক শহরে-বাজারে না গিয়ে বাদাবনের প্রান্তে দোকান সাজিয়ে রেখেছে কি জন্যে? কারুকর্মের কদর বোঝবার লোক এ অঞ্চলে কোথায়? গহনাই বা পরে কজন?

মতিরাম মাঝে মাঝে হঠাৎ খুলনা চলে যান। দু-পাঁচ দিন কাটিয়ে ফিরে আসেন। যেসব নৌকায় যান—মাঝিরা বলে, ঘাটে নেমে সোজা গিয়ে ওঠেন পুরাণো-কালিবাড়ি। ঘর-সংসার

থাকলেও আসলে তো সাধক মানুষ—অন্তরে আহ্বান আসে, আর ছুটে মায়ের পদতলে গিয়ে পড়েন।

একটা জিনিষ কেতুচরণ লক্ষ্য করছে, মতিরাম চলে যাবার পরই দুর্লভ হালদার ব্যবসায়ের কথাবার্তা বলতে আসে। দেখা হয় না—বিফলমনোরথ হয়ে এলোকেশীর হাতের দু-একটা সাজা পান খেয়ে পরম দুঃখে ফিরে চলে যায়।

একবার অমনি রওনা হয়েছেন মতিরাম। ক্রোশ দুই আন্দাজ চলে গেছেন, পিছন থেকে ডাক শুনে নৌকা থামাতে বললেন। ঝোপ-ঝাপ জল-কাদা ভেঙে কেতুচরণ ছুটে আসছে, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

কাছে এলে মতিরাম বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, ভাল জায়গায় যাচ্ছি—পিছু ডেকে ভণ্ডুল দিলি কেন রে? কি হয়েছে?

কেতু বলে, ফিটের ব্যামো হয়েছে এলোকেশীর।

মতিরাম অতিমাত্রায় ব্যস্ত হলেন।

বলিস কি রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অজ্ঞান হয়ে হাত-পা কষছে ঘরের মধ্যে। তাই দেখেই ছুটে এলাম।

নৌকা উজান নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। মতিরাম নামলেন। দ্রুতপায়ে চলেছেন—দৌড়বার মতো। কেতুই পিছিয়ে পড়ছে। আসবার সময় এত ছুটে এসেছে, এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—সেই জন্যেই কি?

তা এলোকেশী রোগিই বটে? দুর্লভ তার হাত চেপে ধরেছে। এলোকেশী বলেছে, না-না—এ সমস্ত কি?

ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল তো, দুর্লভ দুই কাঁধে দু-হাত রেখে আকর্ষণ করে।

বাবাকে বলে দেবো সমস্ত।

নির্ভীক দুর্লভ বলে, বোলো। না বলো তো অতি-বড় দিব্যি রইল। বলবে, ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে দাও। পারবে না বলতে—লজ্জা করবে?

এলোকেশীর সর্বদেহ কাঁপছে। পানের ডাবর সরিয়ে দুর্লভ মেজেয় চেপে বসল। কোলের উপর টানছে তাকে।

আপনি থেকে তুমিতে এসে পৌঁচেছে এক মুহূর্তে। এমনি সময়ে ভেজানো দরজা খুলে মতিরাম ঢুকলেন। খড়মের আওয়াজে ফিটের যাবতীয় লক্ষণ আরোগ্য হয়ে রোগি মুহূর্তে সামলে উঠেছে। দুর্লভ তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসে। এলোকেশী মেজের উপর পানের ডাবর নিয়ে যথারীতি জাঁতি দিয়ে সুপারি কুচোচ্ছে।

ম্যানেজার মশায়ের আগমন হল কখন?

দুর্লভ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রথমটা। সামলে নিয়ে বলল, এই তো—এই এখনই। ভারি এক সু-খবর আছে। বনকরে ঢুকবার চেষ্টায় আছি, আশা পেয়েছি। যতই হোক সরকারি চাকরি—সব দিক দিয়ে সুবিধে। কি বলেন? মূলধন নিয়ে আমরা কাঁইকুঁই করছিলাম—এ যদি লেগে যায়, বিনি-পয়সায় কাঠের ব্যবসা ফাঁদব। আপনাকে ভাগিদার হতে হবে।

এমন মনোরম প্রস্তাবের পরও মতিরামের কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায় না। চুপচাপ—যেন একটু বাঁকা-দৃষ্টিতেই চেয়ে আছেন তিনি। দুর্লভ পুনরায় বলে, ঈশ্বর-জানিত লোক আপনি—দেবীস্থানে বলবেন, যাতে কার্যসিদ্ধি হয়।

কিন্তু বলতাম কি করে দেবীর কাছে? আমি রওনা হয়ে যাবার পর তবে তো আপনি এসেছেন।

দুলভ বলে, তা ঠিক। আপনি ফিরে এলেন—সেই জন্যই দেখা হয়ে গেল। বরাত-জোর আমার।

মতিরাম কঠিন স্বরে বললেন, আজকে একদিনের ব্যাপার নয়—প্রায়ই আসেন এমনি। কত অসুবিধা হয়, বিবেচনা করুন দিকি! রায়বাবুর লোক আপনি—উপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা হয় না।

দুর্লভ উদারভাবে বলে, আমি তাতে কিছু মনে করি নে।

কিন্তু আমি যে করি! লোকে মনে করে। আর সে মনের কথা যে মনে-মনে রাখে, তা-ও নয়—মুখেও বলছে অনেক-কিছু আমার অবর্তমানে যখন-তখন ঢুকে পড়েন বলে। আপনারা বড়দরের মানুষ—উঁচু কান অবধি হয়তো সে-সব পৌঁছয় না।

দুর্লভ বলে, যখন-তখন আসি, কে বলল?

মতিরাম বলেন, জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলবে। বলতে হবে কেন, আমি টের পাই। এ রকম আসবেন না আর। আসবার দরকার হলে একটা লোক পাঠিয়ে খবর নেবেন, আমি বাড়ি আছি কি না। অনর্থক এসে হয়রান হয়ে যান, আমার কষ্ট হয়।

দুর্লভ মুখ কালো করে বলে, ভালো মনে করে আসি—তা বেশ, আসবই না আর কখনো।

ভেবেছিল, একটু-কিছু প্রতিবাদ আসবে। কিন্তু মতিরাম সেদিক দিয়ে গেলেন না। সহজভাবে বললেন, চলুন তা হলে—একসঙ্গে যাওয়া যাক। কি খবর আছে, শুনতে শুনতে যাই। দেরি করলে গোন মারা যাবে, দেরি করবার জো নেই। চলুন।

দুর্লভকে সঙ্গে নিয়ে তবে বেরুলেন। এক রকম গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সামিল। দুয়োরের সামনে কেতুচরণ দাঁত বের করে হাসছে। ও-বেটা এদিকে কি করতে এসেছিল? মতিরামের

অনুপস্থিতিতে পাহারা দিয়ে বেড়ায় নাকি—সেইজন্যে দুশমনটাকে রেখেছে ?

রোদ চড়চড় করছে। দুর্লভের ছাতির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মতিরাম চললেন। দুজনে যেন কত সম্প্রীতি !

৫

সাঁইতলা অনেকগুলো—শুধু সাঁইতলা বললে ধরা যায় না। শুকদাঁড়া-সাঁইতলা জুড়ে বলতে হবে। পুরানো এবং বিখ্যাত জায়গা। কেতুচরণ আশায় আশায় গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু সেকালের খ্যাতিটাই আছে, সেসব কর্মীপুরুষ নেই।

সাঁইতলার মোড়লদের লোকে এক ডাকে চেনে। চোর-চক্কোত্তি মশায় ঐ বংশের। চক্রবর্তী বটে, কিন্তু জাতে ব্রাহ্মণ নন। অসাধারণ কর্মকুশলতার জন্য লোকের মুখে মুখে উপাধিটা চলেছিল। সেসব অনেক কালের ব্যাপার—লোকে এখন গল্প বলে উড়িয়ে দেয়।

এক মাদার উপর পঞ্চাশ ঘরের বসতি, জোয়ান ছেলেই অন্তত পক্ষে শ' দেড়েক। সে আমলে কেউ কখনো লাঙলের মুঠো ধরে নি, ব্যাপার-বাণিজ্য করে নি। সমস্তটা দিন দেখতে পাবে, টেড়ি কেটে, গন্ধ-তেলের বাস ছড়িয়ে, তাস-দাবা খেলে অথবা ঘুড়ি উড়িয়ে কাটাচ্ছে। কি সুখের দিন ছিল—অভাব বা ভাবনা-চিন্তা ছিল না কোনরকম।

তা বলে নিষ্কর্মা নয়—তারা বসে খায় না। রাত্রিবেলা—

বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে কাজের চাপাচাপি। নৌকার কাজে যেত জনকতক—কতক ঘরের কাজে, কতক বা ক্ষেতখামারের কাজে। খাল বা খাঁড়ির মধ্যে নৌকা বেঁধে আছে, মোড়লদের ডিঙি নিঃশব্দে লাগল গিয়ে তার পাশে। ঘুম ভেঙে উঠে মাঝিরা দেখবে কোমরের গাঁজিয়া কেটে টাকা-পয়সা সমস্ত নিয়ে গেছে। গাঁজিয়া কাটার সময় কাঁচির পোঁচে চামড়ার এক পর্দা যদি কেটে যেত, তাতেও বোধ হয় সাড় হত না। এই হল নৌকার কাজ। আবার দেখ, আগুন জ্বালিয়ে আগুনের আলোয় চারিদিক দিনমানের মতো করে সতর্ক চাষীরা রাত্রি জেগে পাহারা দিচ্ছে—তারই মধ্য থেকে যেন ভানুমতীর খেলায় খামারের ধান—এমন কি, হালের বলদ পর্যন্ত কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যাচ্ছে। সাঁইতলার মোড়লদের পক্ষেই সম্ভব শুধু এ ধরনের সাফাই ক্ষেতের কাজ। চেষ্টা করে দেখ—আর কেউ এমনটি পেরে উঠবে না। ঘরের কাজকর্ম হামেশাই অবশ্য দেখে থাকে দশজনা। কিন্তু সাঁইতলার সঙ্গে সাধারণ ছিঁচকে ও সিঁধেলদের তুলনা হতে পারে না। মান্যধর মোড়ল এবং অন্য বুড়ো মুরুব্বিরা তাদের আমলের গল্প করে, শুনে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

মন্তোর-তন্তোর গুণ-জ্ঞানই বা কত রকমের জানা ছিল! মাড়ি-আঁটার মন্তোর—ধুলো পড়ে ছুঁড়ে মারো কুকুরের গায়ে, মাড়ি এঁটে গিয়ে কুকুরের মুখ থেকে আওয়াজ বেরুবে না, ঘেউ-ঘেউ করে গৃহস্থকে জাগাতে পারবে না, কামড়াতেও আসবে না। আবার এমনও আছে—দশ-বিশটা কুকুর ডেকে ডেকে মরে গেলেই বা কি, গৃহস্থের সাড় হবে না নিদালি মন্তোরের গুণে। চাবি-খোলার মন্তোর ছিল এক রকম—মন্ত্রপূত ধুলোর কণিকা মাত্র তালার গায়ে

ঠেকিয়ে দাও, যত শক্ত তালা হোক—আপনি খুলে পড়বে। সেকালের সেই সব ধুরন্ধরেরা গত হয়েছেন—মন্তোর-তন্তোর শিখে রাখে নি কেউ। আর দিনকাল বদলেছে, লোকের নিষ্ঠা নেই, মন্তোর তেমন খাটেও না একালে।

প্রবীণেরা ছোকরাদের রীতিমতো পরীক্ষা করতেন কে কতদূর বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। এ-বাড়ির ঘটিবাটি জিনিসপত্র ও-বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে প্রায় চোখের উপর দিয়ে, অথচ তিলমাত্র টের পাবে না। টের পেলে পরীক্ষায় হার হয়ে গেল, তা[illegible] হেয় হতে হবে সাঁইতলার মেয়ে-পুরুষ সকলের চোখে। শেষ প[illegible]ক্ষাটা বিষম কড়া। পাখি ডিমের উপর বসে তা দিচ্ছে—সেই ডিম সরিয়ে আনতে হবে পেটের তলা থেকে। মগডালের উপর বাসা—গাছে উঠবে, বাসার ভিতর হাত ঢুকিয়ে ডিম চুরি করবে, নেমে আসবে গাছ থেকে। এত কাণ্ডের মধ্যেও পাখি টের পাবে না, উড়ে পালাবে না। এই যদি পারো মোড়লরা তোমায় অবাধ-ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন। শহরে-বাজারে তখন নিঃশঙ্কে রুজি-রোজগারে লেগে যেও, বড়-বিদ্যের সব চেয়ে বড় ওস্তাদ স্বর্গীয় চোর-চক্কোত্তির আশীর্বাদে কখন কোনরকম বিপত্তি ঘটবে না।

কিন্তু এখন এ সমস্ত নিতান্তই গল্পকথা। একটু রাত হলে দেখবে, সাইতলার ঘরে ঘরে দরজার খিল এঁটে সবাই নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। সাঁইতলার জোয়ান ছেলে রাত্রিবেলা দুয়োরে খিল দেয় এবং পড়ে পড়ে ঘুমোয়! মান্যধর হেন মাতব্বর ব্যক্তির ছেলে উমেশ কুলকর্ম ছেড়ে পিতৃপুরুষের নাম ডুবিয়ে বড়দলে তারক বাড়ুজ্জের কাছে রাগ-রাগিণী ও তবলার তাল রপ্ত করতে যায়। বোঝ তাহলে অবস্থা! কম দুঃখে কেতুচরণ সাঁইতলা ছেড়েছে!

তারক বাড়ুজ্জে ওস্তাদ গাইয়ে—অঞ্চলজোড়া খাতির। বাদা-রাজ্যের সুবিখ্যাত গঞ্জ বড়দল—সেইখানে তাঁর আস্তানা—সাঁইতলা থেকে ক্রোশ তিনেক তো হবেই। বাজখাঁই গলা বাঁড়ুজ্জে মশায়ের, গানের কথারও সব সময় মাথামুণ্ডু পাওয়া যায় না—কিন্তু একবার একখানা ধরলে একবেলার মধ্যে ছাড়েন না। এ-মানুষকে সম্ভ্রম না করে উপায় নেই।

দুপুরে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে উমেশ বড়দল রওনা হয়ে পড়ে। সিকিটা-দুয়ানিটা বাপের তহবিল হাতড়ে নিয়ে যেতে হয়—যেদিন যত দূর জোটে। প্রণাম ও পদধূলি-গ্রহণের পর বাঁড়ুজ্জে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, অবশিষ্ট কি পড়ে রইল পদপ্রান্তে। শুকো-প্রণামে তিনি বেজার হন—এটা-সেটার নাম করে উঠে পড়েন—উমেশের এত পথ ভেঙে আসা পণ্ডশ্রম হয়। তাই রোজই সে গুরুপ্রণামী কিছু-না-কিছু জোগাড় করবেই—নগদ কড়ি না জোটে তো নিতান্ত পক্ষে আধ সের খানেক চাল।

প্রণামাদির পর তারক তান ধরেন। খানিক পরে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করেন, বুঝলে ?

কি বুঝবে উমেশ ? গোড়ায় কিছুদিন সে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকত। ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করে একদিন সে ঘাড় নাড়ল। ঘাড় নেড়ে বলে, আজ্ঞে না—কিছুই না—

গুরু পরম বিস্ময়ে বলেন, বলো কি গো ? আচ্ছা, আবার শোনো—

রাত্রি একপ্রহর দেড়প্রহর অবধি এমনি গান শুনে জলকাদা ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসে, বাপ না জানতে পারে—টিপিটিপি দরজার তালা খুলে উমেশ শুয়ে পড়ে।

ঘুরপথ যদিচ—বড়দলের পথে পদ্মদের বাড়ি হয়েও যায় মাঝে মাঝে। একদিন নিরিবিলি পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, পদ্ম, তুমি যৌবনে যুগিনী হয়ে রইলে ?

মুখ শুকনো করে পদ্ম বলে, কপাল !

সে বড় দুঃখের কাহিনী। পদ্মের বিয়ে হয় সাত বছর বয়সে। শিবের মতন বর--বয়স এবং নেশার ব্যাপারে তো বটেই। তা হতভাগীর কপালে সইল না। বছর তিনেকের মধ্যে সে পাট চুকিয়ে মেয়েটা এখন ধিঙ্গি হয়ে বেড়াচ্ছে।

উমেশ বলে, সাঙা করো না কেন ? তাতে তো বাধা নেই ?

মানুষ পাই কোথা ?

পদ্ম হেসে আকুল। এতক্ষণের ছদ্মগাম্ভীর্য একফালি ছেঁড়া-ন্যাকড়ার মতো যেন সে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বিরক্ত হয়ে উমেশ বলে, হাসবার কি হল ?

ঐরাবত হাতি গেলেন তল, খেঁকশিয়ালী এসে বলে হেথায় কত জল ! মোড়ল-খুড়ো এসে ফিরে গেলেন, এবারে নিজে তুমি ঘটক হয়ে এলে ?

মান্যধর এসেছিল, এ-খবর উমেশ কিছুমাত্র জানে না। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, তার এ-বাড়ি আসা-যাওয়া নিয়ে দস্তুরমতো কানাকানি চলছে। করে কি মানুষগুলো ? এটা বাদাবন নয়—পুরোপুরি আবাদ জায়গা। শুধু মাত্র ধান-চাষের চলন—বছরের মধ্যে মাস তিনেকের খাটনি। বাকি ন' মাস পরনিন্দা পরচর্চা না হলে তারা কাটায় কি নিয়ে ?

সাগ্রহে উমেশ জিজ্ঞাসা করে, বাবা এসেছিলেন ? তা কি কথাবার্তা হল ? কি বললেন তোমার মা-ভাই ?

হবে না—সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে।

উমেশ মুখ কালো করে বলে, অপাত্র হলাম আমি কিসে? স্বজাত, করণীয় ঘর—ঘরবাড়ি জমাজমি রয়েছে—

তা যতই থাক, চোরের ঘরে মা মেয়ে দেবে না। দাদা মাথায় তেল-নুন বয়ে বিক্রি করে—সে তবু অনেক ভাল, সৎপথে আছে।

হায়, হায়—কালে কালে হল কি! এত খাতির ছিল সাঁইতলার মোঁড়লদের—আজকে ঘরের মেয়েটা অবধি মুখের উপর স্পষ্টাস্পষ্টি চোর বলে মুখ বাঁকাচ্ছে।

উমেশ সামলে নিল। একটা গুণ আছে—যেমন কথাই হোক, টক্কর দিয়ে তার উপরে উল্টো কথা চাপান দিতে পারে। পাঠশালায় যে ক-ব-ঠ শিখেছিল, তারই গুণ।

বলল, চোর আমরা না তুমি?

পদ্ম ভীত হয়ে বলে, আমি কার কি চুরি করলাম?

করেছ বই কি! কার বুকের মধ্যে থেকে কি মাণিক চুরি করেছ—পাঁজর একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছ—মনে মনে একটু-খানি ভেবে দেখ দিকি পদ্মমণি।

জুতসই কথাটা বলে ফেলে উমেশ টিপি-টিপি হাসছে পদ্মর দিকে চেয়ে। এমন সময় সেই পদা লোকটা—মাথায় কেরোসিনের টিন, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে—দুমদাম করে এসে টিনটা উঠানে নামাল। মাথার উপরের গামছার বিড়েটা খুলে বাতাস খাচ্ছে, খুবই পরিশ্রান্ত হয়েছে—অনেক দূর থেকে আসছে নিশ্চয়। পদ্ম ও উমেশের দিকে তাকাতে তাকাতে ব্যস্তভাবে আবার সে বেরিয়ে গেল।

উমেশ বলে, এখনো রয়েছে। পাকাপাকি পুষে রাখলে তবে?

পদ্ম বলে, ভারি করিৎকর্মা। অনেকদিন ধরে ব্যাপার-বাণিজ্য করছে, অনেক জানাশোনা। দোকানের চেহারা এরই মধ্যে ফিরিয়ে ফেলেছে। খুব খাটে।

লোক ভাল নয় কিন্তু—

বলে একটু থেমে পদ্মর মনোভাব বুঝে উমেশ ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমাদের চোর বললে পদ্মমুখী—কর্তারা কি করতেন বলতে পারি নে, কিন্তু দশের মুখে শুনে দেখো, অতি-বড় শত্রুও আমায় ঐ অপবাদ দেবে না। পদা কিন্তু এক নম্বরের জোচ্চোর। ব্যাপার-বাণিজ্যের কথা হচ্ছিল—সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। লোকটার পিঠের দিকে নজর করে দেখো, তুমিও হয়তো দেখবে কিছু-কিছু—

বুঝতে না পেরে পদ্ম অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

দিন কতক চিটেগুড়ের ব্যবসা করেছিল। নৌকো-বোঝাই গুড়ের নাগরি নিয়ে বড়দলের হাটে বেচে আসত। আগে কি হয়েছিল জানি নে—একদিন দেখলাম জমজমাট হাটের মধ্যে পাইকারেরা ঘিরে ফেলে দমাদম আছাড় মেরে পাঁচ-সাতটা নাগরি ভেঙে ফেলল। ভিতরে শুকনো ডেলা-মাটি, শুধু মুখের দিকটায় গুড় খানিকটা। জিনিস হল চিটেগুড়—কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে পরখ করবে, সে উপায় নেই। তারপরে—বুঝতে পারছ—হাটুরে মার আরম্ভ হয়ে গেল। যে কিছু জানে না, কিছু বোঝে নি—সে-ও কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে ছুটো কিল মেরে হাতের সুখ করে। গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে পদা সেদিন রক্ষে পায়।

থেমে গিয়ে ক্ষণকাল পদ্মর দিকে চোখ পিটপিট করে চেয়ে উমেশ আবার বলে, কোন-কিছু কিনবার নাম করে পদাকে বড়দল যাবার কথা বোলো তো একদিন, দেখি কি জবাব দেয়—

৬

শ্রাবণ মাস গেল, ভাদ্রও যায়-যায়। উমেশ নিতান্ত মরীয়া হয়ে অবশেষে বলল, কই বাড়ুজ্জে মশায়, কিছুই তো হয় না। তবে আর মিছে জলকাদা ভাঙি কেন? আপনার মতো মানুষের পদাশ্রয়ে যখন হল না, এবার ইস্তফা দেবো মনন করেছি।

কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতায় বা অপর যে কারণে হোক—তারক বাড়ুজ্জে সদয় হয়ে বললেন, কান দিয়ে নিতে পারলে না যখন—তা বেশ, অন্য পথও আছে। কাল একটা খাতা বেঁধে নিয়ে এসো।

কাগজ এ অঞ্চলে সহজলভ্য নয়—তবে অদৃষ্টে থাকে তো এই বড়দল গঞ্জেরই কোন দোকানে দু-চার পয়সার মতো মিলে যেতে পারে। তারকের গানের মধ্যেই ফাঁক কাটিয়ে একবার সে বাজার চুঁড়ে এল। পাওয়াও গেল—বাদামি রঙের ঢাউশ কাগজ। কাগজ গণে বেছে আলাদা করে রেখে এসেছে, পয়সা না থাকায় কিনতে পারে নি। পরদিন সকাল সকাল এসে কাগজ কিনে দোকান থেকেই একেবারে খাতা বেঁধে নিয়ে হাজির হল।

খাতায় বাড়ুজ্জে বোল লিখে দিলেন। নানা বাদ্যযন্ত্রের বোল—গোটা তিরিশ হবে গুণতিতে। পড়িয়ে শোনালেন একবার

জিনিসপত্রের সঙ্গে এক কৌটো চা এনে রেখেছে। কোথায় যেন পদ্ম চা খাওয়া দেখে এসেছিল—দাদার কাছে ফরমায়েশ করেছিল তাই। বেশি রকম সর্দিকাশি হলে কিম্বা বাড়িতে ভাল লোক কেউ এলে তখনই চা বেরোয়। পিতলের ঘটিতে জল গরম করে তার মধ্যে পাতা ফেলে গুড়, আদা এবং কদাচিৎ দুধ সহযোগে সমারোহে চা-পান চলে।

চায়ের আয়োজন হতে লাগল। উমেশ আজ নিজেই প্রস্তাব করে, একটু গানবাজনা হলে হত না ?

এতদিন বাড়ুজ্জের সাকরেদি করে ঐ বিদ্যায় খানিকটা লায়েক হয়েছে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ সে। গান শুনে সেই যে ফাজিল পদাটা হাসাহাসি করেছিল, সে অপমান আগুনের মতো জ্বলে। তার প্রতিবিধান করবেই সে নতুন গান শুনিয়ে পদ্মর কাছ থেকে তারিফ আদায় করে।

প্রস্তাবটা পাঁচুর চমৎকার লাগে। বাদলাবেলা কি করা যায়—আসর জমানো যাক বসে বসে। বলে, তা যেন হল, কিন্তু বাজনার কি হবে ? একখানা খোল ছিল—দল-ছাউনি ছিঁড়ে তার কেঁড়েটা মাত্তোর রয়েছে।

উমেশ সগর্বে বলে, আমার সমস্ত আছে। হুরমনি অবধি কিনে ফেলেছি। রোসো—নিয়ে আসছি।

আবার বাইরের অবিরল বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে বলে, থাকগে। এর মধ্যে আনতে গেলে যন্তোর নষ্ট হয়ে যাবে। খালি-গলায় হোক না। একখানা ধরো পাঁচু-দা—

পাঁচু সলজ্জে ঘাড় নাড়ে।

আমার মেঠো গান। আচ্ছা, সে না হয় দেখা যাবে এর পর।

তোমার একখানা কালোয়াতি শুনি। ওস্তাদের কাছে যাচ্ছও তো কম দিন নয়।

এমনি একটু-আধটু অনুরোধের অপেক্ষায় ছিল—পাঁচু বলতেই আ-আ-আ করে উমেশ তান ধরল।

চায়ের জল গরম করতে পদ্ম রান্নাঘরে গেছে। উমেশ ডাক দেয়, গেলে কোথা পদ্মমুখী? ঘরে কাবাবচিনি আছে? কিম্বা লবঙ্গ?

লবঙ্গ এনে দিয়ে পদ্ম একপাশে পিঁড়ি পেতে বসল। বসে চা তৈরি করতে লাগল। তান ছেড়ে উমেশ গান ধরল এইবার। গৃহস্থ-বাড়ি ওস্তাদি কসরতের জায়গা নয়—কৃষ্ণলীলার সাদা-মাঠা একটা গান ধরেছে। জল আনিবার করে ছলা, কদমতলায় দেখিস কালা—

চোখ বুজে গাইছিল উমেশ। গানটিও দীর্ঘ। আদ্যন্ত বার চারেক অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে অবশেষে সে চোখ খুলল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগল তোমাদের?

পদ্মর মা মুখ্যিবুড়ি দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে বুড়ি বলে, আহা-হা—কি একখানা গাইলে! পাঁকে ডুবে আছি—তুমি বাবা, ঠাকুরদেবতার কথা শুনিয়ে যেও এমনি মাঝে মাঝে।

পাঁচুও বলে, বেশ-ভালো—

মুখ পুড়ে যায় এই ভয়ে পাঁচু চা খায় না। কষ্টেসৃষ্টে দু-একবার খেয়ে দেখেছে, স্বাদও কিছু নেই। কয়েক কুচি সুপারি মুখে দিয়ে সে উঠে পড়ল। বলে, বৃষ্টি ধরল বোধ হয় এইবার। দেখিগে যাই—দোকানে ঝাঁপ এঁটে পদাও হয়তো ঘুম মারছে।

পাঁচু বা মুখ্যিবুড়ি কি বলে না বলে তার জন্য উমেশের মাথাব্যথা নেই। পদ্মর দিকে চোখ ফিরিয়ে দ্বিধান্বিত ভাবে প্রশ্ন করল, তুমি যে কিছু বলছ না?

কাঁসার বাটিতে চা ঢেলে উমেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে পদ্ম একেবারে মোক্ষম মন্তব্য ঝাড়ল।

যার কর্ম তাকে সাজে। তোমাদের মোড়ল-পাড়ায় কেউ কখনো গিয়েছে এপথে? তাদের বৃত্তি ধরো, জুত হবে। গাওনা-বাজনা হবে না তোমায় দিয়ে।

কেন? কি জন্য হবে না? বাড়ুজ্জে মশায় কি বলেন জানো? আমার কথায় পেত্যয় না পাও, শুনে এসো তা হলে তাঁর কাছে গিয়ে—

কথা আটকে আসে। হায় রে, এই পদ্মই আগে আগে তার আনাড়ি গলার গানের কত প্রশংসা করত? কষ্ট করে এখন যত শিখছে, ততই কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে? ব্যাপার হল, ভূত স্কন্ধে এসে ভর করেছে—সেই বলাচ্ছে ওকে দিয়ে এইরকম।

দুঃখিত স্বরে বলে, পরের মুখের কথা একেবারে মুখস্থ বলে গেলে পদ্ম? আগে তো এরকম ছিলে না।

উঠে দাঁড়াল উমেশ। যাবার মুখে বলল, আচ্ছা—খালি গলা আর নয়। হরমনি-টনি নিয়ে আবার একদিন আসব। সেদিন কি বলো শোনা যাবে।

পদ্ম ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়।

উঁহু, ফুরসত নেই। এক-সংসারের কাজ নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাই, বসে বসে গান শুনব কখন?

গভীর স্থির দৃষ্টিতে উমেশ ক্ষণকাল তার দিকে তাকিয়ে থাকে

তারপর হাতের ইসারায় বাইরে ডেকে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, পদ্ম, সামাল করে দিচ্ছি—বিদেশিরে মন দিও না, বিপাকে পড়বে।

হাসি-হাসি চোখ তুলে পদ্ম বলল, না—মন ঝাঁপিতে পুরে রেখে দিয়েছি। দেশি মানুষ কেউ চায় তো ঝাঁপিসুদ্ধ দিয়ে দেবো।

তারপর ফিক করে হেসে বেহায়া মেয়ে বলে, দিই তো শুধু জান-মান দেবো বিদেশিকে।

উমেশ বলে, হাসি-মস্করা নয়। লোকে নানান কথা রটাচ্ছে পদার সম্পর্কে—

পদ্ম গম্ভীর হয়ে বলে, সে একজন তো তুমি। হাতনেয় বসে সেদিন তার চিটেগুড়ের ব্যবসা নিয়ে কত রকম কুচ্ছো করলে—

কথার মধ্যেই পদা এসে পড়ে।

চা হচ্ছে, পাঁচু গিয়ে বলল। থাকে তো দাও আমারে এট্টু—

উমেশের দিকে নজর পড়তেই সে বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে।

কি বলেছিস আমার নামে ? আমি নাকি ঠেঙানি খেয়ে খেয়ে বেড়াই সব জায়গায় ?

উমেশও সমান তেজে জবাব দেয়, মিছে কথা ? বড়দলের আড়তদার সকলে মরে যায় নি—চলো না, মুকাবেলা করে আসি।

পদা সুর বদলে বলল, বেকায়দায় পড়লে সবাই অমন খেয়ে থাকে—হেঁ-হেঁ, সব শম্মাকে জানি। তুই খাস নি ?

বিষম রেগে গিয়ে উমেশ বলে, না—কক্ষনো না। কারো সঙ্গে জুয়াচুরি করতে যাই নে, আমি ঠেঙানি খাব কেন ?

খাস নি—খা তা হলে। বড় বাড় হয়েছে, ভারি লম্বা-লম্বা কথা!

উমেশের গালে মারল বিষম এক চড়। চোখে সে অন্ধকার দেখল—চড় নয়, যেন হাতুড়ির ঘা। তারপরেও ঘুষি উদ্যত করেছে।

পদ্ম মাঝখানে পড়ে বাঁচিয়ে দিল।

কি করো? এই তো তালপাতার সেপাই—মরে যাবে যে।

ফাঁক পেয়ে উমেশ ছুটে পালাল। উঠান ছাড়িয়ে রাস্তার উপর পড়ে চেঁচায়, দেখে নেবো—চিনিস নি সাঁইতলার মোড়লদের। হাত দুখানা থাকবে না। একখানা মুচড়ে ভেঙে নেবো—এই যে মারলি, তার বদলে।

৭

ঘটনাটা চাউর হয়ে পড়ে। মান্যধর মোড়লের ছেলের গায়ে হাত তুলেছে কোথাকার কোন্ হুটকো লোক। এখন আর একা উমেশের নয়—সমগ্র মোড়লপাড়ার এবং ক্রমশ সাঁইতলা গ্রামেরই মান-অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামসুদ্ধ মরে গেছে কি একেবারে?

পাড়ার বল পেয়ে মান্যধর নিজে গিয়ে একদিন পাঁচুকে শাসাল, ভালোয় ভালোয় ওটাকে বিদেয় করো বলছি—নইলে কপালে তোমার ভোগান্তি আছে।

পদা ছোকরা সত্যিই কাজের, সন্দেহ নেই। মাথায় টিন ও হাতে বোতল নিয়ে পাঁচু বাড়ি বাড়ি কেরোসিন সরবরাহ করে বেড়াত, সেই মানুষ এরই মধ্যে দোকান দিয়ে বসেছে—সত্যি কথা বলতে

গেলে সে শুধু পদারই গুণে। এইভাবে অন্তত যদি বছর খানেক চালানো যায়—পাঁচুর আশা, হাতে-গাঁটে তু-পয়সা জমিয়ে ভাল পণের মেয়ে ঘরে আনতে পারবে। হাঁ-না কিছু না বলে মান্যধরের পাশ কাটিয়ে সে সরে গেল।

পদ্ম মারমুখি হয়ে এসে পড়ে।

তোমার চালের উপর চাল দিয়ে বসত করি নে মোড়ল-খুড়ো, যে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে কথা শোনাতে এসেছ। ডেকে আনো তোমার ওমশা আর মাতব্বর দশজনাকে—ওর যা বলবার সকলের মুকাবেলা বলবে।

অপমানিত মান্যধর রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল।

কদিন পরে এক রাতে দমাদম ঢিল পড়তে লাগল পাঁচুর ঘরের বেড়ায়। পদা এদিকে ভারি শৌখিন—মাটিতে শোয় না, এক তক্তাপোশ জোগাড় করে এনেছে। শিয়রের বালিশ শুধু নয়—পাশবালিশ চাই তার। ছেঁচা-বেড়ার চৌরি ঘরখানায় একদিকে পাশপালিশ আর একদিকে পাঁচু—মাঝখানে রাজা-মহারাজার মতো সে ঘুমোয়। আওয়াজ পেয়ে পদা ঝাঁপ খুলে বেরুতে যাচ্ছে, হাত ধরে পাঁচু তাকে টেনে রাখে।

গোঁয়াতুর্মি কোরো না। কজন এসেছে, ঠিকঠিকানা নেই। ওরা তো চায়ই তুমি বাইরে বেরোও—হাতের মাথায় যাতে পেয়ে যায় তোমাকে।

সকালবেলা দেখা গেল, বিশ্রী কাণ্ড—চষা আউশ-ক্ষেতের এত ঢেলা উঠানে পড়েছে যে পা ফেলবার জায়গা নেই।

এই রকম ব্যাপার চলল প্রায় অবিচ্ছেদে। দিনমানে পাঁচুর ঘরবাড়ি ঠিকই—সন্ধ্যা হতে না হতে আর কারা যেন সমস্ত দখল

করে নেয়। বাড়ির চারটি প্রাণী বেলাবেলি খেয়েদেয়ে দু-ঘরের ঝাঁপ এঁটে দেয়। ঘুমোয় না—আতঙ্কে ঘুম হয় না—শব্দ-সাড়া শুনে লোকের গতিগম্য সম্পর্কে যেটুকু আন্দাজ পাওয়া যায়, তাই ফিসফিসিয়ে বলাবলি করে। দুমদুম উঠান কাঁপিয়ে পাঁয়তারা কষে বেড়াচ্ছে···এই শোন দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়ছে ঢেঁকিশালে। মউজ করে ফড়ফড় আওয়াজে হুঁকো টানছে, সে রকমও যেন শুনতে পাওয়া গেল।

এক রাত্রে ফেউ ডাকছে খুব। একটু পরে গোয়ালে হুড়মুড় করতে লাগল। মুখ্যিবুড়ি চেঁচাচ্ছে, গোয়ালে কেঁদো পড়েছে—ওরে পদা, ও পাঁচু, উঠে আয় তোরা।

পদ্ম তাড়া দেয়। চুপ করো মা, কেউ ওরা বেরুবে না।

বেরুবে না—আর ইদিকে গরু-ছাগল মেরে মেরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাক—

বেরুলে দুম করে মাথায় লাঠি মারবে।

ও মা কি বলে! কেঁদোবাঘে লাঠি মারবে?

গজর-গজর করে অবশেষে বুড়ি থামল। চারিদিকে নিঃশব্দ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেঁদোবাঘ হঠাৎ বিকৃত গলায় কথা বলে উঠল বাইরে থেকে।

আচ্ছা থাক্—ভালমন্দ খেয়ে নে। কতদিন বাঁচবি এরকম করে?

আবার এক রাত্রে হঠাৎ দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঘরদোর পুড়িয়ে জতুগৃহ-দাহের অবস্থা করে বুঝি! অন্ধকারের মধ্যে নৈশ বাতাসে ভলকে ভলকে হল্কা বেরুচ্ছে, ছেঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঘরে ঢুকে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। চেঁচামেচিতে লাঠিসোটা নিয়ে পাড়ার লোক এসে পড়ল। মানুষ দেখে তখন

পাঁচুরা ঝাঁপ খুলেছে। শয়তানি দেখ, একটা কলসি ঠেশান দিয়ে গেছে ঝাঁপের গায়ে, ঝাঁপ খুলতেই কলসি কাত হয়ে কি-এক তরল বস্তু গড়িয়ে পড়ল। আর পাঁচু লাফিয়ে পড়তে ভূমিশায়ী হল পা পিছলে। কলসিতে কি রেখেছিল বলো দিকি? কাদা আর পচা-গোবর, কিম্বা তার চেয়েও খারাপ কিছু—দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম। খড়ের গাদা থেকে খড় টেনে ছাঁচতলায় এনে আগুন দিয়েছে। দিয়েই সরে পড়েছে। আগুন দেওয়াটা আসল নয়। বর্ষার সময় চাল ভিজে—আগুন ধরবে না, শত্রুরা জানে। ওরা চেয়েছিল রাত-দুপুরে নোংরা বস্তু মাখিয়ে নরক ভোগ করানো। আড়ালে-আবডালে—হয়তো বা কোন গাছের মাথায় বসে তারা এখন এই দুর্ভোগ দেখে হেসে খুন হচ্ছে।

উৎপাত সীমা ছাড়িয়ে গেল। পাঁচুরা ইতিমধ্যে ছেঁচা-বাঁশের গায়ে আবার এক সারি গরানের ছিটে লাগিয়ে বেড়া বেশি মজবুত করেছে, বেড়া ভেঙে যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে। তা হলে হবে কি—ভয়াবহ কাণ্ড! একদিন দেখা গেল, তীক্ষ্ণধার কালা বিঁধে আছে পদার শয্যার পাশবালিশে। বেড়ার দিকে সুবিধা করতে না পেরে, বোঝা যাচ্ছে, তারা চালের উপর উঠেছিল। চালের ছাউনি কিছু উঁচিয়ে ফেলে তারই মধ্য দিয়ে লম্বা আছাড়ের কালা নামিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে ঠিক তাকমতো—হিসাব করে—যে জায়গাটায় পদা শোয়। উঃ, কি অবস্থা হত যদি ঐ রাত্রে সে নিজের জায়গায় ঘুমিয়ে থাকত!

পদা ওদের চেয়েও সেয়ানা। গণ্ডগোল জমে উঠবার পর থেকে বেশ শব্দসাড়া করে তারা তক্তাপোশের উপরে শোয়। খানিক পরে আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দু-জনে চলে যায়

তক্তাপোশের নিচে। উপরে বিছানার উপর পাশবালিশটাকে কাঁথা চাপা দিয়ে রাখে—যেন মানুষই ঘুমুচ্ছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

কালাটা বালিশ থেকে ছাড়িয়ে তুলতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হল। কালা হাতে তুলে পদা হি-হি করে হাসে।

ভুঁড়ি ফাসাতে চেয়েছিল—বুঝলে? কি রকম ধার দিয়ে এনেছে দেখ, চকচক করছে। বিষ লাগানো থাকে এর আগায়। একটু যদি কোথাও খুঁচিয়ে দিতে পারত—আর দেখতে হত না, নির্ঘাত খতম।

মুখ্যিবুড়ি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। পাড়ার লোক জমায়েত হয়ে কাণ্ডটা দেখছে সকৌতুকে। পদ্ম গালে হাত দিয়ে শুকনো মুখে যেন অসাড় হয়ে বসে আছে।

পরের দিন দেখা গেল, পাঁচুর ঘরবাড়ি দোকানপাট খা-খা করছে, সবসদ্ধ পালিয়েছে। উমেশের কথা খাটল না অবশ্য—পদা দুটো হাতই অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিয়ে চলে গেছে।

কেতুচরণ মান্যধরের বাড়ি বেড়াতে এলো। এসেছে উমেশের কাছে—এখানে থাকার সময় উমেশের সঙ্গে বড় ভাব জমেছিল। উমেশকে সে ভোলে নি।

উমেশ সমাদরে আহ্বান করে, এসো—। হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

কেমন আছ?

কেতুচরণ অবাক হয়ে গেল। ডুগিতবলা, ঢোলক, ফুলট-বাঁশি, কত্তাল, খঞ্জরি, এমন কি হারমোনিয়ামও—কত রকম বাদ্যযন্ত্র,

তার সীমাসংখ্যা নেই। মেজের চতুর্দিকে সমস্ত ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে একটা মাদুর পেতে উমেশ কেতুকে নিয়ে বসাল।

গান শোন একখানা—

একখানা বলে পর পর চারখানা শোনাল। জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগে?

কেতুচরণ গানের কিছু বোঝে না, তবু মাথা নেড়ে তারিফ করে, ভালো—

তবে যে বলে আমার দ্বারা হবে না?

হবে না কি বলো, এই তো হয়ে গেছে—

উমেশের অবস্থা দেখে সহানুভূতিপরবশ হয়ে আরও জোর দিয়ে কেতু বলে, এত ভালো এ পাইতক্কের ভিতর আর কেউ গায় না।

দরদের কথায় হঠাৎ উমেশের চোখ ভরে জল আসে।

আহা, কাঁদো কেন?

শোন ভাই একটা কথা। একঘর লোক এরা ভিটেছাড়া করে দিল। আমি এ সইতে পারি নে। কোথায় দুয়োর-দুয়োর ভিখ মেঙে বেড়াচ্ছে—খাচ্ছে কি খাচ্ছে না—

পাগলের মতো সে নিজের গাল চড়ায়।

আমিই বলেছিলাম। বুঝলে? রাগের মাথায় মাথামুণ্ডু কি বললাম, তাই ওরা সত্যি ভেবে নিল। একজনের ঘর ভেঙে দিলাম, মহাপাতকী আমি ভাই—

৮

মতিরাম একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করলেন, দুটো দুটো পেটে খাবার জন্য নিশ্চয় এসো নি। উদ্দেশ্যে কি, খুলে বলো তো বাবা—

কেতুচরণ খপ করে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধরল।

কি হল—অঁ্যা? পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লে, হয়েছে কি তোমার?

দয়া করতেই হবে দয়াময়—

ধীরে ধীরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে মতিরাম বললেন, কি করতে পারি বলো? আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—

বড়রা বলেন ঐ রকম। সহজে ধরা দেন না। ঐ যদি পেত্যয় পাবোঁ, এত জায়গা থাকতে বাদার জঙ্গলে এসে পড়লাম কি জন্যে?

একটু বিরক্ত স্বরে মতিরাম বলেন, ভবানী-বিষয় ছেড়ে খুলেই বলো না কি ব্যাপার—

কিছু শিক্ষাদীক্ষা দেবেন—এই আর কি! কত জায়গায় ঘুরলাম, শুধুই ফুক্কুড়ি। কোন শালা কিছু দিল না।

শিখতে চাও? কি শিখবে এখানে থেকে?···তা বেশ, দোকানে গিয়ে বোসো সকাল থেকে। পতিরামকে বলে দেবো—হাতে ধরে কাজ শেখাবে।

সেকরার কাজ নয় আজ্ঞে—

কেতুচরণ টিপিটিপি হাসে। কুঞ্চিত চোখে চেয়ে আছেন মতিরাম। কেতু বলে ফেলে, নিদালি মন্তোরটা আমায় শিখিয়ে দিতে হবে সাধু মশায়! এ দিগরের মধ্যে আপনারই শুধু ও-জিনিস জানা আছে, সকলে বলে।

কি—কি মন্তোর বললে?

ঐ যে ধুলো পড়ে দাওয়ায় রেখে দিলে ঘরের মানুষ বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়—

ঘুমোক আর জেগে থাকুক—তোমার সেজন্য মাথাব্যথা কেন? মন্তোর পড়ে ঘুম পাড়িয়ে করতে চাও কি তুমি?

কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় উগ্র হচ্ছে। কিন্তু কেতুচরণ দৃক্‌পাত করে না, হাসছে তেমনি।

বজ্রকণ্ঠে মতিরাম বলেন, মতলব কি তোর?

কেতু কাতর হয়ে বলে, গতর জল করেও কিছু করতে পারলাম না। গুরু আপনি, গুরুর কাছে লুকোচুরি কি—হাতে-গাঁটে কিছু যদি রেস্ত হত বিয়ে করে দশজনার একজন হতাম। ছন্নছাড়া জীবনে ঘেন্না হয়ে গেছে। তা কলিযুগে সোজা পথে পাবেন শুধুই তেপান্তরের মাঠ—রাতদিন খেটে পেটের ভাতটা জোটানো যায় না। আপনার নাম-যশ শুনে আশায় আশায় ছুটে এসেছি সাধু মশায়—

নাম-যশ শুনেছিস যে, নিদালি পড়ে আমি মানুষজন ঘুম পাড়াই। চুরি-চামারি আমার পেশা—তাই শুনেছিস?

কেতুচরণ বলে, মন্তোরের গুণে রাজার ঐশ্বর্য হয়েছে—সবাই সেই কথা বলে।

মতিরাম খড়ম তুলে ছুটে যান।

বেরো ছুঁচো পাজি কাঁহাকা—

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কেতুচরণ তখনকার মতো বাইরের ঘরে নিজের আস্তানায় চলে গেল। অন্ধকারে মাদুরটা টেনে নিয়ে একটু গড়িয়ে পড়বার উদ্যোগে আছে, মতিরাম সেখানেও গিয়ে পড়লেন।

এ বাড়ির ত্রিসীমানায় নয়। এত বড় কথা মুখের উপর বলিস—অঞ্চল-ছাড়া করব তোকে। বেরো—বেরিয়ে যা বলছি ঘর থেকে—

গোলমাল শুনে এলোকেশী অবধি চলে এসেছে।

করো কি বাবা? বৃষ্টি পড়ছে—এর মধ্যে কোথায় যাবে?

না—

বৃষ্টিটা অন্তত ধরে যাক।

উঁহু, এক্ষুনি—এই মুহূর্তে। এমন কথা আমার সম্বন্ধে যে ভাবতে পারে, কিছুতে তার ঠাঁই হবে না।

ঝুপঝুপে বৃষ্টি। ঘন অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, জলকাদায় হাঁটু অবধি ডুবে যায়। এই দুর্যোগের মধ্যে বেরুতে হল কেতুচরণকে। মতিরাম তিলার্ধ তিষ্ঠোতে দেবেন না গৃহাঙ্গনের মধ্যে—মেয়ের মিনতিতেও নয়। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়েই এক চাষীর ধান তোলবার খ'লেন; একখানা চালাঘরও আছে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে কেতুচরণ সেই চালার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু যথাসময়ে যেই পাত পড়েছে—আহারার্থী সকলে এঘর থেকে ওঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, এই থেকে বুঝতে পারা গেল—কেতুচরণও ছুটতে ছুটতে উঠান পার হয়ে দাওয়ায় উঠে এঁটো-পাতের সামনে বসে পড়ল। ভাত পাতে দিয়েছে এমনি

সময় মতিরাম এলেন। কেতুকে দেখে তেড়ে যাচ্ছিলেন, এলোকেশী হাত টেনে ধরল।

পাতের কোল থেকে তুলে দিও না বলছি বাবা—

চু-উ-উ—করে একদিন ঝিলিক হেনে পালিয়েছিল। এলোকেশীর এই আর এক মূর্তি—বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মতিরাম থমকে দাঁড়ালেন। স্বর নরম হল।

বেশ, খেয়ে-দেয়ে বিদায় হয়ে যায় যেন। এ বাড়ি এই শেষ খাওয়া। তিন-চারটে কাঠের ভরা ভোররাত্রে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার একটায় চলে যাক যে জায়গায় ওর খুশি।

রায় দিয়ে মতিরাম রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন।

কেতু ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করে অভ্যাসমতো কলকেয় আগুনের জন্য রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়েছে। এলোকেশী বলে, চলে যাচ্ছ তাহলে?

হুঁ। তামাক ছিলিমটা খেয়ে—

এলোকেশী ভিতরে ডাকল, শোন—

এত জনের রাঁধাবাড়া করে ক্লান্ত সুন্দর মুখ রক্তাভ হয়েছে। হাত ধরল সে। সেই একদিন লা-ভাঙা পার হয়ে এসে নতুন বাঁধের উপর—আর এই। কেতুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

এলোকেশী বলে, রাগ পুষে রেখো না কিন্তু—

সহসা জবাব আসে না। জড়িয়ে জড়িয়ে কোন গতিকে কেতু বলল, উঁহু—রাগের কি আছে?

বাদলার মধ্যে দূর-দূর করে বাবা তাড়িয়ে দিচ্ছে, তবু রাগের কিছু নেই?

মুখ টিপে হেসে এলোকেশী বলে, আমার খাতিরে বলছ ?

এতক্ষণে উত্তর খাড়া করেছে কেতুচরণ। বলে, গুণীন লোকে কত লাথি-ঝাঁটা মেরে থাকেন। উনি তবু হাতে মারেন না—শুধু মুখেই তুটো একথা-সেকথা বলছেন। এতে রাগ করলে মন্তোর আদায় হয় ?

কাঠের নৌকায় চলে যেতে বয়ে গেছে কেতুর। আবার সে সেই চালাঘরে গেল। রাতটা তো কাটুক এইভাবে, দিনমানে দেখা যাবে।

ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হচ্ছে—জলের ছাঁট থেকে গা বাঁচানো দায়। ভিজে মেঝে—একটু যে জুত করে বসবে, সে জায়গা নেই। ঘুমও নেই চোখে। এলোকেশীর ঐরকম হাসি—তার হাত ধরার কথা মনে ভাবছে। এলোকেশীর হাসি ঝিলিক দিচ্ছে যেন বৃষ্টি-বাদল ও অন্ধকারের মাঝে।

রাত তুপুর। একটা ব্যাপার দেখে তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। কটা লোক অতি সন্তর্পণে হুড়কোর ফাঁকে গুঁড়ি মেরে মতিরামের শোবার ঘরের দিকে গেল। এ কাজের কাজি কেতুও তো ছিল কিছুদিন—চলাফেরা দেখে বুঝতে দেরি হয় না, তারই স্বগোত্র লোক। নিঃশব্দ-পায়ে সে-ও গিয়ে কাছাকাছি বাতাবিলেবু-গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

তিন জন। ঠুক-ঠুক করে একজনে দরজায় টোকা দিল বার কয়েক। অতঃপর আর সন্দেহের কিছু নেই—গৃহস্থর সাড়া নিচ্ছে। তিন জন হোক অথবা দশজন হোক, কেতু গ্রাহ্য করে না। হঠাৎ

ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জাপটে ধরল লোকটাকে। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, অপর দু-জন ছুটে পালাল।

খুট করে দরজা খুলে মতিরাম বেরুলেন এই সময়। চোরের চিৎকার কানে যেতে না যেতে বেরিয়ে পড়েছেন, অতএব জাগ্রত ছিলেন তিনি। সাধুসন্ত লোক তো—না ঘুমিয়ে জপতপে নিমগ্ন ছিলেন সুনিশ্চিত।

কি হে? নিশিরাত্রে লাগিয়েছ কি তোমরা?

কেতুচরণ জাঁক করে বলে, বেটা চুরির মতলবে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিল। দরজায় ঘা দিয়ে পরখ করছিল। বুঝতে পারে নি যে যম পিছনে রয়েছে।

এমন আসন্ন সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিল, অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার—মতিরামের আক্রোশ কেতুচরণের প্রতি। চোখ পাকিয়ে বলেন, তোকে তাড়িয়ে দিয়েছি না? কি জন্যে আবার বাড়ির চৌহদ্দির ভিতর ঢুকেছিস?

কেতুচরণ বলে, আমি না এলে এতক্ষণ যে আপনার সর্বস্ব কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক বেরিয়ে যেত সাধুমশায়—

লোকটাকে এখনও ধরে আছে। মনে হল, কি যেন রয়েছে লোকটার কাপড়ের মধ্যে—কেতুর গায়ে ফুটছে। খুব জোরে নাড়া দিতে আর এক তাজ্জব। সিঁদ-কাঠি বেরিয়ে ছিটকে পড়ল।

থাপ্পড় কষিয়ে দিল কেতুচরণ। পালোয়ানের হাতের থাপ্পড়ে লোকটা চোখে সরষেফুল দেখে।

চেনেন তো সাধুমশায়, কি জিনিস এটা—কোন্ কর্মে লাগে? এইবারে পেত্যয় হল?

মতিরাম কিন্তু আরও ক্ষেপে ওঠেন।

তোকে কে খবরদারি করতে বলেছে রে হারামজাদা? মাইনে-করা দারোয়ান নাকি তুই?

অকারণ গালিগালাজে কেতুচরণও ধৈর্য হারায়। বুক চিতিয়ে একেবারে কাছে গেল মতিরামের।

মুখ সামলে কথা বলবেন সাধুমশায়। ভালোর তরে বলে দিচ্ছি। গুরু বলে মান্য করি, কিন্তু তাতে রক্ষে হবে না।

মতিরাম চমকে গেলেন। কিন্তু পরিনাম যা-ই ঘটুক, সঙ্গে সঙ্গে নরম হওয়া চলে না। বললেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি, তাই যাবি কিনা বল্—

কেতু ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে বলল, না—। দম নিয়ে আবার বলে, একটা হেস্তনেস্ত না করে আমি এক-পা নড়ব না এই জায়গা থেকে।

কাপড়ের প্রান্ত কোমরে জড়িয়ে গেরো দেওয়া। কাপড় ধরে পিছনে কে আকর্ষণ করছে কেতুকে। বাঁ হাতে সরিয়ে দিতে গিয়ে অতি-কোমল স্পর্শ—এলোকেশী যে! কখন এলোকেশী এসে পড়েছে এই বচসার মধ্যে। এলোকেশী হাত ধরে টানছে তাকে পিছন দিকে।

হাত ছিনিয়ে নিয়ে কেতু বলল, চোর ধরলাম—তার জন্যে বাহবা নেই। উল্টে যাচ্ছেতাই করে বলা। চেঁচামেচি করব। লোকজন আসুক—বেটার কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাক। তখন নড়ব এখান থেকে।

এসো বলছি—

কেতুচরণ গ্রাহ্য করে না।

তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে এলোকেশী বলে, এত করে বলছি,

কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না? পায়ে মাথা খুঁড়ব নাকি তোমার? ছেড়ে দিয়ে চলে এসো বলছি।

চু-উ-উ—করে মাঠ ভেঙে পালিয়েছিল, সেই চপল মেয়ের মুখে এমন পাকা বুদ্ধির কথা! বাঘবন্ধন মন্ত্রে বহুরদারেরা জঙ্গলের বাঘ বশ করে; শিকারের টুঁটি ছেড়ে বাঘ পোষা কুকুরের মতো সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। কেতুচরণও কি মন্ত্রের জোরে চোর ছেড়ে দিয়ে নত মাথায় এলোকেশীর পিছু-পিছু চলল। আর—একি, কি করে দেখ বেহায়া বেপরোয়া মেয়েটা! বাপ-খুড়ো এবং এক-বাড়ি লোকের চোখের সামনে তার হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল।

ব্যাপারটা কি তা হলে? অনেক রকম কথা মনে আসে, নানা সন্দেহ হয়। সাধুমশায় প্যাঁচে পড়ে গেছেন, ভাবে ভঙ্গিতে মালুম হচ্ছে। তবে এলোকেশী মেয়েটা ভাল। সে যা বলছে, না শুনে পারা যাবে কেমন করে?

যাবার সময়টা আমাদের মুখ না পুড়িয়ে তুমি ছাড়বে না?

ঐ কথারই জের ধরে কেতুচরণ তম্বি করে, এমন করে মুখ পোড়াব—কেউ আর না তাকায় তোমাদের দিকে। নয় তো সাধুমশায়কে সামাল করে দাও, বারদিগর আমার চলে যাবার কথা মখ দিয়ে বের না করেন।

এলোকেশী ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বলে, যাবেই তুমি। এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরে আমি থাকতে দেবো না। পুরুষ-জোয়ান কেন হেনস্তা সয়ে পড়ে থাকতে যাবে এখানে?

তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ মৃদুকণ্ঠে বলে, থাকব না আমিও।

কেতু আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি ?

জল টলমল করে উঠল এলোকেশীর চোখে।

কি সুখ আছে বলো দিকি এই আগুনে পুড়ে রাঁধাবাড়া আর দেওয়া-থোয়ার মধ্যে ? কথা বলবার জো নেই—ভালমন্দ দুটো কথা কারো সঙ্গে বলতে গেলে বাবা কি খোয়ারটা করেন তা সেদিন চোখেই তো দেখলে !

ম্যানেজারের খোয়ার হয়েছে—সে কাজে কেতুচরণই তো অগ্রণী। এলোকেশীর মুখের দিকে চেয়ে তার মনের তলায় কি আছে, কেতু বুঝবার চেষ্টা করে। এত যে বৈরাগ্যের বুলি বলল, সে কি দুর্লভের সেই অপমানের জন্য ? একটা প্রশ্ন অনেক দিন কেতুচরণের মনে আনাগোনা করছে, সেইটাই সে জিজ্ঞাসা করে বসে।

তোমার মতো মেয়ের এতদিনের মধ্যে ঘর-সংসার কেন হল না তাই ভাবি।

বাদা অঞ্চলে মানুষ কোথা ? সবই তো জন্তু-জানোয়ার—

অতীত জীবনের যবনিকা একটুখানি তুলে ধরল এলোকেশী।

ছেলেবেলা এক মহকুমা-শহরে থাকতাম। সে অনেক দূর। ইস্কুলে যেতাম—

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল, বিশ্বাস করতে পারো, বিনুনি দুলিয়ে আমি ইস্কুলে যেতাম—বিনুনির আগায় রাঙা ফিতে বাঁধা ? উকিল-হাকিমদের মেয়ের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতাম ? সব ছেড়েছুড়ে আসতে হল অজঙ্গি জায়গায়। সত্যি বলছি কেতু, একটুও ভাল লাগে না। আমায় উদ্ধার করতে পারো এই জল-জঙ্গল থেকে ?

কেতুচরণ সাগ্রহে বলে, যাবে সত্যি ?

যাবোই। একটু ভাল জায়গা পেলে বেরিয়ে পড়ি। এখানে দম আটকে আসে।

নিশ্বাস ফেলে সে চুপ করল। ক্ষণকাল উন্মনা হয়ে থাকে। স্নিগ্ধার কথা মনে পড়ে যায়—নামের বানানটা রপ্ত করতে এলোকেশীর খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সকল মেয়ের মধ্যে বেশি ভাব ছিল ঐ স্নিগ্ধার সঙ্গে। এখন যদি দেখা হয়ে যায়, সে কি চিনতে পারবে ? কোথায় কোন্ বড় ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে স্নিগ্ধার! সোনাদানা পরছে, মোটর চড়ে বেড়াচ্ছে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখছে, কত শৌখিন সাজ-পোশাক তার অঙ্গে···

অনেক দিন পরে অতীতের মহকুমা-শহর এলোকেশীকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। কেন সে থাকবে একরকম ভাবে—কিসের জন্য ? মতিরামের তত দোষ নেই—মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তিনি অনেকবার করেছেন। এলোকেশীর মা আপত্তি করত। মা মারা যাবার পর—মেয়ে ইতিমধ্যে বড় হয়ে গেছে—এলোকেশীর নিজেরই ঘোরতর আপত্তি এখন। জাত-কুল হিসাব করে একটা আধা-জংলির সঙ্গে সাত-পাক ঘুরিয়ে দেবে—সেই লোকের বাড়ি ধান ভেনে কাপড় কেচে জল তুলে বাসন মেজে চিরজন্ম কাটবে, সে তো ভাবতেও আতঙ্ক হয়।

রাত শেষ হয়ে এসেছে, কেতুচরণ তখন ঘর থেকে বেরুল। কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে, ধমনীতে রক্ত নয়—আগুনের ধারা বইছে যেন। ঈশ্বর, হেই মা বনবিবি, এত বড় পৃথিবীর মধ্যে হাত দশেক জায়গায় ছোট একটু ঘর তুলতে দাও কেতুকে। ঘর করবে সে এলোকেশীকে নিয়ে। অদ্ভুত মেয়ে বটে এলোকেশী—

নিঃসঙ্কোচ। কেতুর গায়ের বল দেখেই মজে গেছে একেবারে। নোনা রাজ্যে অমন ফুটফুটে রং বজায় রাখে কি করে? পদ্মফুলের মতো ভুরভুরে গন্ধ বেরোয়—কি মাখে সে গায়ে? কিন্তু গন্ধ বা গায়ের রং নিয়ে কেতুচরণের মাথাব্যথা নেই—এসবের মহিমা সে বোঝে না। মুগ্ধ হয়ে দেখে সে এলোকেশীর নিটোল স্বাস্থ্য। আর দেখে দুরন্ত সাহস। চলনে-বলনে ভাবে-ভঙ্গিতে যৌবনের উত্তাল ঢেউ যেন ছড়িয়ে বেড়ায়—যেন ছিটিয়ে দেয় চারিপাশে যারা আছে, তাদের মধ্যে।

৯

চলে যাচ্ছে কেতু। যাচ্ছে বটে, কিন্তু ফিরে আসবে মোটামুটি রকমের টাকার যোগাড় করে। আসবে ফিরে এলোকেশীকে নিয়ে যাবার জন্য।

লা-ভাঙার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে—চলতি নৌকা পেলে বলে-কয়ে পার হবে। এখনো মুখ-আঁধারি, ভাল করে সকাল হয় নি। হঠাৎ দেখা গেল, হনহন করে দুর্লভ হালদার চলেছে।

ম্যানেজার মশায় না? চললেন কোথা এত সকালে?

নৌকোর চেষ্টায়। কোন শালা নৌকো দেবে না। দেড়া ভাড়া কবুল করলেও না। বলে, মাটি লেগে যাবে। শোন কথা! নৌকোয় মাটি লাগবে না, জল লাগবে না, বাতাস লাগবে না—তবে গাঙে-খালে না রেখে কাঁথা মুড়ে সিন্দুকের মধ্যে রাখলেই তো হয়!

বলতে বলতে দুর্লভ কেতুর দিকে আসছে। চাষের ঘেরির চারিদিক বাঁধবন্দি—নদীর নোনা জল ঢুকতে না পারে। সেই বাঁধ অবিরত সতর্ক প্রহরায় রাখতে হয়—বিশেষ এই বর্ষাকাল ও কোটালের সময়টা। চারিদিক জলমগ্ন—কাছাকাছি এক-কোদাল মাটিও পাওয়া যায় না। মাটি অনেক দূর থেকে এনে বাঁধে ফেলতে হয়—সেইজন্য নৌকার প্রয়োজন।

কেতু বলে, মাটি বওয়াবয়ি করতে গেলে নৌকো সত্যি বড্ড জখম হয়ে যায়, নতুন করে আলকাতরা দিতে হয়। তা আপনাদের কাছারির নৌকো কি হল?

সেটা যে বাবু নিয়ে রায়গাঁ চলে গেলেন। সেটা থাকলে কারো খোশামুদির ধার ধারি? রায়গাঁয় ভারি একটা চুরি হয়েছে রে—বাবু খবর পেয়ে ছুটে গেছেন। এদিকে আর এক সর্বনাশ—পনের-বিশটা ঘোগ হয়েছে কোটালের জলের চাপে। এখন ঝিরঝির করে জল ঢুকছে। আকাশের যা অবস্থা—যেমন-তেমন একপশলা বৃষ্টি হলে বাঁধ ভেঙে নৈরেকার হবে।

এত বড় দুঃসংবাদেও কেতু মুখ টিপে হাসে। ব্যাপারটা এই আবাদ অঞ্চলের অতি-সাধারণেও বোঝে। মধুসূদন রায় হাজির নেই—যত প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা অতএব এখনই। বাঁধে নতুন মাটি দেবারও এই উপযুক্ত সময়। মাটি ঢালছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জলে ধুয়ে সাফ হয়ে যাচ্ছে—সে মাটির মাপজোপ হওয়া সম্ভব নয়। দুর্লভ হালদার সদয় হয়ে যা খাতায় লিখবে তা-ই মঞ্জুর। অবিশ্বাস করো তো—বেশ, ফেলা হবে না একঝুড়িও মাটি। বাঁধ রসাতলে গেলে দুর্লভ দায়ী নয়।

কেতুর নিকটবর্তী হয়ে গলা নামিয়ে দুর্লভ প্রশ্ন করে, ইয়ে

হয়েছে। একটা কথা শুনলাম—রাতে কি গোলমাল বাধিয়েছিলি রে ?

গোলমাল বাধতে দিল কই ? প্রথম মুখেই তো এলোকেশী টেনে নিয়ে গিয়ে দুয়োরে খিল দিয়েছিল। অবাক কাণ্ড—সেইটুকুই দুর্লভের কানে পৌঁছে গেছে ! কথা বললেই কি অমনি বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়ায় বীজ-ফাটা শিমুল-তুলোর মতো ?

দুর্লভ বলে, সাধু চায় না বাইরের কেউ ও-বাড়ির সংস্পর্শে থাকে। কীর্তি-কলাপ তাহলে জাহির হয়ে পড়বে কিনা ! যেগুলো ঘোরে-ফেরে দেখতে পাস, সমস্ত ওর চেলা। আমার উপর অত খাপ্পা কেন, বুঝতে পারলি তো এখন ?

কেতুচরণ ন্যাকা সেজে বলে, কিছু বুঝলাম না ম্যানেজার মশায়। হেঁয়ালির মতো লাগছে।

দুর্লভ হেঁ-হেঁ করে হাসে।

তা জানি। তোর দেহ যেমন স্থূল, বুদ্ধিও সেই রকম হবে তো ! বুঝিস নি—বোঝ্ তা হলে একটা একটা করে। হাতে-নাতে চোর ধরলি—ভালমন্দ কিছু না বলে সে বেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। কেন বল তো ?

কেতু বলে, সাধু মানুষ—দয়ার শরীর—

সাধু না কচু। চোরের থলেদার। বুঝ-সমজ আছে—অর্ধেক বখরা। এ বড় তোফা ব্যবসা। টাকাকড়ি উথলে পড়ছে—দেখতে পাস নে ? পতিরাম দোকানে বসে ঠুকঠুক করে—আঙুল ফুলে তাতে কি আর শাল-সেগুন হয় রে ?

ব্যাপার এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল কেতুর কাছে। দুর্লভ বলছে, চোরেরা সোনাদানা এনে দিয়ে যায়, সাধু মজা

লোঠে বাড়ি বসে। স্যাকরার দোকান দিয়ে রেখেছে গয়নাগাটি গালাবার জন্য। সোনার বাঁট বানিয়ে সরিয়ে দেয়।

এখন কেতুচরণ ভাবছে, খুলনার কালী-বাড়িতে মতিরামের নিয়মিত যাতায়াত—সে কি তবে সোনার বাঁট সরানোরই অছিলা? দুর্লভ আক্রোশ মিটিয়ে মতিরামের কাজকর্মের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে অবশেষে একটু থামল। চতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কেতুর দিকে।

বলে, আমিও বাদাবনের ঘুঘু। অপমান হজম করি নে। বন্দোবস্ত ষোল আনা সারা। তোকে সাক্ষি দিতে হবে—যা-কিছু দেখেছিস শুনেছিস সমস্ত। সাধু শালার সগোষ্ঠি শ্রীঘরে না পাঠাই তো আমার নাম দুর্লভ হালদার নয়, দুর্লভ কুকুর।

পাল-তোলা এক নৌকা আসছে। এখনো বাঁকের আড়ালে—পালটাই শুধু লক্ষ্য করা যায়।

বাবু এলেন নাকি? এরই মধ্যে ফিরলেন যে! কাছারির নৌকো বলেই ঠেকছে—

নৌকা দেখে দুর্লভ অতি-দ্রুত পুরন্দরের দিকে দৌড়ল।

কেতুচরণকেও ফিরতে হল। কুকুর-বিড়ালের মতো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, তা সত্ত্বেও যেতে হবে মতিরামের বাড়ি। যেতেই হবে। এলোকেশীর সঙ্গে কোন রকমে দেখা করে সে সমস্ত বলবে। সাধুর গোষ্ঠিসুদ্ধ জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে দুর্লভ। সেই গোষ্ঠির মধ্যে এলোকেশীও পড়ে যায় যে! বিগত রাত্রের এবং জ্যোৎস্নামগ্ন সেই এক জঙ্গল-কাটা মাঠের এলোকেশী!

ব্যাপারটা তা ছাড়া পুরোপুরি বিশ্বাস্যও নয়। মতিরাম সাধু রগচটা হলেও খ্যাতিমান ব্যক্তি। তিনি এবং সেই সঙ্গে এলোকেশীও

তা হলে চোর। ছি-ছি, এলোকেশী চোর হতে পারে? ভুল ভ গায়ের জ্বালায় এই সমস্ত রটনা করছে।

কেতুচরণ তক্কে তক্কে আছে সেই ভোরবেলা থেকে। রাত্রের ঐ কাণ্ডের পর মতিরামের বাড়ি ঢুকে পড়তে পারে না তো—হা-পিত্যেশ বসে আছে খ'লেনের চালার খুঁটি ঠেশ দিয়ে। প্রহরখানেক বেলায় এলোকেশী সাবান ও গামছা নিয়ে স্নানের জন্য ডোবার ঘাটে চলেছে। ঘরের মাটি তুলে এখানে-সেখানে এমনি সব ডোবার সৃষ্টি হচ্ছে। জল কিন্তু নোনা—রান্নার কাজে লাগে না। বাসন ও গা-হাত-পা ধোয়াই শুধু চলে। এদিক-ওদিক চেয়ে কেতু সুড়ুৎ করে এগিয়ে এল। এতক্ষণে এইবার ফুরসৎ হয়েছে নিরিবিলি দুটো কথা বলবার।

মুখ কালো করে এলোকেশী আগাগোড়া শুনল। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর বলল, একটা নৌকোর যোগাড় দেখ। নিশুতি হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব!

হঠাৎ বাজ পড়লে যেমন হয়, কেতুচরণের তেমনি অবস্থা। নিস্পলক হয়ে সে চেয়ে রইল এলোকেশীর দিকে।

এলোকেশী সামাল করে দেয়, কেউ যেন টের পায় না—খবরদার!

বলে পরনের ভিজে কাপড়ে সর-সর আওয়াজ তুলে নিটোল অঙ্গের গৌর আভা বিকীর্ণ করে দ্রুতপদে সে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কি বলল এলোকেশী—এ কি সত্যি হতে পারে? মেয়েটার রীত-ব্যাভার কেতুচরণ মনে মনে তোলাপাড়া করে। কোন-কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে।

১০

অনতিপরে ঠিক দুপুরবেলা বিষম কাণ্ড। সাধু মতিরামের বাড়ি পুলিশ। দুর্লভ মুখে যা বলল, কাজেও করেছে ঠিক তাই—একটু এদিক-ওদিক হল না। বড়-দারোগা এবং নীল কোর্তা ও চাঁপরাশ-আঁটা দফাদার-চৌকিদারের দল হুড়মুড় করে উঠানে ঢুকল। থানা অনেক দূরে। রাত থাকতে সেখানে থেকে এরা বেরিয়ে পড়েছে।

মতিরাম কোথা? শোন। ঘরের মধ্যে বসে কি করো, বাইরে চলে এসো—

কারা?

হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন মতিরাম। উঁকি দিয়ে দেখে সুড়-সুড় করে বেরিয়ে এলেন। সবিনয়ে হাত কচলাচ্ছেন।

কি ভাগ্যি, হুজুররা আমার বাড়ি! ঘেমে গিয়েছেন যে! ওরে কে আছিস, পাখা এনে দে খানকয়েক। তা আমার উপর কোন আদেশ আছে নাকি?

আদেশ এই যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ঘুরবে। যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দেবে। তোমার বাড়ি খানাতল্লাস করতে এসেছি।

সোজা অপমান নয় তো—মতিরামের মুখ ছাইয়ের মতন পাংশু। ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছে, বিশেষ করে যে ঘরটায় মতিরাম থাকেন। জিনিসপত্র সামান্যই—পকেট গীতা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,

পূজার কোশাকুশি—সাধকজনের গৃহে যা-সমস্ত প্রত্যাশা করা যায়।

খানাতল্লাসের সাক্ষিস্বরূপ জনকয়েককে সঙ্গে এনেছে। বাজে লোকজনও কিছু জমেছে। মর্মাহত মতিরাম তাদের বলেন, দেখেছ তোমরা? মায়ের পাদপদ্মে পড়ে আছি, নির্বিরোধী লোক—কারো সাতেও থাকি নে, পাঁচেও থাকি নে। শত্রুতা করে কে উড়ো খবর দিয়েছে, হুজুরেরা তার উপর নির্ভর করে···ছি-ছি-ছি!

এমনি সময় দারোগা আঙুল দিয়ে দেখায়, কাঁচা-মাটির লেপ দেখা যাচ্ছে না ওখানে—সাধুর তক্তাপোশের তলায়?

এলোকেশী বলে, ইঁদুরে মাটি তুলেছিল—আমি গর্ত বুজিয়ে গোবর-মাটি লেপে দিয়ছি।

তুমি? দারোগা কৌতুক-দৃষ্টিতে এক নজর তাকাল তার দিকে। কি দেখল, কে জানে? মুখে মৃদু হাসি ফুটল। বলে, তা আমাদের আবার খুঁড়ে ফেলতে হবে জায়গাটা।

মতিরাম প্রবল আপত্তি করে ওঠেন।

ঘর খুঁড়বেন? ভেবেছেন কি বলুন তো আপনারা? এখান থেকে বসত ওঠাতে চান? তাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিন না—

দারোগা বলে; ইঁদুরের গর্তে সাপও-বেরিয়ে পড়ে কি না অনেক সময়। এসেছি যখন, সমস্ত দেখব। যাবার সময় তোমার ঘরের মেজে যেমন ছিল, আবার তেমনি করে দিয়ে যাবো।

কোদাল ধরে দুটো চৌকিদার মাটি তুলে স্তূপাকার করছে। পরিশ্রম বৃথা হল না। একটা মেটে-হাঁড়ি পোঁতা আছে—সরা দিয়ে ঢাকা। সরা তুলতেই ঝিকমিক করে উঠল।

কি হে সাধু?

মতিরাম শুষ্ক মুখে বললেন, আমারই জিনিস হুজুর, আমার পরিবারের গয়না।

এলোকেশী হাত ধরে কাছে নিয়ে এসে বলেন, আমার এই মেয়ের বিয়ের সময় দেবো বলে যক্ষের ধনের মতো আগলে বেড়াচ্ছি! বাদারাজ্যে চোর-ডাকাতের ভয়—ঘরের মধ্যে তাই পুঁতে রেখে দিয়েছি। মন বোঝে না—রাত দুপুরে দরজা এঁটে মাঝে মাঝে দেখি, ঠিক আছে কি না। তাই হুজুর কাঁচা মাটি দেখতে পেলেন।

দারোগা বলে, থানায় চলো। গয়না তোমার পরিবারের কি মধু রায়ের পরিবারের বিচার হবে সেখানে। আমরা যদ্দুর পারি করব, সদরের ফৌজদারি আদালত বাকিটা করবে।

রায়গ্রামে মধুসূদনের বাড়ির দোতলায় লোহার আলমারি থেকে গয়নার বাক্স নিয়ে সরে পড়েছে। দুঃসাহসিক চুরি—সন্দেহ হয়, চাবি খোলার মন্ত্র সে চোরের জানা। মধুসূদন সে সময়টা জঙ্গলে গিয়েছিলেন। শিকারের নাম করে প্রায়ই তিনি বাদাবনে ঢুকে পড়েন। জঙ্গলের ফিরতি এসে তবে চুরির কথা জানতে পারেন ঘটনার দশ-পনেরো দিন পরে। মতিরামকে এর মধ্যে জড়িত করায় উপস্থিত সকলের বিস্ময় বেড়ে গেল সাধুর সম্পর্কে।

মতিরাম পুনশ্চ প্রতিবাদ করেন, গয়না মধু বাবুর নয়—আমি বলছি। অযথা হয়রানি করবেন না হুজুর। বাদা অঞ্চল হলেও মগের মুলুক নয় এটা।

দারোগা চটে গিয়ে বলে, বাজে বকবক কোরো না। আপোষে যাবে, না কোমরে দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে?

কেতুচরণ এলোকেশীর কথামতো গাঙের ধারে নৌকার চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করছিল। খবর শুনে সে ছুটতে ছুটতে এসেছে। মতিরাম

এত লাঞ্ছনা করেছেন, তবু সে বেদনা বোধ করে তাঁর জন্য। সকাতরে বলে, সেই বেগুনবেড়ে অবধি টানাটানি করলে বুড়ো-মানুষটা মারা পড়বেন একেবারে। মধুবাবুকে এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করে নেন হুজুর, গয়না তাঁর কিনা ?

দারোগা বলে, মহালে আছেন তিনি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালবেলা এসে পৌঁচেছেন। ঘাটে দেখেছি।

একজন চৌকিদারকে দারোগা বলল, দেখে আয় কাছারিবাড়ি গিয়ে। বলে আসবি, কোথাও বেরিয়ে না পড়েন—আমরা যাচ্ছি।

অতদূর—কাছারিবাড়ি অবধি যেতে হল না। পথেই দেখা। মধুসূদন রায় তিলার্ধ বসে থাকবার মানুষ নন। বাঘে হামলা দিয়ে বেড়াত, সেই জায়গায় এখন ধানের পত্তন হচ্ছে—সমস্ত তাঁর নিজের হাতের রচনা। মৌভোগের আবাদ—এবং বলতে গেলে অঞ্চলটাই তাঁর নখদর্পণে। দুর্লভ যে ছেড়ে যাবে-যাবে করে, কারণও এই। কোন-কিছুই মধুসূদনের চোখে ফাঁকি পড়ে না। ওরই মধ্যে সামান্য যেটুকু দুর্লভ এদিক-ওদিক করে, তা-ও বুঝি টের পেয়ে যান। তাঁর হাসির রকম দেখে দুর্লভের সন্দেহ হয়, মনের মধ্যে অসোয়াস্তি ঠেকে।

বাঁধের নানা অংশে ঘোগ হচ্ছে—শুনতে পেয়ে মধুসূদন খাওয়ার পরেই বিশ্রাম না নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। জন দশেক কোদালি ও দুর্লভ চলেছে সঙ্গে। দুর্লভ মাটি ফেললেই ভেসে যাচ্ছে, তিনি তাই নিজে দেখিয়ে দেবেন মাটি ঢালবার কায়দা। একজনে বিচালির বোঝা নিয়ে চলেছে, জলের টানে মাটি কিছুতে যদি না দাঁড়ায় বিচালির আঁটি গুঁজে স্রোত-রোধের চেষ্টা হবে।

চৌকিদার পথের মধ্যে খানাতল্লাসির কথা বলল। মধুসূদন মৃদু হাস্যে সমস্ত শুনলেন।

দুর্লভ বলে, হীরোমুক্তো বলছে যখন—ও গয়না নির্ঘাৎ রায়বাড়ির। গোটা জেলার হাঁড়ির খবর রাখি। শালা বলেই বলছি—সব শালাকে চিনি—বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন। কেবল আপনারা—এই রায়-বাবুরা ছাড়া।

মধুসূদন বললেন, তুমি তা হলে এদের নিয়ে এগোও দুর্লভ। দারোগার সঙ্গে কাজ মিটিয়ে আমি ঐ পথে চলে যাবো।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

এগিয়ে এসে দুর্লভ কানের কাছে চুপি-চুপি বলে, শুনলেন তো? রক্ত-বসনের নিকুচি করেছে। টিপটাপ দিয়ে আসবেন, যাতে বেশ ভাল রকম ঠেসে দেয়।

মধুসূদন গিয়ে মতিরামের উঠানে দাঁড়ালেন। গয়না দেখানো হল।

দারোগা বলে, রায়বাবু, আপনার বাড়ির জিনিস কিনা দেখে বলুন—

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বলেন, হ্যাঁ—

এলোকেশী সামনে ছুটে এসে আকুল কণ্ঠে বলে, ভাল করে দেখুন। বাবার মাজায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাবে। ফাটকে আটকাবে। আপনার এলাকায় আশ্রয়ে এসে আছি। আমাদের ভাল অবস্থা দেখে সকলের চোখ টাটায়। আপনি একটু ভাল করে নিরিখ করে দেখুন রায়বাবু—

খুব ভাল করেই দেখেছেন মধুসূদন। গয়না নয়—এলোকেশীর মুখ, আপাদমস্তক অঙ্গশোভা। অপমানের বেদনা রূপের প্রখরতা ঢেকে মেঘম্লান দিনের মতো একটি স্নিগ্ধ আভা বিস্তার করেছে। মধুসূদন দেখছেন। বনবিবির পূজোর অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখে-ছিলেন—হাজার মানুষের মধ্যেও এ মেয়ে নজরে পড়বে। এত কাছাকাছি এলোকেশীকে এই প্রথম দেখলেন।

দারোগাকে বললেন, গয়না আমারই বটে! চিনতে পেরেছি। কিন্তু যা চুরি হয়েছে, সে জিনিস নয়। এ সমস্ত আমি দিয়েছি এই মেয়েটাকে। নিজের ইচ্ছেয় দিয়েছিলাম।

সকলে স্তম্ভিত। দারোগা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

দেখে মধুসূদনের আরও জেদ চাপল। লোক না পোক—ভ্রূক্ষেপ করেন না তিনি দুনিয়ার কাউকে। বলতে লাগলেন, ইচ্ছে করে না, বলুন দিকি, এমন মেয়েকে গয়না পরাতে? নিজের হাতে কানে পরিয়ে দিয়েছিলাম এই দুলজোড়া। আরও দেবো। আপনারা চলে যান দারোগা সাহেব। দু-রকম কথা আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন না, কোর্টেও ঠিক এই বলে আসব। আপনারা অপদস্থ হবেন।

রুষ্ট দারোগা মতিরামের দিকে চেয়ে কটু মন্তব্য করে যায়, নমস্কার সাধু মশায়—চললাম। তোমার একটা ব্যবসায়েরই খবর পেয়েছিলাম। আরও নানা ব্যবসা আছে। খুশি হলাম। উন্নতি হোক। ভবিষ্যতে আবার দেখাশুনা হবে আশা করি।

দারোগা সদলবলে চলে গেল। লোকজন ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে। কেতুচরণও যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল, এলোকেশী কোনদিক দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জোগাড় হল নৌকোর ?

উঁহু—

কেঁদে ফেলবে, এমনি ভাব। কেতুচরণ প্রবোধ দেয়, হয়ে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, আটকে থাকবে না। হুকুম করেছ যখন—দেখো, ভূতে জুটিয়ে আনবে। খবর দেবো, তুমি তৈরি হয়ে থেকো—

বুকের ভিতর কেতুর কি যে হচ্ছে—সামলে থাকা দায়। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবে ?

এলোকেশী অধীর কণ্ঠে বলে, হিসেবপত্তোর করে রেখেছি নাকি ? দূর-দূরন্তর—যে জায়গায় নিয়ে যাবে। এই ছ্যাঁচড়ার দল যেখানকার খোঁজ না পায়।

বাদাবনের বাইরে শান্তিনগর নামে একটা জনালয়ের পত্তন হচ্ছে। জায়গাটা ভাল—ধান-মাছ সুপ্রচুর। তারও চেয়ে বড় কথা, জলের অভাব নেই—নতুন-কাটা দীঘির কানায় কানায় মিঠা জল টলমল করছে। অতএব ভারি আরামের জায়গা হয়ে উঠবে। কেতুচরণ এর তার কাছে শান্তিনগরের নামই শুনেছে—মনের মধ্যে সহসা তার একটা ছবি খেলে গেল।

এলোকেশী এই অবস্থার মধ্যেও হেসে ফেলে বলল, দেশান্তরী হয়ে যাব গো তোমার সঙ্গে। রাজি আছ ?

বিমূঢ় দৃষ্টিতে কেতু চেয়ে থাকে। এমন ভাগ্য—সহজে কি প্রত্যয়ে আসে ? কথা বলতে হয়—তাই বলল, তোমার বাপ-খুড়ো···এই এত বড় সংসার ?

বোলো না, বোলো না। সংসারে তো দিনরাত্তির দাসীবৃত্তি। বাপ-খুড়ো মরে গেলে কেউ যদি খবরটা নেয়, নাম করে একগণ্ডুষ জল দেবো। কারও ওদের মুখ দেখবার আর প্রবৃত্তি নেই।

কেতু চলে গেল। মাটির উপর দিয়ে চলছে, তা আর মনে হয় না। নৌকা ভাড়া করবার অনেক চেষ্টা করেছে—কিন্তু এ অঞ্চলে ভাড়ার নৌকা কেউ রাখে না। কাজ কর্মে লোকে নৌকা দিয়ে আসে, কাজ অন্তে ফিরে চলে যায়। তা ছাড়া ভাড়া কতক্ষণের জন্য করতে হবে, কত দূরে যেতে হবে—কোন কিছুই কেতু জানে না। কোন সম্পদই নেই পৃথিবীতে—ভাড়ার নামে বিশ্বাস করে নৌকা তার হাতে কে-ই বা সঁপে দিতে যাচ্ছে ?

মতিরাম মধুসূদনকে ঘরের ভিতর তক্তাপোশে বসিয়েছেন। নিজের হাতে তামাক সেজে হুঁকোর জল বদলে তাঁর হাতে দিলেন। দিতে গিয়ে হাত জড়িয়ে ধরলেন। এতক্ষণের এই ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি—কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, আপনি আমার ইজ্জত বাঁচালেন রায়বাবু।

মধুসূদন উচ্চহাসি হেসে উঠলেন।

ইজ্জত-হানির কি হল মশায় ? কে কম যায় ভেবে দেখুন দিকি ? ঐ যে দারোগা-পুলিশ—ওরা চোর নয় ? রায়বাড়ির ছোটবাবু—আমিই বা কোন্ কৈবল্যানন্দ স্বামী ! সব এক গোয়ালের গরু সাধুমশায়—কেউ কটা, কেউ বা কালো। একটুখানি যা রঙের তফাত।

হাসির দমকে দেহ আকুঞ্চিত হচ্ছে। গায়ের পাটভাঙা গরদের জামা খসখস করছে নড়াচড়ায়। এলোকেশী পান সেজে ডিবেয় ভরে এনে দিল। মধুসূদন হাসি থামালেন তাকে দেখে। প্রসঙ্গ ঘুরে গেল।

এমন বাড়বাড়ন্ত সুন্দর মেয়ে—বিয়ে দিচ্ছেন না কেন সাধুমশায় ?

এলোকেশী আড়ালে সরে গেল। চমৎকার চেহারা কিন্তু বাবুটির। বনবিবি পুজোর দিন দেখেছিল কিন্তু এত নিকট থেকে নয়। আড়ালে গিয়েও সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আর একবার দেখল ভাল করে। দেখতে চমৎকার বটে, কিন্তু বড় পলকা। সারা দেহের মধ্যে বুঝি একখানিও হাড় নেই। গরদের ওয়াড়-দেওয়া একটা তাকিয়া-বালিশ যেন নড়াচড়া করছে মতিরাম সাধুর বিছানার উপর। বড় বংশের ছেলে, অগাধ ঐশ্বর্য—অথচ দেখ, একটুখানি অহঙ্কার নেই। তবে বেহায়া বিষম—সকলের মধ্যে অসঙ্কোচে এলোকেশীর রূপের প্রশংসা করলেন, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই।

মধুসূদন বলেন, জবাব দিলেন না আমার কথার? ভাল পাত্র জুটিয়ে দিতে পারি—দেবেন মেয়ের বিয়ে?

আপনার আশ্রয়ে রয়েছি রায়বাবু। যেমন আদেশ করেন, তাই হবে?

আগ্রহের আমেজ নেই কথার মধ্যে। মধুসূদন পুনশ্চ জোর দিয়ে বললেন, আমি বলি—মেয়ের বিয়ে দিন, আর দোকানপাট তুলে সরে পড়ুন এ তল্লাট থেকে। দারোগা ঐ যে আবার মোলাকতের আশা দিয়ে গেল, তার আগেই।

মতিরাম বলেন, মশা মাছি আর মাৎসর্যের উপদ্রব কোন জায়গায় নেই বলুন? হিংসেয় কে পুলিশে খবর দিয়েছিল। সেই ভয়ে আমার বাঁধা দোকান তুলে দিতে বলেন?

একটু থেমে হাসিমুখে আবার বললেন, শ্রীমধুসূদন সহায় আছেন, কারো আমি তোয়াক্কা রাখি নে—

একলা মধুসূদন কেন, তেত্রিশ কোটি ঠাকুর-দেবতার যাঁকে ডাক দেবেন তিনি এসে সহায় হবেন। মেয়ে পরঘরি হয়ে গেলে

কারো কিন্তু টিকি দেখতে পাবেন না। সে আপনি ভালোই জানেন সাধুমশায়। জানেন বলেই মেয়ের বিয়ের গা করেন না। কিন্তু শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে যায়—পুলিশের নজরের মধ্যে আপনার স্যাকরার ঠুকঠুকি বজায় থাকবে। থাকে ভালোই—আমার কিন্তু একটুও ভরসা হয় না।

গোটা তিনেক পানের খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে মধুসূদন উঠলেন।

ব্যস্ত আছি, চললাম। ঘোগ-মেরামতে বেরিয়েছি। ঘোগের মুখে দুর্লভচন্দ্র আমার গোটা আবাদ বের করে দেবার জোগাড় করেছে।

হাসতে হাসতে মধুসূদন বেরিয়ে পড়লেন। মানুষটিকে পাগল বলে অনেকে। সেয়ানা পাগল। দিলদরিয়া মেজাজেরও বটে। হাঙ্গামা চুকে গেছে—গয়নাগুলো ফেরত চাইল না তো! সে প্রসঙ্গ তুললই না একেবারে।

১১

পাগল! পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসে বাদারাজ্যে ঢুকেছে।

মধুসূদনের দিকে বাঁকা-দৃষ্টিতে চেয়ে দুর্লভ মন্তব্য করছে। টিকে সর্দারকে ডেকে চুপিচুপি শোনায়, চেয়ে দেখ্ টিকে—পাঁচ সিকের মাটির তদারকে এসে বিশ টাকার গরদের পাঞ্জাবির কি হাল করেছে! ও কাদা-মাটির দাগ তোলা এদিগরে হবে না। আর তুলবেও না দেখিস। কালকে হয়তো জিতু বুনো বা আর কাউকে দিয়ে দেবে। অমন কত দিয়েছে!

টিকে থেমে দাঁড়িয়ে শুধু শুনল, হাঁ-না কিছু বলল না। তারপর যথাপূর্ব মাটি এনে ফেলছে। বাঁধেরই এখান-ওখান থেকে মাটি কেটে যে জায়গায় গর্ত হয়েছে সেইখানে চাপাচ্ছে। মধুসূদন খানিক দূরে পশুরগাছের শিকড়ের উপর বসে বিড়ি খাচ্ছেন আর নিবিষ্ট হয়ে টোকচা খাতায় একটা হিসাব দেখছেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু ছেড়ে দেবেন না তিনি। যেন পণ করে বেরিয়েছেন, বাঁধের যেখানে যা-কিছু টুটাফুটা—সমস্ত মেরামত করে ফেলবেন এই এক যাত্রাতেই। কাছারিবাড়ি থেকে পেট্রোম্যাক্স এনে ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সেই আলোয় কাজ হচ্ছে। এত খাটতেও পারে মানুষটা! খেটে ক্লান্ত হয় না। আরে বাপু, চোখ বুজলে ফক্কিকার, মুখাগ্নি করবারও একজন-কেউ নেই—তোমার এত খাটুনির সম্পত্তি খাবে তো বারো ভূতে!

দুর্লভ গজর-গজর করছে। রাগে পড়ে দু-এক কথা বলছে টিকে সর্দারের কাছে। টিকে পুরোপুরি মধুসূদনের লোক—একান্ত আজ্ঞাবহ। তার সামনে কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু সামলাতে পারে না। দেয় বলে দিকগে। কটা দিনই বা আছে এই মনিবের অধীনে!

প্রহর দেড়েক রাত্রে কাজকর্ম সমাধা হল। খাতা থেকে মুখ তুলে মধুসূদন সহাস্যে বলেন, দেখ—নিরিখ করে দেখ তোমরা—আর কোন জায়গায় কিছু পাওয়া যায় কিনা!

দুর্লভ বলে, আজ্ঞে না। সব ঠিক হয়ে গেছে।

কাজ কতটা হল এবার?

তা হয়েছে, যথেষ্টই হয়েছে। গুনতিতে নিতান্ত কম হবে না।

আমি শুনেছি। আঠাশটা—এইটুকু সময়ের মধ্যে হয়ে গেল। আর পাঁচ দিন ধরে তুমি ঘোগ মেরেছে সাকুল্যে—

দুর্লভ তাড়াতাড়ি বলে, চৌদ্দ-পনেরোটা হবে।

উঁহু, নটা। তা-ও আমার গোনা।

মুখস্থর মতো মধুসূদন বলতে লাগলেন, ছাব্বিশটা রোজ লাগিয়েছ, তার দরুন তেরো টাকা। দৈনিক দশ পয়সা হিসাবে পাঁচ দিনে তামাক পুড়িয়েছ সাড়ে বারো আনার—

দুর্লভ বলে, আজ্ঞে—তঞ্চক পাবেন না। আমি যথাধর্ম লিখেছি—

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ দুর্লভচন্দ্র, তোমার লোকজন কি মাপজোপ করে তামাক খায়? দশ পয়সা হিসাবে খেয়েছে—কোনও দিন নপয়সা কি এগারো পয়সা হল না?

দুর্লভ স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে, তা খেলে আমি কি করতে পারি? যা ভাবছেন, তা নয়। দুর্লভের কপালখানা ছোট, কিন্তু নজর ছোট নয়। টাকার কমে ছুঁই নে—এই একটা কথা বলে দিলাম।

যা লাগিয়েছ, ঘোগের ছেঁদা দিয়ে আমার গোটা মৌভোগ আবাদ যে পুরন্দর গাঙে গিয়ে নামবে।

এই রাত দুপুর অবধি পরিশ্রম, তার উপর লোকজনের সামনে বারম্বার বক্রোক্তিতে দুর্লভের মেজাজ বিগড়ে গেল। বলে, তবে আপনি লোক দেখুন রায়বাবু। আমায় দিয়ে এর বেশি হবে না।

বনকরের চাকরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে তা হলে?

এই আর-এক জ্বালাতন। মানুষটার সকল দিকে নজর। দুর্লভ চাকরির জন্য তদ্বির-তাগাদা করছে এবং অনেকটা সুরাহাও হয়েছে—সমস্ত মধুসূদনের জানা।

ছুর্লভ বলল, আজ্ঞে, বিশ্বাসই হল আসল। মনিবের বিশ্বাস হারিয়েছি—তবে আর কি রইল বলুন ?

মধুসূদন হেসে উঠলেন।

তোমায় বিশ্বাস করতাম—এ বড় আজব কথা শোনালে ছুর্লভ। করিৎকর্মা চালাক লোক বলে ভালবাসি, এটা ঠিক। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তুমিও কখনো মাথা ঘামাতে না। তা চাকরি ছাড়ো আর যা-ই করো—ভোরবেলা বাদায় বেরুচ্ছি, তাতে যেন বাগড়া না পড়ে।

রাত ছুপুর অবধি খাটিয়ে বাঁধের কাজ শেষ করবার অর্থ এতক্ষণে বোঝা গেল। জঙ্গলে যাচ্ছেন। প্রায়ই যান এইরকম—অনেক কালের অভ্যাস। উদ্দেশ্য বোঝা মুশকিল। পাগল মানুষ তো—কখনো উচ্চহাসি হেসে বলেন, জঙ্গলরাজ্য বিজয় করে ফেলবেন তিনি। আগে-আগে হতও তাই—এক একটা লাটের জরিপ ও বন্দোবস্ত করে নিয়ে হাসিলের ব্যবস্থা করতে যেতেন। সেসব বন্ধ আপাতত। শিকারের খুব তোড়জোড় দেখতে পাওয়া যায় যাত্রার সময়টা। কিন্তু ফিরে আসেন নিরামিষ হাতে। একবার কেবল গোটা চারেক কাঁকপাখি নিয়ে এসেছিলেন। সেবারে ছুর্লভ যায় নি। মুখ টিপে হেসে টিকে সর্দারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কত নিল রে ?

সে কি ?

কিনে এনেছিস নিশ্চয় কোন শিকারির কাছ থেকে।

ঘাড় নেড়ে টিকে বলে, উঁহু—হুজুর নিজে মেরেছেন। গুলিতে ছিদ্দির হয়ে রক্ত পড়েছে, দেখতে পাও না ?

ছুর্লভ বলে, গুলি বুঝি একলা তোর হুজুরেরই আছে ? যার গুলিই লাগুক, ছিদ্দির হবে—রক্তও পড়বে।

গাঙের লোনা জল সকালের রোদে ঝিকমিক করছে। তরঙ্গ দোলা দেয় নৌকায়—মানুষগুলো দুলছে, মানুষের অন্তরাত্মাগুলো দোলে এক-এক সময়। উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা তৃণহীন দুই কূলের মধ্য দিয়ে জলধারা ছুটেছে। গেঁয়োবন—ঝুপসি ঝুপসি বন চলেছে শ্রেণীবদ্ধভাবে। ভিজে চরের উপর তিতির পাখি লম্বা ঠোঁটে খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট পাখি—পাঁচ-সাতটা এক-এক জায়গায়। যেন সারি বেঁধে ঘুরঘুর করে নাচছে সখীর দল।

বোগড়ো গাছের জঙ্গল এবার—মাইলের পর মাইল। খেজুর গাছের মতন দেখতে। ফলও খেজুরের মতো—বিযাক্ত, খাওয়া যায় না। ওপার ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল....নৌকা ভেসে ভেসে যাচ্ছে দু-একখানা—লাল পালের নৌকা, শাদা পালের নৌকা...

মাটির উনুনে মেটে হাঁড়িতে চা তৈরি হল, চা ও টিন-কাটা বিস্কুট খেয়ে মধুসূদন বাদায় নামলেন। সঙ্গে টিকে যাচ্ছে এবং আরও দুজন। মাঠালে যাচ্ছেন, অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শিকার হবে। অত্যন্ত বিপজ্জনক এই প্রণালী। দুর্লভ অত কষ্ট করবার মানুষ নয়, তারা একদল নৌকায় রইল।

টিকে বলে, রাঁধাবাড়া তা হলে সেরে রেখো ম্যানেজার। চাঁদের আড়ায় গিয়ে নৌকা বেঁধো। আমরা ঐদিকপানে চললাম।

সরু খাল অরণ্যে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। নৌকা কোথাও দাঁড় বেয়ে কোথাও বা ধ্বজি মেরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দুক হাতে মধুসূদন সকলের আগে, টিকে সকলের পিছনে। জোয়ারের জল উঠেছিল—সেই জল জমে জমে আছে, কাদায় প্রায় হাঁটু অবধি বসে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কাটল। একটুখানি যে বসবে, সে উপায় নেই।

বড় কষ্ট হলে কোন একটা ডাল বা ঝুলে-পড়া লতা ধরে ঐ কাদারই মধ্যে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে পারো। তবে মধুসূদনের ক্লান্তি নেই—বনে এসে আরও যেন তাঁর বল বাড়ে। দৈত্যের-মতো-দেহ টিকে সর্দার অবধি হাঁপিয়ে পড়েছে—আর মধুসূদন রায় জলকাদা ছিটকে ডালপালার নিচে দিয়ে গুড়ি মেরে চলেছেন তো চলেছেনই।

যাই হোক, পরিচ্ছন্ন উঁচুমতো একটা জায়গা পেয়ে মধুসূদন বসে পড়লেন। কাবান বলে এমনি জায়গাকে। কাঠুরেরা কাঠ কেটে এখানে এনে এনে ফেলে, তারপর টুকরো করে নৌকায় বোঝাই দেয়।

আর তিনজনও একদিকে একটু আলাদা হয়ে বসল। গলায় ঝোলানো থলিটা নামিয়ে টিকে সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিল মধুসূদনের দিকে। বোতল-গ্লাস বের করে গ্লাসে একটু ব্রাণ্ডি ঢেলে মধুসূদন জল মিশিয়ে নিলেন।

কি রে, লোভ হচ্ছে ?

বলে মুখ বিকৃত করে আবার বললেন, ম্যালেরিয়া-মিকশ্চার—বিষম তেতো, হ্যাক্-থুঃ—

আজ্ঞে না, ছি-ছি—

বলে টিকে সলজ্জে ঘাড় ফেরাল। আরও খানিকটা দূরে সরে সকলে বসল। মৃদু হেসে মধুসূদন গ্লাসে চুমুক দিলেন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন তারপর। এগোতে লাগি। তোরা জিরো বসে বসে—

টিকে ব্যস্ত হয়ে বলে, একলা যাবেন কেন হুজুর ? জায়গাটা গরম। সবাই উঠছি আমরা।

মধুসূদন তাড়া দিয়ে ওঠেন।

উঠলেই হল ? থলি-সুদ্ধ রেখে যাচ্ছি—শেষ করে তবে উঠবি। টাকার মাল—এক ফোঁটা পড়ে থাকে তো গুলি করব তোদের ধরে ধরে।

সামনে খাবে না, মধুসূদন জানেন। বন্দুক নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি চললেন।

খুঁজে পাবি তো আমায় ?

আজ্ঞে, তা পাবো না কেন ? পায়ের গর্ত ধরে ঠিক গিয়ে পৌঁছবো। কিন্তু খাল পার হয়ে যাবেন না হুজুর। বিষম খারাপ ওদিকটা।

মধুসূদনের বিচার-বিবেচনার জন্যে লোকগুলো ভালবাসে তাঁকে। রায়বাবুর সঙ্গে নরকে বেড়িয়েও সুখ। বেশি দেরি করে নি তারা—কয়েকরশি গিয়েই মধুসূদনকে পাওয়া গেল। দুটো খাল এক জায়গায় মিশেছে—সেই মোহানায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন তিনি। ওদের শব্দ-সাড়ায় মুখ ফেরালেন।

এই দুটো খালের কিনারা ধরে দু-দিক দিয়ে বাঁধ এসে এখানে মিশবে, বাক্স বসানো হবে এই জায়গায়। কেমন হয়, বল্। এক বাক্সর মুখেই তাহলে সমস্ত আবাদের জল মরবে। কি বলিস ?

টিকে হাসে।

সমস্ত বাদাবন হুজুর আবাদ করে ফেলতে চান। একছিটে জঙ্গল থাকতে দেবেন না। এ ছাড়া অন্য চিন্তা নেই।

অনেক দিন সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কথা না পড়তে মধুসূদনের মনোভাব বুঝতে পারে। বাদার লাটগুলো একের পর এক বাঁধবন্দি হয়ে মানুষের অন্ন জোগাবে, জানোয়ার তাড়িয়ে দিয়ে মানুষ ঘরবসত করবে—এটা শুধু মনের অভিলাষ মাত্র নয়, বন

কাটতে কাটতে সত্যিই বহুদূর এগিয়ে গেছেন তিনি। বনরাজ্য জয় করতে করতে এগোচ্ছেন। ইদানীং এই কয়েকটা বছরই যা-কিছু মন্থরতা দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের আড়া খালের নাম। বাওয়ালিরা বলে চাঁদ সদাগর নৌকার পথ সংক্ষেপ করতে এই খাল কেটেছিলেন। পৌঁছুতে ছুপুর হয়ে গেল। ক্ষিধেয় সকলের কণ্ঠাগত-প্রাণ। তার উপরে মুশকিল—নৌকার নিশানা নেই কোনদিকে। এতক্ষণেও পৌঁছল না—কি ব্যাপার?

কু—উ—উ—

ছু-হাত একত্র মুখের উপর বসিয়ে টিকে কু দিচ্ছে। বাদাবনে কদাপি নাম ধরে ডাকাডাকি কোরো না। মানুষের গলা বুঝতে পারলে বাঘ যেখানে থাক চলে আসবে। দ্বিপদ খাদ্য অত্যন্ত ছুর্লভ কিনা! এসে অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সুলুক-সন্ধান খুঁজে। আবার বাঘই নয়—তাদের উপরেও অনেক রকম আছেন। তাঁরা আরও ভয়াবহ। যাক ওসব। ঠিক-ছুপুরে জনহীন বাদায় ভয় দেখানো উচিত হবে না। মোটের উপর ঐ যা বললাম—দরকার পড়লে কু দিয়ে সঙ্কেত কোরো, কথা বোলো না।

কু—উ—উ—

টিকের সঙ্গে সকলে যোগ দিয়েছে। কল-কল করে ভাঁটার জল নামছে। জোরে হাওয়া বইছে, আওয়াজ বেরুতে না বেরুতে ভেসে চলে যায়। বনের এই মজা, একটু আওয়াজ করলেই সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। এক ক্রোশ দূরে লোক কথা বলল, মনে হবে ঠিক কানের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে। কেন হয় বলো দিকি?

বিপন্ন মানুষের ডাক বনবিবি কানে শুনে নেন, তারপর নিজেই জঙ্গলে জঙ্গলে বাতাসের সঙ্গে সেই ডাক শুনিয়ে বেড়ান।

এত কু দিচ্ছে—যেখানে থাকুক, নৌকার লোকেরও কু দিয়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু কান খাড়া করে কিছুই শোনা যায় না। উপায় কি তবে? ক্লান্তিতে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। গোলঝাড় অজস্র। টিকে কয়েকটা গোলের ধেড়ো নুইয়ে নরম পাতা বাঁধল পরস্পরের সঙ্গে। গদি-পাতা বেঞ্চির মতো হল।

হুজুর, বসুন—

তোরা?

আমাদেরও হচ্ছে—

আরো কয়েকটা বসবার জায়গা করল ঐ রকম। উল্টোপাল্টা হয়ে চারিদিকে মুখ করে সকলে বসে—বিপদ যে-কোন দিক দিয়ে উদয় হতে পারে। আর কু চলছে মাঝে মাঝে। বিরক্ত হয়ে টিকে একটা গাছে চড়ল। খানিক ওঠে, এদিক-ওদিক তাকায়। আরও উপরে বেয়ে ওঠে।

কু—উ—উ—উ—

খুব জোরে কু দিয়ে ওঠে। ফন-ফন করে তারপর অতি-দ্রুত নেমে এল। সোল্লাসে বলে, আসছে ওরা। দেখতে পেয়েছি। ধ্বজি ঠেলে ঠেলে বেগোনে আসছে।

বিরক্ত মধুসূদন বলেন, সাড়া দেয় না কেন?

বাতাস উল্টো দিকে—শুনতে পাচ্ছে না। এখন বুঝতে পারলাম। ভারি কষ্ট করছে বেচারারা। চারখানা ধ্বজি মেরেও না এগোচ্ছে না—

বসে কালহরণ নিরর্থক। কূলে কূলে তারা নৌকার উদ্দেশে

চলল। হাঁটা নয়—প্রায় দৌড়নো। তুর্ভরা দেখতে পেয়ে একটু পছন্দমতো জায়গায় গেঁয়োর শিকড়ের সঙ্গে নৌকা কাছি করল।

ও হরি—রান্না বসে নি এখন পর্যন্ত! চেষ্টা করেছিল নাকি—বাতাসে উনুন ধরাতে পারে নি। উনুন এবার ডাঙার উপর নামিয়ে আনা হল, চারি দিক থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে জড়ো করল। ঘিরে বসেছে সকলে—হাওয়ার দাপটে যাতে আর বিঘ্ন না ঘটে। জন্তু-জানোয়ারের তত আশঙ্কা নেই—আগুনের কাছাকাছি তারা বড় একটা আসে না। ভাত না রাঁধুক—বুদ্ধি করে খেপলা-জালে মাছ ধরে এনেছে। মাছের ঝোল-ভাত নামতে কতক্ষণ লাগবে!

খেয়ে তখনই আবার মধুসূদন বেরুলেন। সঙ্গে শুধু টিকে। তিলার্ধ বিশ্রামের সময় নেই। জঙ্গলে জঙ্গলে একটা বেলা হয়রান হয়ে এলেন। মাঠালে এ অঞ্চলে সুবিধা হবে না—হরিণগুলো ভারি শয়তান, হাওয়ায় গন্ধ পায়, পাতা নড়লে ছুটে পালায়। গাছালের ব্যবস্থা করতে হবে। মাঠালে শিকার করতে হয় তো আরও দক্ষিণে চলে যাও—একেবারে সাগরের কাছাকাছি। এমনও বন আছে যেখানে মানুষের পা পড়ে নি কখনো, বন্দুকের আওয়াজ হয় নি। মধুসূদন পরের মুখে বর্ণনা শুনেছেন, একবার নিজের যাবার ইচ্ছা আছে। যাবেনই। গিয়ে শুধুই মরা পশু-পাখি হাতে ঝুলিয়ে ফিরে আসবেন না, সে লোক তিনি নন—দুর্ভেদ্য জঙ্গল কেটে আর একটা মৌভোগ বসাবেন। সবুজ ধানবনে-ঘেরা সমৃদ্ধিবান গ্রামের পর গ্রাম জেঁকে উঠবে—বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি অবধি একছিটে জঙ্গল থাকবে না, এই তাঁর পণ।

কিন্তু সে সব একদিনের ব্যাপার নয়। আপাতত গাছালের

আয়োজনটা শেষ করতে হবে বেলা ডুববার আগেই। উঁচু গাছের চূড়ায় ডালপালা দিয়ে মাচা তৈরি হবে তাঁর ও টিকের বসবার মতো। বন্দুক বাগিয়ে গাছের উপর থেকে দু-জনে সারারাত্রি জন্তুর চলাচলের উপর নজর রাখবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে দ্রুত পায়ে তাঁরা ফিরলেন। এত শীঘ্র ফিরবার কথা নয়, কি-একটা ঘটেছে! নৌকায় উঠে মধুসূদন চুপি-চুপি বলেন, খুব সামাল! একটা বাঁশি আমাদের দাও, আর একটা তোমরা রাখো। ফু দেওয়া এ অবস্থায় ঠিক হবে না, এমন-তেমন বুঝলে সিটি মারবে।

অবস্থাটা বললেন তিনি। সকালবেলা সেই যে তাঁরা হেঁটে এসেছিলেন—কাদার উপর পায়ের দাগ পড়ে ছিল—এবার গিয়ে দেখলেন, সেই পদচিহ্নের উপরই বাঘের থাবার দাগ পড়েছে। অর্থাৎ বড়-মিঞা পিছু নিয়েছেন। মধুসূদনরা আসছিলেন—প্রভুও বরাবর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছেন, দুটো বন্দুক দেখে বাড়াবাড়ি করতে ভরসা পান নি। গোলঝাড়ে এঁরা বিশ্রাম করছিলেন। তিনিও থাবা পেতে বসেছিলেন অনতিদূরে। সে থাবা আকারে এমন প্রকাণ্ড—

টিকে বলে, যেন একজোড়া বগি-থালা ম্যানেজার মশায়। বাদায় এতকালের আসা-যাওয়া, তা এমন তাজ্জব কখনো নজরে আসে নি।

এটা বোঝা গেল, গাছাল বৃথা যাবে না। এ তল্লাটে বাঘের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আরও একটা অকাট্য প্রমাণ, মাচা বাঁধতে হয় নি—একটা তৈরি মাচা গাছের উপর রয়েছে। বেশ বড়-সড় মাচা—দু-জনে সেখানে বসা কেন, গড়িয়েও নিতে পারবেন মাঝে

মাঝে। অর্থাৎ অন্য শিকারি সদলে ঐ মাচায় গাছাল দিয়ে গেছে দু-পাঁচ দিনের মধ্যে।

সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে ঢুকলেন। বিকালবেলা, কিন্তু ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসছে। সূর্য নিচু-আকাশে নামলেই বাদাবনে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

১২

দু-জনে গিয়ে তো গাছে উঠলেন। গাছের উপর দিব্যি পা দোলাচ্ছেন। ভাল যে দুটো বন্দুক ছিল, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেলেন। নৌকায় এতগুলো প্রায়-নিরস্ত্র লোক—যা তোরা বাঘের পেটে এখন। লোভাতুর বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুনে অবধি দুর্লভ ক্ষেপে গিয়েছে। সোয়ারিখোপের মাঝামাঝি সরে গিয়ে বসল। একটা গাদা-বন্দুক সম্বল—একবার দেওড় করেই বারুদ ঠাসতে বসে যেতে হয়। উঃ—আক্কেল-বিবেচনা আছে মধুসূদন রায়ের?

কি বিড়-বিড় করো ম্যানেজার মশায়?

দুর্লভ চাপা গলায় তর্জন করে। তোদের হুজুরের চৌদ্দ-পুরুষান্ত করছি—

সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। দুর্লভ বলতে লাগল, এখানে গলা ছাড়বার জো নেই। মা-বাপের আশীর্বাদে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি তো দশের মুকাবেলা হাঁকডাক করে বলব। পাগল-ছাগলের তাঁবেদারি করা আমায় দিয়ে আর পোষাবে না।

ভাঁটা সরে গেছে। সকালবেলাকার উচ্ছল খাল এখন

বিঘতখানেক চওড়া আঙুলচারেক গভীর নালা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু-কূলের বেঁটে গেঁয়ো-গাছগুলো মোটা গোড়া এবং অজস্র শিকড়ে অক্টোপাসের মতো মাটি কামড়ে আছে। ভরা জোয়ারের সময় আধেক-ডোবা এই সব গাছই প্রসন্ন-স্নানরত হাজার হাজার আরণ্য শিশুর মতো মনে হচ্ছিল।

নৌকা একেবারে ডাঙার উপর। দু-ধারে খালের গর্ভে নোনা-কাদা পড়ন্ত ক্ষীণ আলোয় চিকচিক করছে। কাত হয়ে পড়েছে নৌকা। ছোট ছোট গর্ত থেকে এক রকম আণবিক কাঁকড়া বেরিয়ে আসছে, মেটে রঙের অতি-ছোট উড়ুক্কু মাছ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের। হাতে কাজ না থাকলে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে তাকিয়ে তুচ্ছ এই জীবলীলা দেখা চলে। নিচু খুঁটির উপর ছুই— একদিকে গোলপাতার বেড়া, বাকি তিনদিক একেবারে ফাঁকা। দুর্লভ গুঁটিসুটি হয়ে আছে। বিপদ বুঝলে শজারু যেমন কাঁটা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে থাকে, তেমনি অবস্থা।

মাথায় এক বুদ্ধি এল দুর্লভের। ছাতা মেলে এক ধারে আড়াল দিল। গায়ের গলা-বন্ধ কালো কোটটা খুলে টাঙাল অন্যপাশে। কোট দেখে অস্পষ্ট আলোয় মনে হতে পারে, মানুষই বসে আছে একজন। শিকারি-বাঘ দুটো লাফ দেয়—এক লাফে শিকারের ঘাড়ে পড়ে, আর এক লাফে শিকার নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। বাজপাখির ছোঁ দেওয়ার মতো—চক্ষের পলকে ঘটে যায়। দূর থেকে ঝাঁপ দেয়, অতএব কোটটাই মানুষ বলে ভাববে। কোট মুখে করে সরে পড়বে দুর্লভের এই ভরসা।

সন্ধ্যা হল। শাঁখ বাজছে এদিকে-সেদিকে। গাছের মাথায় বসে মধুসূদনের ধাঁধা লেগে যায়, গ্রামের মাঝখানে রয়েছেন বুঝি!

শঙ্খের আওয়াজ কি ভাবে আসছে, তা যে না জানেন এমন নয়। বাদাবনে পারতপক্ষে রাতে নৌকা বাইতে নেই। এক-এক জায়গায় পাঁচ-সাত-দশখানা নৌকা একত্র কূলে বেঁধেছে, সন্ধ্যাবেলা মাঝিরা গ্রাম-ঘরের রীতি রক্ষা করছে শাঁখ বাজিয়ে। দু-পাঁচ ক্রোশ দূরের আওয়াজও মনে হবে সামনের ঐ গাছগুলোর আড়াল থেকে আসছে। গাছের আড়ালে যেন ঘরবাড়ি—গৃহস্থ-বউরা শাঁখ বাজিয়ে গোলায় গোয়ালে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এই প্রায়-সমোচ্চ বনভূমি কোন গ্রামের বাগিচারই গাছপালা যেন।

আরো অনেক কথা ভাবেন মধুসূদন। ভাবতে ভাবতে সম্বিৎ আচ্ছন্ন হয়ে আসে। তিমির-তন্দ্রিত গহন-অরণ্য মানুষের সুখ-দুঃখ-বিমথিত জনপদ হয়ে উঠবে—যেমন ছিল এককালে। বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার শতবিধ পরিচয়। পুরানো দীঘি-জাঙাল, অট্টালিকা, নিমকির কারখানা, জাহাজঘাটার ভগ্নাবশেষ, নানা বিচিত্র অর্থপূর্ণ নাম ··

কোথায় গেল সে সব! কেমন করে গেল? মধুসূদন বন্দুকটা আর-এক ডালে ঝুলিয়ে নড়েচড়ে পিছনে ঠেশ দিয়ে আরাম করে বসলেন। টিকে মাচার উপর আরও কিছু পাতা ভেঙে গদির মতো করে দিয়েছে। অনেক দূর অবধি নজর চলে। রাজাধিরাজ উঁচু সিংহাসনে বসে চতুর্দিকের প্রকৃতি-পুঞ্জ নিরীক্ষণ করছেন, এমনি এক অসম্ভব অনুভূতি পেয়ে বসে মধুসূদনকে। চোখে যতদূর দেখা যায়, দেখছেনই—কল্পনায় ভবিষ্যৎ দেখছেন। অতীতও দেখতে পাচ্ছেন যেন সুস্পষ্টভাবে।

সমৃদ্ধিবান জনপদ। নদীর কূলে কূলে বসতি। ঘাটে এসেছে

মগেরা। গোড়ায় আসত ব্যাপার-বাণিজ্য করতে—কিন্তু কি-ই বয়ে নেওয়া যায় সদ্‌ভাবে বাণিজ্য করে ? এখন দলে দলে পঙ্গপালের মতো এসে পড়ে। পর্তুগিজরাও আসে। প্রথমটা এসেছিল খ্রীষ্টের মহিমা প্রচার করতে, তারপর দেশটা চেনা-জানা হয়ে যেতে জাহাজের বহর সাজিয়ে আসে। কামান থাকে জাহাজে। গ্রামে আগুন দেয়। বুড়ো আর বাচ্চাগুলোকে ফেলে দেয় আগুনে। ধন-সম্পত্তি জাহাজ বোঝাই করে ; শক্ত-সমর্থ মেয়ে-পুরুষগুলোও জাহাজে তুলে নিয়ে যায় সমুদ্রপারে বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্য।....

ভূমিকম্প। বাসুকি ক্ষিপ্ত হয়েছেন—পাপের পৃথিবী বইবেন না আর কাঁধে। শঙ্কান্বিত জলস্থল থর-থর কাঁপে। গাছগাছালি উপড়ে পড়ে, ঘরদোর ভেঙে চুরমার হয়। হাম্বা-হাম্বা করে গোয়ালের গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটাছুটি করে। বিপন্নের আর্তনাদে আকাশ ফেটে যায়। চড়-চড় শব্দে মাটি ফাটে—মুখব্যাদান করে বসুন্ধরা গিলে ফেলবে বুঝি সমস্ত ? তারপর করাল সমুদ্রতরঙ্গ ছুটে এসে জলতলে চারিদিক নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। হাটখোলা, সদাগরবাড়ি, নন্দবালা-কুমুদবালার দোলমঞ্চ, জাহাজঘাটা—দেখতে দেখতে একগলা জল সর্বত্র।

আবার শতেক বছর ধরে পলি পড়ে পড়ে ভূমিলক্ষ্মী শ্যামানন উন্মোচন করেছেন ধীরে ধীরে সমুদ্র-গুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে। জীব এসে বসতি করছে—প্রাচীন অট্টালিকার ইটের স্তূপে সাপ-বাঘ-বুনোশূয়োরের আস্তানা।

*

সেই সন্ধ্যা-রাত্রে সমস্ত অরণ্যভূমি চকিতে যেন জনপদ হয়ে দাঁড়াল; মধুসূদন অতীত সমৃদ্ধি চোখের উপর দেখতে পান। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, মানুষ-জন……বিয়ে হচ্ছে, গ্রামবধূরা পাড়ায় পাড়ায় জল-সয়ে বেড়াচ্ছেন, ঢুলি-কাঁসিদার পিছনে চলেছে বাজাতে বাজাতে। নিঝুম চণ্ডীমণ্ডপে দাবা নিয়ে বসে দুই প্রবীণ, চাষীরা বাঁকে করে ধানের আঁটি দোলাতে দোলাতে আনছে। নিশিরাত্রে চকচকে সড়কি হাতে গ্রাম পাহারা দিয়ে ফিরছে জোয়ান ছেলেরা।

ছায়াছবির মতো আবার সব বিলীন হয়ে গেল। মধুসূদন রায় উদ্ধত ঘাড় নেড়ে মনে মনে বলেন, আমি—আমি ফিরিয়ে আনব আবার। উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেন না, খাড়া হয়ে দাঁড়াতে যান মাচার উপরে। কিন্তু উপরেও ডালপালা—মাথায় ঠোক্কর খেয়ে বসে পড়তে হয়। সহসা শঙ্কা জাগে, কতদিন বাঁচবেন আর তিনি!

উত্তর কালের মানুষ, তোমাদের উপর ভার দিয়ে যাচ্ছি—এই আমার দিব্যি দেওয়া রইল, বনের কবল থেকে ফিরিয়ে এনো আমাদের এই সুপ্রাচীন পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি।

টিকে ফিসফিসিয়ে বলে, হুজুর···শিঙেল বলে সন্দ করি। তৈরি হন।

বহুদর্শী টিকের অনুমান মিথ্যা নয়। শিঙেল হরিণ চলে গেল ধীর-মন্থরভাবে। পাল্লার মধ্যে এসেছিল, তবু মধুসূদন তাক করলেন না। মন নেই এদিকে।

আর বাবুর হাতে বন্দুক থাকতে টিকের পক্ষেও দেওড় করা চলে না। রাগে দুঃখে তার নিজের বুকেই গুলি মারতে ইচ্ছে করে।

১৩

কেতুর অবহেলা নেই। তবু নৌকার চেষ্টায় চারটে দিন কেটে গেল। অবশেষে জোগাড় হল এক বাছারি-নৌকা। কি করে হল, ভদ্রজন তোমরা তা জিজ্ঞাসা কোরো না।

এলোকেশীকে বিকালবেলা খবর দিয়ে এসেছে। অনেক রাত্রি হল—এখনো আসে না কেন? বাঁনতলার অন্ধকারে কেতুচরণ বোঠে হাতে অপেক্ষা করছে। জোলো-হাওয়ায় শীত ধরে যায়। চারিদিক নিঃশব্দ—পাখনার ঝটপটি শুধু এগাছে-ওগাছে পাখির বাসায়। এলোকেশী হয়ত উপহাস করেছিল—তাই সত্যি মনে করে কেতুচরণ এতকাণ্ড করে নৌকা জুটিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, দিগ্‌ব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গলে ভরা সেই এক মাঠের কথা। আর চার দিন আগেকার সেই বেহায়াপনা—বাপ-খুড়ো এবং এক-উঠান লোকের সামনে এলোকেশী তার হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিল। ভিতরে কিছু আছে—হাঁ, নিশ্চয় আছে—নইলে এত দুঃসাহস অমনি-অমনি আসে না।

ঐ যে—আসছে এলোকেশী টিনের ক্যাশ-বাক্স হাতে। ক্যাশ-বাক্সটা নিয়ে এসেছে—চিরদিনের জন্য যাচ্ছে তাহলে ঠিক। লঘু-পায়ে এসে সে নৌকার উপর উঠল। মাটিতে পা ঠেকিয়ে নয়—বাতাসে বাতাসে ভেসে এলো যেন। নইলে এত নিঃসাড়ে কি করে আসে?

ফিসফিস করে এলোকেশী বলে, যা ভয় করছিল—

ডাকাত মেয়ে, ভয় আছে নাকি তোমার? কেতুর ঠোঁটের আগায় কথাগুলো এসেছিল, কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না।

এলোকেশী কৈফিয়তের ভাবে বলে, কাজকর্ম সেরেসুরে সবাই শুয়ে পড়লে তবে আসতে হল কিনা। তাই এত রাত। কতক্ষণ এসেছ?

বাজে কথা না বাড়িয়ে কেতু জলের উপর সাবধানে বোঠের টান দিল। তাড়াতাড়ি বারকয়েক বেয়ে মাঝ-গাঙে টানের মুখে এনে ফেলল। নৌকা তীরবেগে ছুটেছে।

কি ভাবছিল এলোকেশী অন্যমনা হয়ে। হঠাৎ চমক ভেঙে উঠল।

কদ্দূর এলাম—

তা এসেছি মন্দ কি! মর্জালের মুখ ঐ সামনে।

আরে সর্বনাশ! উড়িয়ে নিয়ে এসেছ। অনেকটা পথ এসে পড়েছি তো!

কেতু পরম পুলকে বলল, কেউ আর নাগাল পাচ্ছে না। ভয় আমারও ছিল, কোথায় কোন চেনা-মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

ফিরতে হবে যে—

কেতু সবিস্ময়ে বলে, কেন—কি হল?

একটা কাজ বাকি আছে। সেটা না হলে কোনখানে গিয়ে সোয়াস্তি পাবো না।

বোঠে তুলে কেতু উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। এলোকেশী বলে, দুর্লভকে অমনি-অমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না। এত শত্রুতা সাধল, তার কিছু হওয়া চাই—

তাতে পরমোৎসাহ কেতুর। এলোকেশীর ইচ্ছাক্রমে তুর্লভের শাস্তিবিধান—এলোকেশীর ঘরে বসে যে তুর্লভের হাসাহাসি ও পান-খাওয়া দেখেছে—এর চেয়ে করণীয় কাজ কি থাকতে পারে কেতুর ?

এলোকেশী প্রশ্ন করে, কি করা যায় বল দিকি ?

করা তো কত কিছুই যেতে পারে। নাক-কান কেটে বোঁচা করে দিতে পারি। কানা করে দেওয়া যায়—খানিক ন্যাড়াসেজির আঠা চোখে দিয়ে মণির ওখানটা আঙুলে ঘুলিয়ে দিলে ব্যস, তুনিয়া অন্ধকার !

চিন্তিত ভাবে পুনশ্চ বলে, মুশকিল হল, রায়গাঁর সদরে চলে গেছে সে হারামজাদা। অনেক দূর। তা-ও হত—কিন্তু বিষম উজোন কাটিয়ে যেতে হবে। পাশখালির ভিতর দিয়ে ঢুকবে কিনা—তা-ও বলা যাচ্ছে না।

যেতে হবে—। এলোকেশী জেদ ধরল, বুঝেছ—নৌকা না নিয়ে গেলে হবে না। ভয় নেই, তোমার কিছু করতে হবে না। আমায় পৌঁছে দাও—যা করতে হয় আমি একাই করব।

ভয় ? যেন ভয় পেয়েই কেতু এগুতে যাচ্ছে না—এই কথা এলোকেশী ইঙ্গিতে বলল। পথ যত কষ্টের হোক, এর পরে কোনমতে আর দ্বিধা করা চলে না।

নৌকার মুখ ঘুরাল। প্রাণপণে বাইছে। গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেল, কিন্তু পথ এগিয়েছে সামান্যই। একজায়গায় নৌকাটা ধরে কেতুচরণ সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

গেল কোথায় ? আশ্চর্য তো—কিছুই না বলে ছুটে বেরুল। এলোকেশী উদ্বিগ্ন হল—একা-একা কি করবে ভেবে পায় না।

তবে যেখানে ফিরে এসেছে, জায়গাটা মৌভোগ থেকে দূরবর্তী নয়। কেতু গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটা নৌকার খোলে এলোকেশীর ক্যাশবাক্সের উপর রেখে দিয়েছে। এই পুঁটলি নিয়েই কেতুচরণ এলোকেশীদের বাড়ি উঠেছিল—তার যথাসর্বস্ব এর ভিতর। যথা-সর্বস্বের ওজন—কেতু আর এলোকেশী দু-জনের মিলে—সের আষ্টেক হবে বড় জোর। যথাসর্বস্ব সঙ্গে নিয়েই তারা মৌভোগ ছাড়ল।

ফিরে এসে কেতুচরণ কাড়ালে বসে আবার বোঠে ধরেছে। এলোকেশী বলে, গিয়েছিলে কোথা ?

বজ্জাত মানুষ—শুধু হাতে কাছে যাওয়া ঠিক হয় না। তা পেয়েছি—একটা হেঁসো-দা জোগাড় করে আনলাম।

মধুসূদন রায়ের জঙ্গল-কাটা লোকজন কাছাকাছি কোথায় ছিল—হেঁসোখানা সেখান থেকে জুটিয়েছে।

অনেকক্ষণ কাটল। মুখ বেঁকিয়ে কেতু বলে, আর হয় না। বিষম বেগোন। লা মোটে নড়ছে না—ঠাহর পাও ?

তবে ?

হালে বসতে পারো তো বলো। আমি তা হলে আর-একটা বোঠে ধরি, দুই বোঠেয় কিছু কাজ হবে।

দেখি চেষ্টা করে—

নৌকা ঘুরে যায় না যেন। খবরদার! বানচাল হবে তা হলে।

বাঁক ডুই গিয়ে পাশখালির মুখ। উল্টো-পাল্টা ঢেউ কাটিয়ে এলোকেশী অবলীলা-ক্রমে নৌকা খালের মধ্যে নিয়ে তুলল।

বিস্ময়ে কেতুচরণের চোখে পলক পড়ে না।

বাঃ রে বাঃ—পাকা মাঝি যে তুমি !

এলোকেশী হেসে বলে, কিন্তু দাঁড়ি তুমি মোটেই ভাল নও। নৌকো এগোয় কই ?

এগোবে—এই দেখ, সাঁ সাঁ করে চলবে এইবার—

ঝপ্‌পাস করে কেতুচরণ খালে লাফিয়ে পড়ল। ঠেলছে নৌকা। গায়ের সমস্ত শক্তিতে জীবন পণ করে ঠেলছে। রায়গাঁ পৌঁছুতে কতক্ষণই বা লাগবে এত কষ্ট করলে? দুর্লভের হাঙ্গামাটুকু চুকিয়ে তারপর ভেসে পড়বে সে আর এলোকেশী। ঐ যেমন পুঁটলি ও ক্যাশবাক্স একত্র আছে, অমনি জীবন-ভোর একত্র থাকবে দু-জনে। জলজঙ্গল ছেড়ে উত্তরের ডাঙা অঞ্চলে—হয়তো বা শান্তিনগরে গিয়ে ঘর বাঁধবে।

গাঙের অনতিদূরে রায়বাড়ি। ফটকের লাগোয়া গোলপাতার চৌরিঘর—আমলা-গোমস্তারা সেখানে থাকে। দুর্লভও নিশ্চয় সেই ঘরে এসে উঠেছে। কেতু কিন্তু গাঙের ঘাটে নয়—খাঁড়ির মধ্যে নৌকা নিয়ে এল। জায়গাটা চৌরিঘরের একেবারে কানাচে বললেই হয়। আর কোন নৌকা নেই। কাজ সেরে এখান থেকে খাঁড়ির অপর মুখে সোজা বড়-গাঙে পড়বে, তুড়ুক-সওয়ারের মতো তীব্র স্রোতে দুলতে দুলতে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পোহাতি-তারা উঠে গেছে, রাত আর বেশী নেই। পাড়ে লাগতে না লাগতে এলোকেশী লাফিয়ে পড়ে। তার মোটে সবুর সইছে না। কেতু বলে, নৌকো বেঁধে আমিও যাচ্ছি। রোসো—একলা যেও না, একলা যাওয়া ঠিক নয়।

তার হাত নিশপিশ করছে দুর্লভের চোখ ঘুলিয়ে দেওয়া—অন্তুতপক্ষে হেঁসোর পোঁচে নাক-কান কাটার জন্য।

এলোকেশী বলে, আসছি এক্ষুনি। এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

অর্থাৎ সে খবরাখবর নিতে গেল—ঘরে আছে কিনা দুর্লভ, কোথায় ঘুমুচ্ছে, বাইরের লোক কেউ সেখানে আছে কিম্বা নেই। অসঙ্কোচে চলে গেল—যেন বাড়িটার অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে, হামেশাই আসা-যাওয়া আছে এখানে। একা যাওয়া এক হিসাবে অবশ্য ভালই হয়েছে। কেতুচরণ সঙ্গে থাকলে দুর্লভের সন্দেহ হতে পারত। তবু কেতু বার বার ভাবছে, ডাংপিটে মেয়ে একখানা বটে—বাপরে বাপ!

গেল তো গেল—ফিরবার নাম নেই। ঘর তো ঐ—খোঁজখবর নিয়ে আসতে কতটুকু সময় লাগে? রাতের মধ্যেই অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়বার মতলব—কিন্তু সে আর ঘটে ওঠে কই? দুর্লভ যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তো সবচেয়ে ভালো—নিঃশব্দে সাফাই হাতে কাজ সেরে ফেলবে।....হাঁসকল তুলে বা অপর কোন কৌশলে দরজা খুলে ফেলে শয্যার পাশে দাঁড়াল, হাত বুলিয়ে নাক-চোখ-কানের অবস্থানও অনুভব করে নিয়েছে, ধারালো অস্ত্রটা তারপর আঁধারে একটু ঝিকমিকিয়ে উঠল · ওরে বাবা রে!···ধুপধাপ দৌড়ানোর শব্দ—আততায়ী কোনদিকে যে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল, কিছুমাত্র নিশানা নেই। প্রতিবেশীরা এসে জিজ্ঞাসা করে, কি গো, কি হয়েছে হালদার মশাই? মুখে দরদের কথা বলতে বলতেও মুখ টিপে হাসে সকলে। দুর্লভ হালদার তার পর থেকে খোনা-খোনা কথা বলে, লোকের সামনে নাক-কান ঢেকে বেড়ায়—

ভাবতে গিয়ে কেতুচরণ একাই খল-খল করে হাসে। কিন্তু

এলোকেশীর হল কি বলো তো? মেয়েটাকে ও-ভাবে একলা যেতে দেওয়া উচিত হয় নি।

কেতুর সকল উৎসাহ হিম হয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে মনে হচ্ছে, হাত-পাগুলো পর্যন্ত জমে অসাড় হয়ে গেল—চলে ফিরে বেড়াতে পারবে না সে আর।

পদশব্দে সচকিত হয়। দুর্লভ আর এলোকেশী দু-জনে—দুর্লভের হাতে লণ্ঠন। সাংঘাতিক মেয়ে সত্যিই—ঘরে বোধ করি বেশি লোকজন, ভুলিয়ে তাই খাল-ধারে এনেছে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে ভুজুংভাজাং দিয়ে আনতে দেরি হয়ে গেল। চুপিসারে কাজটা হবে না, কেতুচরণকে চিনে ফেলল যে দুর্লভ! কিন্তু তা বলে উপায় কি? ক্ষতিও নেই, আর তারা এ তল্লাটে ফিরছে না। বরঞ্চ এ ভালই হল—ইচ্ছে থাকলেও সে বা এলোকেশী কেউ ফিরে আসতে পারবে না। অনুমানে হাত বুলিয়ে কেতু পিছনের হেঁসো-দার বাঁট মুঠো করে ধরল। ঠিক আছে। এলোকেশীর ইশারার অপেক্ষা।

দুর্লভ বলছিল, এলে তা যেন একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে। থাকো না আর খানিক—কি হয়েছে? জানাজানি হল তো বয়ে গেল—একদিন তো হতই। মধুবাবুর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি—কোন শালার আর পরোয়া করি নে। নৌকো কে বেয়ে নিয়ে এল—এই, কেরে তুই?

কেতুর দিকে চেয়ে বলে, এত তাড়া কিসের রে? এখনো বিস্তর গোন আছে। থাক না বসে। কে তুই, মুখ ফেরা দিকি—

কেতুচরণ মুখ ফেরায় না—ভালমন্দ জবাবও দেয় না কিছু। সে কি দুর্লভের ভিটে-বাড়ির প্রজা যে পরম বশম্বদ হয়ে হুকুম তামিল করবে?

এলোকেশী পরিচয় দিয়ে দিল, আমাদের কেতুচরণ গো—

তারপর দরদ-ভরা কণ্ঠে বলে, ভারি কষ্ট করে নিয়ে এসেছে। কেতু না থাকলে আসা মুশকিল হত। মন গুমরে কেঁদে কেঁদে মরছি এ কদিন—জোর করে এসে পড়ে আজকে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে বলে, তুমি কিন্তু কক্ষনো যেতে না—হুঁ—সরকারী ঘেরিবাবু এখন—বয়ে গেছে আমাদের মতন খেঁদি-পেঁচির খোঁজখবর নিতে।

কেতুচরণ চমকে তাকাল তাদের দিকে। তাই তো রে! চলনে-বলনে আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখল, এলোকেশীর দু-চোখে অশ্রুর দাগ। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি ও মন-বোঝাবুঝি চলছিল। আর মশার ঝাঁক এদিকে কেতুর গায়ের অর্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে দুর্লভ সহসা উচ্চ হাসি হেসে ওঠে।

দেখ, চেয়ে দেখ, কি মূর্তি হয়েছে হতভাগার!···কাদামাটি গায়ে মেখে অমনি ভাবে এতক্ষণ রয়েছিস—হ্যাঁরে কেতু, মানুষ না জন্তু তুই?

মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা অবধি নোনা কাদা লেপটে রয়েছে। অদ্ভুত চেহারা। এলোকেশীও হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

এলোকেশী হাসছে—যার জন্য রাত্রির অন্ধকারে কুমির-কামটের ভয় অগ্রাহ্য করে নৌকা ঠেলে নিয়ে এসেছে। অবিশ্রান্ত হাসি হেসে গড়িয়ে পড়ছে দুর্লভের গায়ের উপর। দুর্লভও হাসছে। ফুল-কোঁচা-দেওয়া ধুতি দুর্লভের পরনে, চোখে চশমা। রাতে

অমনি কোঁচানো ধুতি পরে শোয়—না, এরই মধ্যে বদলে এসেছে? রাত্রিশেষে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় পাশাপাশি ওদের মানিয়েছেও চমৎকার।

কলকণ্ঠে এলোকেশী বলে, আয়না থাকলে দেখতে পেতে, ও কেতুচরণ, ডোরা-কাটা চিতেবাঘের মতো হয়ে গেছ।

কেতুচরণ বোঠে দিয়ে পাড়ের মাটিতে আঘাত করল।

তুমি তো ফিরছ না এখন এলোকেশী, আমি চললাম। না বলে নৌকো নিয়ে এসেছি, সেইখানে আবার বেঁধে আসতে হবে।

একটু গিয়ে নৌকার খোলে নজর পড়ল। চিৎকার করে বলে, নিয়ে নাও তোমার জিনিস—

এলোকেশী কি বলছিল—কোন কথা কেতুচরণের কানে পৌঁছল না। ক্যাশবাক্স ছুড়ে দিল খাঁড়ির মাঝখান থেকে। বাক্স খুলে গিয়ে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল।

স্রোতের সঙ্গে নৌকা ভেসে চলেছে, বাওয়ার প্রয়োজন নেই। কুয়াসাচ্ছন্ন ঊষায় নিশ্চল প্রেতমূর্তির মতো কেতুচরণ বোঠে ধরে চুপচাপ বসে রয়েছে।

১৪

কতদিন গেল তারপর? হিসেব করে দেখ, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। এরই মধ্যে হঠাৎ একবার অনেকগুলো টাকা কেতুচরণের হাতে পড়ে গেল। সড়কি ও লাঠি সম্বলে বড় এক বাঘ মেরেছিল তারা। মরা-বাঘ সদরে দেখিয়ে সরকারী পুরস্কার

পাওয়া গেল। তিন জন ছিল—প্রত্যেকের ভাগে পড়ল এক কুড়ি পাঁচ। টাকাগুলো পিতলের ঘটিতে পুরে কেতু মাটির নিচে পুঁতল। আর ভাবনা কিসের ?

কিন্তু ইতিমধ্যে আর-এক ল্যাঠায় জড়িয়ে পড়েছে। দিগম্বর বিশ্বাসের মেয়ে টুনিকে সে পছন্দ করে ফেলেছে, বিয়ে করবে। বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হবে এবার। এলোকেশী যেমনধারা সংসার পেতেছে দুর্লভের সঙ্গে। দুর্লভ এখন আর মধুবাবুর মাটি-কাটা বাঁধবন্দীর ম্যানেজার নয়, বনকরের চাকরি নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। মতিরামও দোকানপাট তুলে ভাইকে নিয়ে কোন মুল্লুকে গেছে, খোঁজখবর নেই। কেতুচরণ কিন্তু মৌভোগের মায়া কাটাতে পারে নি। দিগম্বরের ওখানে বেশির ভাগ সময় কাটায়, কাজকর্ম করে—যেমন এককালে করত মান্যধরের বাড়িতে। ওরই মধ্যে ফাঁক কাটিয়ে এক-একদিন সে মৌভোগে চলে আসে। মৌভোগ পুরোপুরি গ্রাম এখন। জঙ্গল হাসিল হয়ে লোকবসতি আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাটবাজারের প্রয়োজন। মধুসূদন হাট বসাবার জন্য তাই উঠে পড়ে লেগেছেন। বড়দলের হাট কানা করে দেবেন, এই অভিপ্রায়।

অনেকদিন ধরে অনেক টালবাহানা করে কেতুচরণ অবশেষে স্পষ্টাস্পষ্টি প্রস্তাব করল দিগম্বরের কাছে। জবাব শুনে চক্ষু কপালে উঠল। মেয়ে দিতে আপত্তি নেই, তবে পণ লাগবে একশো এক টাকা। ঐ রকম নাকি দর উঠছে।

একশো এক....জানো তো কাকে বলে ? পাঁচ কুড়ির উপরেও এক বেশি। বোঝ। যে টাকায় স্বচ্ছন্দে এক জোড়া হালের বলদ কিনতে পাওয়া যায়, কায়দায় পেয়ে দিগম্বর তাই হেঁকে

বসল তার রোগা-ডিগডিগে বারো-বছুরে মেয়েটার জন্য। অর্থাৎ কেতুচরণের আরও প্রায় চার কুড়ি টাকার জোগাড় দেখতে হবে।

আবার ছুটোছুটি। ঘর সে বাঁধবেই। এক কাঠুরে নৌকায় কাজ জুটিয়ে নিল। একশো টাকা জমানো—সোজা ব্যাপার! কজনের আছে? নবাব সিরাজদ্দৌলার ছিল। অযোধ্যার রাম-রাজার ছিল। মধুসূদনবাবুরও থাকতে পারে। তোমার আমার পক্ষে একশো টাকা এক ঠাঁই করা বাপরে, বাপরে, বাপ!

তা বলে কেতু পিছপাও নয়। পর পর পাঁচ মরশুম বাদাবনে কাঠ কেটে বেড়ায়। মরশুম অন্তে ফিরে এসে মাটি খুঁড়ে ঘটি তুলে নতুন এক-এক দফা টাকা পোরে। বউ চাই, ঘর-সংসার চাই। টাকা না হলে কিচ্ছু হয় না, টাকার দরকার।

পাঁচটা বছর কাটল এমনি। এখনো বাকি আছে। শেষ বারে এসে দিগম্বরের বাড়ি খোঁজ নিতে গেছে—টুনি এক দেড় মাসের মেয়ে কাঁকালে নিয়ে বাঁকা হয়ে এসে দাঁড়াল। মেটে-সিঁদুরের টানা রেখা সিঁথির মাঝ বরাবর—সিঁথি ও কপালের উপর তিন-নরী রুপোর সিঁথিপাটা। কদিন হল টুনি বাপের বাড়ি এসেছে, এই মেয়ে হয়েছে। কেমন হয়েছে দেখ দিকি। কোলের মেয়েটা কেড়ে নিয়ে কেতু যে তখন আছাড় মারে নি—সেটা টুনি ও মেয়ের বাপের ভাগ্যি।

কত দিন হয়েছে, হিসাব করে দেখ তাহলে।

উমেশের সঙ্গে ইদানীং খুব দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে। গুণী লোক উমেশ, বিদ্যার জাহাজ—সেই মানুষ কি রকম হয়ে গেছে! কথাবার্তা পণ্ডিতজনের মতোই বটে। বলে, বিয়ে-থাওয়ার নাম করবি তো বনবে না আমার সঙ্গে। বেশ তো আছিস—খাচ্ছিস-

দাচ্ছিস, তা নয়, শালকে আহ্বান করা—শালগাছ, বনে থাকো কেন বাপু? শূল হয়ে এসে দিল-কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করো। মেয়েমানুষ হল শূল—অম্লশূল, পিত্তশূল কোথায় লাগে? তাই চক্ষুশূল আমার কাছে।

হা-হা করে উমেশ হাসতে থাকে। কথাগুলো কেতুচরণের পছন্দসই নয়, কিন্তু পদ্মর বৃত্তান্ত জানে বলে তর্কাতর্কি করে না। আহা, বড্ড দাগা দিয়ে গেছে পদ্ম। পদার সঙ্গে চলে গিয়েছিল—কিন্তু তারও চেয়ে বড় দুঃখ, পদ্মর ঘরকন্না সুখের হয় নি। পদ্মকে উমেশ দেখে নি তারপর। আর দেখবেও না। পাঁচুর (এখন আর এক পাঁচু জুটেছে বলে পদ্মর ভাই পাঁচুকে গোল-পাঁচু বলে সকলে) মুখে শোনা, ওলাওঠায় মরেছে সে। যারা পদাকে ভালরকম জানে, তারা কিন্তু বলে, মিথ্যে কথা—পদাই হয়তো গলা টিপে মেরে গাঙের জলে ফেলে দিয়ে পরে ঐ রকম রটনা করেছে। যেমন কর্ম তেমন ফল! ভায়ের সংসারে দিব্যি তো ছিল—সাঙা করতে গেল কেন ভিনদেশি গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষটাকে?

উমেশের কিন্তু রাগ নেই। চোখে জল আসে পদ্মর কথা ভাবলে। মোহমুগ্ধ পদ্ম—সে তো পাগল তখন। মতিচ্ছন্ন মানুষের উপর রাগ করা চলে না। গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছে। পদা বাঘের মতন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই অবস্থাটা উমেশ ভাববার চেষ্টা করে। কি ভাব মনে হয়েছিল তখন পদ্মর? চকিতে একবার মনে এসেছিল কি ওমশার কথা—পদা এসে পড়বার পর থেকে যাকে কেবলই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, মানুষ বলে মনে করে নি?

উমেশ গান-বাজনা নিয়ে আছে। সবাই হেনস্তা করে, কিন্তু

তাতে তার দৃক্‌পাত নেই। পদ্ম ও পদার কাছে লাঞ্ছনা পাবার পর এ সমস্ত একেবারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। একটু যদি দৃষ্টিমুখ দাও, আনন্দে শতখান হবে। বিরক্ত হয়ে গালমন্দ করো যদি—মুখ শুকনো হবে হয়তো, কিন্তু রাগ করবে না। রকমারি বাজনা গিয়ে ঢ্যাবঢেবে এক ঢোলে এসে ঠেকেছে। মান্যধর মারা গেছে, ঘরবাড়ি জমাজমি প্রায় সমস্তই গেছে—কোন রকমে ভাতটা জোটে। তার উপর বাদ্যযন্ত্র কিনবে কি দিয়ে? তা হয়েছে ভাল। ভাল বাজনার সঙ্গে উমেশের ও-গলার গান আরও উদ্ভট শোনাত।

উমেশ ছাড়াও গোল-পাঁচু, গুলি-পাঁচু, ঋষিবর, খুশাল—একসঙ্গে অনেকে জুটেছে। আছে মন্দ নয়, সন্ধ্যার পর জমজমাট আড্ডা। যদি জিজ্ঞাসা করো, এত লোকের খাওয়া-পরা চলে কিসে? গায়ে জোর আর মাথায় একটু ঘিলু থাকলে বাদা অঞ্চলে কিসের দুঃখ? কোন অভাব নেই ওদের।

১৫

বনবিবিতলায় প্রায় মুখোমুখি মধুসূদনের নূতন হাটের পত্তন হচ্ছে। এই বছর দশেক আগেও কশাড় জঙ্গল ছিল—হাসিল হতে হতে আবাদ এতদূর অবধি পৌঁছেছে। বনবিবিতলাই বাদার সীমানা। খালপারের যাবতীয় এলাকা বনবিবির করচ্যুত হয়ে এখন রায়বাবুর দখলে।

মেলা বসেছে হাটের মুখবন্ধ স্বরূপ। পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। খুব নাম ছড়িয়েছে, বিস্তর লোক যাতায়াত

করছে, দোকানও বসেছে হরেক জিনিসের। লোকপরম্পরা শোনা যাচ্ছে, মেলার শেষ মুখে মানিক-যাত্রা ও জারিগান হবে। বায়স্কোপ এসে এক রাত্রি চলন্ত ছবির খেলা দেখিয়ে যাবে, সে চেষ্টাতেও আছেন রায়বাবু। কিন্তু এত দূর বলে কোন কোম্পানি রাজি হচ্ছে না। এসব ছাড়াও আমোদ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। মেলা শেষ হয়ে গেলে পৌষ-সংক্রান্তির পর সপ্তাহান্তিক হাট বসবে মেলারই জের হিসাবে। এ মচ্ছব জুড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

হাট বসানো সোজা নয়—বিশেষ এই বাদা অঞ্চলে। রকমারি জিনিসের দোকানপাট থাকবে, প্রচুর তরিতরকারি ও মাছ-শাক উঠবে হাটের দিনে—তবেই না মানুষ গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে এসে জড়ো হবে। বাড়তি আকর্ষণের আরও যত ব্যবস্থা করতে পারা যায়, ততই ভাল। আমদানি মালপত্র প্রথমটা খরিদ্দারের অভাবে সম্পূর্ণ বিক্রি হবে না। কিন্তু মাল ফেরত নিয়ে গিয়ে পাইকার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দ্বিতীয়বার সে এমুখো হবে না। তাই বেচাকেনার পরে অবশিষ্ট যা-কিছু থাকবে, কিনে নিতে হবে এস্টেটের তরফ থেকে। সেগুলো লোকজনের মধ্যে বিলি-বিতরণ করো অথবা গাঙের জলে ঢেলে দাও। গাঙে ঢেলে দেওয়াই সমীচীন—কলিকালের ছ্যাঁচড়া মানুষ একবার মাংনা পেয়ে গেলে অতঃপর আর পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে না, হাট ভাঙা অবধি অপেক্ষা করবে যদি আবার বিনি পয়সায় পাওয়া যায়।

গোড়ায় গোড়ায় এমনি করতে হয়। হাট একবার জমে গেলে তখন মজা—দু-হাতে দেদার তোলার পয়সা কুড়িয়ে বেড়াও। বড়দলের ঐ যে অত বড় হাট—যার এক আনা অংশের মালিকেরও

মাস গেলে কোন্ না হাজার দেড়হাজার পাওনা হয়—সে হাটেরও গোড়ার ইতিহাস এই। বনবিবি মুখ তুলে চান তো রায়হাটেরও একদিন সেই অবস্থা হবে। আর তা হবেই। মধুসূদন কর্মবীর—অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা তিনি রাখেন। খাটছেনও খুব। যখন-তখন সেই যে জঙ্গলে গিয়ে পড়তেন—সে সব বন্ধ এখন। নীলরঙের এক শৌখিন পানসি বানিয়ে নিয়েছেন—মৌভোগ ও রায়গাঁর মধ্যে সেই পানসি আনাগোনা করে। এ পথে যত ধানকর-জলকর পড়ে, বড় গাঙগুলো ছাড়া সমস্তই প্রায় মধুসূদনের সম্পত্তি। ছিটে-চক যা তু-একটা বাকি আছে—তা-ও বেশি দিন অন্যের থাকবে না। পড়তেই হবে তাঁর কবলে। লক্ষ্মী ঝাঁপি উজাড় করে ঢালছেন—রায়গাঁর সদর-উঠানে ফি বছর একটা-তুটো করে গোলা বাড়ছে। এবারেরটা দিয়ে মোট পনেরো হল।

একটা বড় অসুবিধা, মিঠা জলের বন্দোবস্ত হচ্ছে না। অজস্র অর্থব্যয়ে মধুসূদন টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন। গভীর ভূগর্ভ থেকে যে জল আহৃত হল, তা খাওয়া চলে; ডালও সিদ্ধ হয় অনেকক্ষণ জ্বালানোর পর। কিন্তু মুশকিল—একটা-তুটো টিউকলে (লোকের মুখে মুখে এই নামকরণ হয়েছে) হাটুরে লোকের দায় মেটে না। তা ছাড়া দারুণ নোনায় বছর খানেকের বেশি কর্মক্ষমও রাখা যাবে না—উপরের লোহায় মরিচা ধরে অব্যবহার্য হয়ে পড়বে। নদী থেকে যথাসম্ভব দূরে পুকুর কেটে পরীক্ষা করা হবে, তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। আপাতত রায়গাঁ থেকে জল আসে—ডিঙি বোঝাই করে রোজ তু-তিন ক্ষেপ আনা হয়। রায়বাবু যখন আসেন, নীল-পানসিতে দশ-বারো কলসি তিনিও সঙ্গে আনেন।

খুশাল একদিন মধুসূদনের কাছে এলো। মধুসূদন রায়গ্রামে আছেন—খোঁজ নিয়ে সেই সময়টায় এল, মৌভোগে মেলার মানুষের মধ্যে এত আগে জানাজানি হতে দিতে চায় না। দলের মধ্যে খুশাল ভারি হিসেবি। বেঁটে খাটো রোগা মানুষটি—দেহ হাড়মাংসে নয়, যেন ইস্পাতে গড়া। ইস্পাতের মতোই গায়ের রং।

এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে এসেছে—রায়হাটের প্রান্তে তারা মাছের সায়ের করবে। গাঙে খালে মাছ পড়ে। আবার চকদারের পত্তনি-নেওয়া ধানকর জলকর থেকেও চুরি করে মাছ ধরে অনেকে। মাছের খরিদ্দারও আছে, কিন্তু ঠিক সময়ে বেপারির নাগাল না পাওয়ায় বিস্তর মাছ নষ্ট হয়ে যায়। সায়ের হলে সেখানে বেপারিরা ওঠা-বসা করবে, মাছের নৌকা এসে ভিড়বে। এরা দস্তুরি পাবে। বুদ্ধিটা করেছে ভাল। উঠতি হাট—জমিয়ে তুলতে পারলে, খুশাল হিসাব করে দেখিয়েছে, ঝুড়িপিছু দুটো করে পয়সা রাখলেও দৈনিক দু-টাকা আড়াই টাকা হওয়া বিচিত্র নয়।

মধুসূদন চমৎকৃত হলেন মনে মনে। করিৎকর্মা লোক এরা—মুখে যা বলছে, কাজেও ঠিক তাই করবে। এস্টেটের পক্ষে বিশেষ লাভের ব্যাপার—এখন যা দেয় দিক, দু-পাঁচ বছর পরে সায়েরের ইজারা নিলামে চড়িয়ে বেশ মোটা সেলামি আদায় হবে।

বাদার জঙ্গলে মধুসূদন একরকম, এখানে একেবারে আলাদা আর-এক লোক। আবার যখন কলকাতায় ছিলেন, শোনা যায়, সেই ছিমছাম শৌখিন যুবকটির সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই এখানকার রায়বাবুর। ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি গভীর জলের মাছ—

সহজে ধরা দেবার পাত্র নন। খুশালের প্রস্তাব শুনে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, বেশ তো—ভাল কথা। গ্রাহক আরও দু-দশজন হাঁটা-হাঁটি লাগিয়েছে—

খুশাল স্তম্ভিত হল। বাদার এই দুর্গম সীমান্তে তার আগেও এ-ফন্দি এসে গেছে অন্য লোকের মাথায়!

বলে, দু-জন না দশজন বাবু?

রায়বাবু হেসে বললেন, গুনে কে রেখেছে? আর তাতে এলো-গেলো কি? কারো সঙ্গে এখনো পাকা কথা বলি নি। লম্বা সেলামির লোভ দেখাচ্ছে—পাঁচ শ অবধি উঠেছে। উঠবে না কেন, লাভটা কি রকম হবে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তো! এ-বাজারে বোকা কে আছে বলো?

পাঁচ শ অঙ্কের উল্লেখ করে মধুসূদন সতর্কভাবে খুশালের মুখভাব লক্ষ্য করেন। নিরাশাব্যঞ্জক। গলা নামিয়ে সদয়কণ্ঠে তখন বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার তো শুধু টাকা দেখলে হবে না। নতুন হাট বসাচ্ছি—জিনিসটা ভাল ভাবে গড়ে উঠুক, সেইটে চাই সকলের আগে। তা তোমায় দেখে ভরসা হচ্ছে। বাদাবনে চলাচল করে বেড়াও—বলতে গেলে জঙ্গলের মানুষ—তোমাদেরই হবে। বাইরে থেকে এসে হঠাৎ কেউ সুবিধে করতে পারবে না। মাংনাই দিয়ে দিচ্ছি—দেড়শটি টাকা দিও এ বছরের মতো। ওর থেকে আমি সিকি পয়সাও খাচ্ছি নে, মায়ের পুজোর খাতে পুরোপুরি জমা থাকবে।

খুশাল বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। বিনা পুঁজির ব্যবসা বলেই এত দূর এগিয়েছে। অবাক করে দেবে বলে দলের সকলের অজান্তে একাকী সে এসেছে! কিন্তু টাকা কোথায়? যে রকমটা

দেখা যাচ্ছে—আর দশজনার মতো ... ত্তি ধরে স্থির হয়ে বসা তাদের ভাগ্যে নেই।

মধুসূদন লোক চরিয়ে ... । অবস্থা বুঝতে পেরে আরও সহানুভূতি দে... ... ত পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে জুতমতো জায়গা ... । বাকি টাকা কাজকর্ম শুরু হয়ে গেলে ত ...

বলে সিঁড়ি বেয়ে দো... ... গেলেন। অর্থাৎ এর উপরে আর কোন কথা শুনতে ...

মনের দুঃখে খুশাল ফিরে এল ... ...য়ার-বন্ধুদের বলল সমস্ত। নবাব খাঞ্জে খাঁ তো সকলে—পঞ্চাশটা পয়সা চাঁদা করে ওঠে কিনা সন্দেহ। কেতুচরণের ছিল—কিন্তু টুনির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত ফুঁকে দিয়েছে। এমন কি খুলনা শহরে গিয়ে সেই সময়ে পনেরোটা দিন হোটেলে খেয়ে টহল দিয়ে বেড়াত, যাতে টাকাপয়সা খরচ করে তাড়াতাড়ি ভারমুক্ত হতে পারে।

হঠাৎ অভিনব ভাবে সুরাহা হয়ে গেল। ধন্য মাতা বনবিবি! বনবিবির করুণার অন্ত নেই।

১৬

গার্ড হরিপদ মর্জাল স্টেশনে ফিরছে সদলবলে। একটা জঙ্গল জরিপ হচ্ছে—সেই ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। বাবুরা গিয়েছিলেন লঞ্চে। রেঞ্জার সাহেবের লঞ্চ—ওখানকার কাজ শেষ করে আরও নাবালে সুপতি স্টেশনের দিকে তাঁরা চলে গেছেন। এরা ডিঙিতে

আসছে। মাঝি [illegible] সাকুল্যে আটজন। ভাঁটার খরস্রোতে তুলে [illegible] ডিঙি [illegible]। আর ডিঙির গলুইতে বসে, বাবুরা উপস্থিত [illegible] হুকুম-হাকাম দিচ্ছে। যেন বাদারাজ্যের রাজচক্র [illegible]

তিনখানা বোঠে [illegible] পদ হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে। তামাক খা [illegible] য়ে মাঝিকে ফিসফিস করে বলল হালটা আল [illegible] লের উপর—যাতে কোন রকম শব্দ-সাড়া না হ [illegible] স্তে আস্তে ডিঙি এগুচ্ছে। বিপজ্জনক এভাবে চলা [illegible] র আক্রমণের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া চড়ায় আটকে নৌকা বানচাল হতেও পারে। কিন্তু যতই হোক সরকারি মানুষ বসে থেকে হুকুম করছে—এ তো খোদ লাট সাহেবের হুকুমেরই সামিল। তা ছাড়া হরিপদ বাদা-অঞ্চলে আছেও কম দিন নয়—সমস্ত জেনে শুনে যখন বলছে, ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর।

পাড়ের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাটি আর কোথায়—বলা-ঝোপ, গোলবনের শিকড়, শুলো। দোয়ানিয়ার মুখে এল। হরিপদ বাঁদিকে আঙুল বাড়ায়। অর্থাৎ ঢুকতে হবে ঐ দোয়ানিয়ার ভিতরে।

মাঝি অশ্বিনীনাথ ঘাড় নাড়ে। সে-ও পুরানো লোক—অনেক অভিজ্ঞতা। এত উজান কেটে নৌকা তোলা দুষ্কর তো বটেই—তা ছাড়া দোয়ানিয়ার দু-মুখ দিয়ে অতি দ্রুত জল নামছে, নৌকার তলি একটু পরেই বসে যাবে নোনা কাদায়। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গরম বাদা—জনমানবহীন—পারতপক্ষে কেউ এদিকে আসে না। হরিপদর

হাতে সড়কি এবং নৌকার ভিতর গাদা-বন্দুকও আছে একটা। তবু এই জিনিসের উপর ভরসা করে বিপজ্জনক স্থানে এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকা উচিত হবে না।

হরিপদও বুঝে দেখল। ভেবে-চিন্তে ঐখানে খালের মুখে ডিঙি রাখতে বলে। একটু দূর হল, কিন্তু কি করা যাবে? অশ্বিনীকে প্রশ্ন করে, শুনতে পাও?

অশ্বিনী কান খাড়া করল। এক ধরনের মৃদু আওয়াজ আসছে এপার-ওপার দু-দিক থেকে। বলে, বাঁদর—

ঠিক বলেছ। থেমে আবার একটু শুনে নিয়ে হরিপদ বলে, হুঁ বাঁদরই।

ক্ষণকাল চুপ করে রইল। তারপর বলে উঠল, এই—এইবার?

বাঁদরের ডাক। বাঁদর ছাড়া আবার কি?

হরিপদ মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। কান দিয়ে শুনছ—না কি? আসল বাঁদর আর নকল বাঁদরে তফাত ধরতে পার না—এদ্দিন বাদায় ঘুরছ তবে কোন্ কর্মে?

বাদাবনে হাতকাটা-হরি নামে সে পরিচিত। মুখের বাঁদিকটা অতি বীভৎস দেখতে। বাঘে ধরেছিল সেবার। সঙ্গীদের চেঁচামেচিতে বাঘ গ্রাস ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রাণে বাঁচল হরিপদ।

বাঘের কামড়ের চিকিৎসা জানো—কোন্ মলম লাগাতে হয় সর্বাঙ্গে? জ্যান্ত অবস্থায় নরক-ভোগ। বরঞ্চ মরে যাওয়াই ভাল ঐ বস্তু মালিশ করে পড়ে থাকার চেয়ে। কিন্তু টোটকা চিকিৎসায় হরিপদর ঘা সারল না, শেষ পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে যেতে হল। সেখানে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল—বাঁ হাতের কনুই অবধি কেটে ফেলতে হল, বাঁ চোখটাও গেল।

কিন্তু বাকি চোখ ও কানের শক্তি আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ হয়েছে সেই থেকে। অশ্বিনী ও আর সকলের কাছে সাধারণ বানরের ডাক—হরিপদ কিন্তু নিঃসংশয় রূপে বুঝেছে, মানুষই বানরের মতো ডাকছে। গাছাল দিচ্ছে মানুষ। এ যে রীতির গাছাল—ওসব শিকারি বড় একটা পাশ নিয়ে বাদায় ঢোকে না। আর শিকারের মরশুমও এটা নয়—এখন পাশ বন্ধ। দিন দুপুরে ডাক ধরেছে, দুঃসাহস কি রকম তাহলে বোঝ। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। মাদারকে বলে, নেমে গিয়ে দেখে আয় তো চুপি-চুপি ক-জন আছে, কি বৃত্তান্ত।

শুলোবন ও কাদা ভেঙে বনে ঢোকা সহজ নয়। হয়তো সবটাই হরিপদর মনের কল্পনা। বাঘের কামড় খেয়ে সাহেবের নজরে পড়ায় সে বড় বেশি মাতব্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনের ভিতর যাই-থাক, হুকুম না শুনে উপায় নেই। আরও দু-জনকে সঙ্গে নিয়ে মুখ বেজার করে মাদার নেমে গেল।

ক্ষণপরে ফিরে এসে পরমোৎসাহে বলে, ঠিক ধরেছ। মানুষ—গাছের মাথায় গুঁটিসুটি হয়ে আছে।

সকলের চোখ টাটায় আমার উন্নতি দেখে। হেঁ—হেঁ, বোঝ তাহলে। সাধে কি সকলকে ডিঙিয়ে হেড-গার্ড করে দিয়েছে!

আত্মপ্রসাদে হরিপদ যেন ফেটে পড়ছে। আবার বলে, ক-জন দেখে এলি?

একটা দেখেই খবর দিতে এলাম। আরো আছে নিশ্চয়—একা-দোকা ওরা বাদায় ঢোকে না। আর হরিণ মারতে এসেছে যখন, নিতান্ত খালি হাতেও আসে নি।

হরিপদ বলে, তাই সুড়-সুড় করে পালিয়ে এলি? একনম্বর

মেয়েমানুষ। মিছেই কেবল দৈত্যের মতো গতর দুলিয়ে বেড়াস।

যাই হোক, এবার উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে সকলে বাদায় নামল। পবন আর মাখনলাল ডিঙি আগলে রইল শুধু। বলে গেল, ফিরতে দেরি দেখলে রান্নাবান্না সেরে রাখে যেন। ভাটার টানে জল যদি অত্যধিক সরে যায়, নৌকা নাবালে সরিয়ে রাখতে বলল।

জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বানরের বড় মিতালি। বানরে কেওড়া-গাছের ডালে লাফায়, ফল-পাতা ছিঁড়ে ফেলে, আর আওয়াজ করে নিমন্ত্রণ জানায়। ডাক শুনে হরিণের দল গাছতলায় আসে। শিকারিরাও অবিকল বানরের মতো করে ডাকে—খাওয়ার লোভে হরিণ এলে গুলি করে গাছের উপর থেকে।

বাদায় ঢুকে পড়ে হরিপদ হেন ব্যক্তিও দিশেহারা হচ্ছে আজকে। চারিদিক থেকে বানরের ডাক। কোন্‌টা খাঁটি, আর কোন্‌টা নকল—ঠিক করবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। অনেক জলকাদা ভেঙে ও শুলোর গুঁতো খেয়ে আন্দাজমতো একটা জায়গায় চলে এল। কা কস্য পরিবেদনা! নির্জন, নিঃশব্দ। অথচ এই এতক্ষণ একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল এখান থেকে—হ্যাঁ—এই জায়গাতেই বটে! তাকিয়ে তাকিয়ে গাছের অন্ধিসন্ধি দেখছে—হঠাৎ পিছনে ধ্বনি ওঠে, যে দিকটা অতিক্রম করে এসেছে। নোনা রাজ্য—পৌষ মাস হলেও শীত প্রখর নয়। ঘোরাঘুরিতে ঘাম ঝরছে, ফতুয়া ভিজে জবজবে হয়ে গেছে গায়ের ঘামে

এবং অসাবধান চলাচলের দরুন জলকাদা ছিটকে উঠে। পা রক্তাক্ত হয়েছে কাঁটার খোঁচায়, কিন্তু অপরাধী ধরবার তাড়ায় এমন মশগুল যে আঘাত টেরই পায় নি। আড়াই প্রহর অতীত হল, সঙ্গের লোকেরা অধীর হয়েছে ফিরবার জন্য। কিন্তু হরিপদ ঘুরে ঘুরে যত নাজেহাল হচ্ছে, জেদ বাড়ছে ততই।

একটা মানুষ তো চোখে দেখেছিস মাদার। সেটাই বা গেল কোথায়?

এ দলের মধ্যে একজন গুণীন আছে—জলধর। সড়কি বন্দুক ইত্যাদি যতই থাক গুণীন সঙ্গে না নিয়ে কেউ বাদায় ঢোকে না, বা ঢোকা উচিত নয়। গুণীন বলেই জলধরকে ডেকে বনকরের চাকরি দিয়েছে। বাদায় নামবার সময় সে সঙ্গে থাকবেই। ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে জলধর বলে, মানুষ হলে ঠিক পাওয়া যেত। পাখনা নেই যে উড়ে পালাবে। মানুষ নয়—বুঝলে হরিপদ? ওনাদেরই কেউ হবেন।

সকলের মনে ঐরকম সন্দেহ। বাদাবনে হিংস্র প্রাণী অনেক—কিন্তু ওসবের উপরে আছেন, তাঁরাই বেশি সাংঘাতিক। নানাবিধ মূর্তিতে উদয় হন—বাঘের মূর্তি, সাপের মূর্তি। অব্যর্থ বাঘবন্ধন মন্ত্রেও সে বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যায় না, সে সাপের বিষ নামাতে পারে এমন ওঝা ত্রিভুবনে নেই। মানুষের চেহারা নিয়েও দেখা দিয়েছেন এমনধারা শোনা যায়। কখনো অবিশ্বাস্য রকমের বিশালাকৃতি পুরুষ, যাঁর এক-একটা পায়ের ছাপ মেপে দেখলে দেড়হাত পৌনে-দুহাত গিয়ে দাঁড়াবে। কখনো বা অতি-সাধারণ একজন—এই আজকের ব্যাপারে মাদার যেমন দেখে এসেছে। দেড় প্রহর বেলা থেকে এরা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে—এখন এই

প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যাবেলাও এদিক-ওদিক থেকে ডাক এসে বিভ্রান্ত করছে। মানুষের কাজ বলে ভরসা করা যায় কি করে?

জলধর বলে, ফেরা যাক এবার—

ভাষাটা অনুরোধের মতো, কিন্তু আদেশের আমেজ কণ্ঠস্বরে। বাদাবনের অশরীরী অধিবাসীদের সুলুক-সন্ধান একমাত্র তারই নখদর্পণে। তার কথা কেউ অবহেলা করতে পারে না।

যাবার সময় কাদায় পা বসে বসে গিয়েছিল, চিহ্নস্বরূপ গোলপাতায় গেরো দিয়ে গিয়েছিল মাঝে মাঝে। সেই সব লক্ষ্য করে অনেক দুঃখে অনেকবার পথ হারিয়ে অবশেষে তারা দোয়ানিয়ার মুখে ফিরে এল। কোথায় ডিঙি? জোয়ার এসেছে—জঙ্গলের অনেক দূর অবধি জল উঠে ছলছল করছে। শেষ ভাঁটায় নৌকা যদি দূরে নিয়ে বেঁধে থাকে, এখন তো আবার যথাস্থানে এসে পৌঁছবার কথা। হু-হু করে বাতাস বইছে, ভরসন্ধ্যায় জল বেশ কনকনে হয়েছে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ উদ্বেগে সতৃষ্ণ চোখে এরা দূরের দিকে চেয়ে আছে। কু দিচ্ছে, বাঁশির আওয়াজ করছে, কিন্তু জবাব পাওয়া যায় না। হল কি? মুখ শুকনো সকলের।

ডিঙি নয়—পবন ও মাখনলালকে পাওয়া গেল অবশেষে। গাছে উঠে বসেছিল, সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। হরিপদ রাগে চেঁচিয়ে ওঠে, এক পহর খোঁজাখুঁজি করছি—ঘাপটি মেরে তোরা কোথায় ছিলি বল্?

ভয়ে তারা জবাব দিতে পারে না। তাদেরই দোষ। ভাঁটা সরে যাওয়ার পর অল্প জলে পাশখালিতে মাছ ধরার ভারি সুবিধা। ভাত চাপিয়ে দিয়ে দু-জনে ওরা জাল নিয়ে বেরিয়েছিল। এমন

হল, মাছের ভারে জাল টেনে তোলা দায়। বাছাই মাছ গোটা কয়েক করে খালুইতে ফেলে বাদ বাকি জলে ছেড়ে দিচ্ছে। কত নেবে, কি হবে অত মাছ দিয়ে? মনের আনন্দে জাল ফেলতে ফেলতে এমনি অনেকটা দূর এগিয়েছে—তারপর খেয়াল হল, ভাত এতক্ষণে ফুটে গেছে—নামাবার প্রয়োজন। ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। কোথায় কি—গোটা ডিঙিটাই অদৃশ্য! নোঙর ফেলা ছিল—তা ছাড়া কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধা ছিল গাছের সঙ্গে। জলের টানে ভেসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুলে নিয়ে গেছে কারা।

কি সর্বনাশ, বন্দুক ছিল যে!

বন্দুক হাতে করে নিয়ে জাল ফেলবে কি করে—বাঁশি বন্দুক সমস্ত নৌকায় ছিল। সব গেছে। এমনটা হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কত এরকম রেখে দূরদূরান্তরে যায়, কখনো তো কিছু হয় না।

হরিপদ চোখ পাকাল পবনের দিকে। স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে পারলে বাবুকে সমস্ত তো বলবেই—বাড়িয়ে এবং [illegible] রং দিয়ে বলবে। বাবু—আজকে আর নয়—কাল রেঞ্জারের সঙ্গে স্টেশনে ফিরবেন। আসা মাত্রই একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে, সন্দেহ নেই। হরিপদ লোকটা সোজা নয়।

অশ্বিনীনাথ চার বছর একাদিক্রমে এই নৌকায় মাঝিগিরি করছে—নৌকার উপর কতকটা অপত্যস্নেহ জন্মে গেছে। সে তো ক্ষণে ক্ষণে ওদের মারতে যায়।

কোন্ আক্কেলে নৌকো ছেড়ে যাস্ তোরা? খা—খালুই-ভরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে চিবিয়ে খা এখন। উঃ—সবসুদ্ধ প্রাণে মারলি রাত্তিরবেলা বাদাবনের ভিতর!

জলধর ধীরকণ্ঠে বলল, ওসব যাক। ফিরবার উপায় ভাবো সকলের আগে।

ক্ষিধেয় নাড়িসুদ্ধ হজম হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু স্টেশনে কি করে ফিরবে, সেইটেই সকলের চেয়ে বড় ভাবনা এখন। নদীখালে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে না। বিশেষ এই রাত্রিবেলা।

হরিপদ সহসা সচকিত হয়।

দেওড় শুনতে পাচ্ছ ?

কই ?

সত্যি সত্যি বন্দুকের দেওড় হলে এতগুলো লোকের মধ্যে হরিপদ ছাড়া আর কারো কানে গেল না, এমন হতে পারে না। কিন্তু শুনতে পেয়েছে হরিপদ—হ্যাঁ, ঠিক শুনেছে। কেবল কানে শোনা নয়। চোখের উপরও যেন দেখতে পাচ্ছে, সরকারি ডিঙি নিয়ে সরকারি গাদা-বন্দুকে দেওড় করতে করতে বে-আইনি শিকারিরা জয়যাত্রায় চলেছে, বিষম স্ফূর্তিতে তাদেরই রাঁধা গরম-গরম ভাত খাচ্ছে, আর হরিপদর দল বন-প্রান্তে পৌষের শীতে দুর্ভাবনায় হি-হি করে কাঁপছে—নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

হরিপদ চেঁচিয়ে ওঠে, ঐ যে—শুনতে পেয়েছ এবার ?

অনতিদূরে হা-হা-হা হাসির শব্দ। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। এই [illegible] কেবারে কাছে। ক্ষিপ্ত দলবল জলকাদা ভেঙে ছুটল।

অশ্বিনী দেখিয়ে দেয়, মানুষ নয়—ভীমরাজ পাখি। মানুষের কলরবে পাখিটা ডালের উপর থেকে উড়ে গেল।

ভীমরাজ এক আশ্চর্য পাখি—নির্জন অরণ্য মধ্যে মাঝে মাঝে

বয়স্ক মানুষের মতো গম্ভীর উচ্চহাসি হাসে, কঠিন কণ্ঠে কাকে যেন কি আদেশ দেয়। জলধর কিন্তু পাখি বলে এদের স্বীকার করে না। বিড়-বিড় করে অবোধ্য-ভাবে কি বলে সেই কাদাজলের মধ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম করল।

১৭

ডিঙি ও বন্দুক জোটানোর পর কেতুদের আর পায় কে! কাউকে পরোয়া করে না তারা—বনবিবি, তুমি মা শুধু প্রসন্ন থেকো।

সরাসরি মেলার মধ্যে মানুষের সামনে ডিঙি নিয়ে এল না, দু-বাঁক দূরে খাঁড়ির ভিতর রেখে দিল। ছই ভেঙে দিল ডিঙির, বড়দল থেকে আলকাতরা কিনে এনে রাতারাতি মাখিয়ে নূতন রং ধরাল। আগেকার চেহারা আর নেই। বনকরের লোকগুলোই যদি এ ডিঙির সওয়ার হয়ে বসে যায়, তবু চিনতে পারবে না কোনক্রমে।

চকচকে ডিঙি ঘাটে বেঁধে সগর্বে কেতুচরণ বলে, কি বলো খুশাল, রোজগার হবে না? কত পঞ্চাশ হয়ে যাবে এই মেলার মওকায়!

ডাঙার নয়—ডিঙির মানুষ কেতুচরণ। অত বড় জোয়ান দু-পা হাঁটতে হিমসিম হয়ে যায়, কিন্তু বৈঠা হাতে ডিঙিতে বসিয়ে দাও—সারাক্ষণ বেয়েও হাতে সাড় হবে না। গাঙ-খালের খুশিখেয়াল ও অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে।

পরম উল্লাসে কেতুচরণ কাড়ালে বসে বৈঠা ধরল। আর ঘাটে নেমে দাঁড়িয়ে ঋষিবর হাঁক পাড়ছে—

শামুকপোতা—বয়রা—খলষেমারি—এসো, চলে এসো চড়ন্দার—লা ছাড়ে-এ-এ—

মেলায় আগন্তুক মেয়েপুরুষে বোঝাই হয়ে যায় ডিঙি। এ বড় ভাল হয়েছে, লোকের ভারি সুবিধা! দু-আনা তিন আনায় মৌভোগের মেলায় যাতায়াত চলবে, পুরো একখানা নৌকা ভাড়া করতে হবে না।

দিনমানে মেলার মানুষ আসা-যাওয়া করে। প্রহরখানেক রাত্রি হতে না হতে মানুষজন পৌঁছে দিয়ে ডিঙি ফিরে আসে, সকল কাজকর্ম সারা হয়ে যায়। তারপর এন্তার ছুটি। বাদা অঞ্চলে লোকজন রাত্রিবেলা সহজে নদীখালে বেরোয় না। অসংখ্য রকম বিপদের আশঙ্কা। ডিঙির আলো নিভিয়ে দিয়ে কেতুচরণ ঐ সময়ে চুপিসারে বেরোয় সারাদিনের খাটনির পর অবসর সময়ে কিছু উপরি রোজগারের ব্যবস্থায়। হাটখোলায় অনেক চালা বাঁধা হচ্ছে—তার জন্য গরানকাঠ, বেত ও গোলপাতার প্রয়োজন। কেতুরা কিছু কিছু সরবরাহ করবে। একেবারে বিনা পুঁজির কারবার—তাদের মতো এত সস্তায় কে মাল দিতে পারবে ?

কোন পথে কি ভাবে বনকরের লোকের চোখ এড়িয়ে যাতায়াত করতে হয়, সমস্ত কেতুচরণের জানা। এত বছর কাঠুরে নৌকায় কাটিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া সাঁইতলা মোড়লবাড়িতে ছিল—তাদের কাজকর্মের কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছে। অনেক দেখে শুনে ঘাত-ঘোত বুঝে বাদায় ঢুকতে হয়। বিপদের অবধি নেই—জলের বিপদ, ডাঙার বিপদ। গার্ডদের

নজর এড়িয়ে কখনো পাশখালি দিয়ে যেতে হয়; খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে বোঠে তুলে চুপচাপ থাকতে হয় কখনো। গোলবন বা বলা-ঝোপের মধ্যেও ডিঙি ঢুকিয়ে দিতে হয় বেকায়দা বুঝলে। পাঁকালমাছের মতো কেতুচরণ কতবার ছিটকে বেরিয়ে এসেছে জলপুলিশের কবল থেকে। এমনও ঘটেছে, প্রহর ধরে বেয়ে বেয়ে তারপর বিপদ বুঝে অকস্মাৎ ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে পালিয়ে এসেছে। এর উপর আর ঝড়-বাতাস, চোরাদহ এবং মোহানার কাছে উল্টোপাল্টা ঢেউ ও জলের টান। একটু অসাবধান হলেই নৌকা তলিয়ে গিয়ে কুমিরের মুখে যাওয়া নিশ্চিত। ডাঙায় সাপ-বাঘ-দাঁতাল—কোনখানে ওত পেতে আছে, এক হাত তফাতে থেকেও বুঝবার জো নেই! এ একরকম রাতবিরেতে যমদূতের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়ানো। তার চেয়ে বাপু নৌকার মাপ অনুযায়ী সরকারি পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে একখানা পাশ করে নিয়ে বাদায় ঢোক, শব্দ-সাড়া করে কুড়ুল মারো গাছে, বেলাবেলি ফিরে এসো কিম্বা ভাল জায়গা দেখে চাপান দেও, আগে পাছে পাঁচ-সাতখানা নৌকার বহর সাজিয়ে যাতায়াত করো—বিপদের ভয় থাকবে না। কিন্তু কেতুচরণ বুঝবে না কিছুতেই। আর দশটা বাওয়ালির মতো আফিসের ঘাটে নৌকা বেঁধে নৌকার মাপ দিতে ওদের যেন মাথা কাটা যায়। সারাদিনের খাটনির পর যে সময়টা হাত-পা মেলে জিরোবার কথা, বাদায় ঢুকে সেই সময় এই চৌর্য-বৃত্তি। সকল রকম শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে বনের মধ্যে দুঃসাহসিক বিচরণ—টাকার অঙ্কে লাভের চেয়ে এইটাই পরম লাভ বোধ হয় মনে করে এরা।

ডাঙার শত্রু, জলের শত্রু—এরা তবু যা হোক একরকম—চোখে

দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিরোধেরও নানা পন্থা আছে। যাঁরা অন্তরীক্ষে দৃষ্টির অগোচরে থেকে শত্রুতা সাধেন, ভয়ের বস্তু তাঁরা অনেক বেশি। বাদাবনের আদিকাল থেকে কত যে অপঘাত হয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এখনও ফি বছর বিশ-পঞ্চাশটা ভাল হয় (বাদা সম্পর্কে 'মৃত্যুর' উল্লেখ করতে নেই—ভাল হয়েছে, এই কথা বোলো), অনেকেরই তাদের মধ্যে গতি হয় না—কে যাচ্ছে বলো কাঠুরে-মাঝিমাল্লার জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে, কার দরদ উথলে উঠছে ? লোকালয়-সীমার বাইরে আরণ্য রাজ্যে তাঁরাই সব স্বচ্ছন্দ-বিহার করেন। নানা প্রকৃতির লোক ছিল তো জীবিতকালে—বিদেহী অবস্থায় কার কি ধরনের গতিবিধি, কে কোন মূর্তিতে উদয় হবেন, আগে থাকতে বলবার জো নেই।

রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার ভয়ানক—কিন্তু তার গ্রাস থেকে বেঁচে আসবার কায়দা গুণীনেরা জানে। বাঘবন্ধন পড়ে নৌকা চাপান দেও—বাঘের বাপের সাধ্য নেই সে নৌকা স্পর্শ করবার। এক রকম আছে খিলমন্ত্র ; বাঘের দাঁতে দাঁতে খিল এঁটে যায় মন্ত্রের গুণে, হাঁ করে কামড়াবার শক্তি থাকে না। খিল খুলে না দেওয়া পর্যন্ত খেতেই পারবে না কোন-কিছু—না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। কিন্তু অকারণে জীবের কষ্ট দেওয়া গুণীনদের বিধি নয়, গুরুর নিষেধ—মন্ত্র অসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এতে। বিপত্তারণের জন্যই মন্ত্র, অন্যকে বিপদে ফেলবার জন্য নয়। তাই বিপদ অপগত হবার সঙ্গে সঙ্গে খিল খুলে দেয় গুণীনরা। শুধু মন্ত্রতন্ত্র নয়, গাছ-গাছড়াও জানা আছে নানা রকম ! বাঘের ঘায়ের বীভৎস মলমের কথা জানে তো সকলেই—তা ছাড়া

একরকম শিকড় আছে, বেটে লাগালে সপ্তাহের মধ্যে কামড়ের চিহ্ন পর্যন্ত বেমালুম হয়ে যাবে।

বিষধর সাপই বা কত! দুধরাজ-বঙ্করাজ, শঙ্কাবতী-শাখমুটি, কালনাগিনী-উদয়কাল—নগরবাসী, নাম শুনেছ এসবের? কালনাগিনীর নিকষকালো গায়ে রাঙা রাঙা ফুল আঁকা। একবার এক বঙ্করাজের মুখোমুখি পড়েছিল কেতুচরণ। সাপ ক্রুদ্ধ হয়ে ফোঁস-ফোঁস করে আক্রমণ করতে ছোটে, সারাদেহ ভাঁজে ভাঁজে ভেঙে গিয়ে কি অপরূপ শোভা হয়েছিল সেইসময়! দশনাগ্রে সুনিশ্চিত মৃত্যু—কিন্তু মরেও সুখ আছে এমন সাপের ছোবলে। দেখ, ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে উদয়কালের! যেন বহুরূপীর সাদা পোশাকে এই নারদ-মুনি হয়ে এলেন, তারপর এই দেখ—টুকটুকে শাড়ি পরে রাজনন্দিনী। আবার ওঝারাও তেমনি! মরা মানুষে প্রাণ দিতে পারে। নীলবর্ণ হয়ে গেছে, গাঙে ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছে—কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়ে জল-জাঙাল ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসে ওরা বিষহরির দোহাই পাড়ে—রাখো রাখো মা, প্রাণ নিও না। বিষ নামতে দেরি হলে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করে—কানে আঙুল দিতে হয় মন্ত্রের বচন শুনে! ঝাঁটার বাড়ি মারে—রোগীর গায়ে যদিচ, কিন্তু রোগীকে নয়—সেই অলক্ষ্য আততায়ীকে, শয়তানি করে যে বিষ নামাতে দিচ্ছে না।

সাপের মাথায় মণি থাকে, আবার শিংও থাকে—শুনেছ কখনো? আমার নয়—দুকড়ির গল্প। দুকড়ি হল ওস্তাদ মাঝি—কেতুর শিক্ষাদীক্ষা তারই কাছে, কাঠুরে নৌকায় কেতু তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াত। বুড়ো বয়স অবধি বাদায় বাদায় ঘুরে দুকড়ি বিস্তর আজব জিনিস স্বচক্ষে দেখেছে, মৌজ করে হুঁকো টানতে টানতে

সেই সমস্ত গল্প করে। কোন্ ধোন্দল-তলায় বিশাল এক হরিণবোড়া পড়ে আছে, তার মাথায় মনোরম একজোড়া শিং। বিশ্বাস করলে? গাঁজায় দম দিয়ে বলছে না ডুকড়ি, সত্যি সে দেখেছে। যে দিব্যি করতে বলো তাই সে করবে।

তারপর উচ্চ হাসি হেসে ডুকড়ি রহস্যোদ্ভেদ করে। আস্ত এক হরিণ গিলে ফেলেছিল সাপে—সর্বদেহ পেটের মধ্যে, শিং শুধু বাইরে। শিং গিলতে পারে নি। তাই দেখাচ্ছিল, সাপের যেন শিং বেরিয়েছে। নিশ্চল নিশ্চুপ মেজাজি জীব ওরা—আমাদের মধুবাবুর বাপ স্থূল-বপু স্বর্গীয় চৌধুরী-কর্তা ছিলেন যেমনটি। নড়াচড়া ভাল লাগে না—শক্তিরও অভাব। গতিক দেখে বুঝবার জো নেই যে, জীবন্ত প্রাণী অথবা গাছের গুঁড়ি। অসন্দিগ্ধ হরিণ চরতে চরতে যেমন মুখের কাছে আসে, গাছের গুঁড়ি অমনি টপাস করে মুখে পুরে ফেলে। হরিণ যখন গেলে, মানুষও যে পারে না—এমন নয়। এটা কিন্তু শোনা যায় না। মানুষ জঙ্গলে ওঠে কুড়াল বা বন্দুক হাতে নিয়ে—মানুষ হজম হলেও হাতিয়ার বেকায়দা ঘটাবে, এই ভয়ে মানুষকে রেহাই দেয় সম্ভবত।

ঝড়ে ও বানে পড়ে-যাওয়া গাছের গুঁড়ি জঙ্গলে বিস্তর। এর মধ্যে কোথায় অতিকায় ময়াল রয়েছে—গুঁড়ি বলে মানুষেরও ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। একবার নাকি হয়েছিল এমনি। বাদাবনে এটা বহুপ্রচলিত গল্প। ক-জনে তামাক খাচ্ছিল গুঁড়ির উপর বসে, এক কুচি আগুন কেমন করে পড়েছিল—একটু পরে মড়ি-পোড়ার গন্ধ বেরুল, আর গুঁড়ি মোচড় দিয়ে উঠল। বাপরে—বলে মানুষগুলো তখন দে ছুট।

বাবা দক্ষিণরায়ের গতিবিধি অনেকটা জানা আছে, মা মনসাকে

নিয়েই সামাল সামাল! কটা চোখ আছে তোমার—কত দিকে তাকাবে? ডালে লেজ গুটিয়ে মাথা ঝুলিয়ে বাতাসে কোথায় দোল খাচ্ছেন—নাগালের মধ্যে পেলেই টুক করে অতি-সংক্ষেপে আদর করে বসবেন। একেবারে মোক্ষম জায়গায় চুম্বন—তাগা বেঁধে যে ওঝাবদ্যি ডাকবে, তার ফুরসত পাবে না। নিচে শুলো, জলকাদা, হরেকরকম কাঁটাঝোপ—ছুটো মাত্র চোখ সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে সকল দিক ঘোরাতে ঘোরাতে বনের মধ্যে এগুতে হয়।

১৮

মর্জাল স্টেশন। বাদাবনের উত্তর-দ্বার। বনবিবিতলার পর বাওয়ালিরা দ্বিতীয় বার নৌকা বাঁধে এই আফিসের নিচে। মাপ নেয় এখানে, লোকগুনতি হয়, সরকারি হার অনুযায়ী টাকা-পয়সা নিয়ে নৌকা ও বন্দুকের পাশ করে দেয়। এই সমস্ত এবং বাবু-চৌকিদার প্রভৃতির প্রণামী-পার্বণী চুকিয়ে ঢুকে পড়ো বাদার ভিতর, আর কোন বাধা নেই। নিঃশঙ্কে সুঁদুর-পশুর গেঁয়োগরানে কোপ মারো, গুলি করো কাঠশিঙেল তাক করে। একটু খালি গোলমাল রইল পিটেলবাবু অর্থাৎ পেট্রোল-পুলিশ নিয়ে। তাদের সঙ্গে পূর্বাহ্ণে পাকা বন্দোবস্ত সম্ভব নয়—কে কখন শনিচরের মতো উদয় হবেন, ঠিকঠিকানা নেই কিছু। তবে টং করে টাকা বাজলে কাঠের পুতুল হাঁ করে ওঠে—এরা তবু মানুষ। দেখা হলে 'আজ্ঞে' 'হুজুর' বলে সম্বর্ধনা জানিয়ে টাকাটা সিকেটা এবং মধু, হরিণের

মাংস ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়ে ভাব জমিয়ে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। আইনসম্মত সাচ্চা কাজ করছি, কে আমার কি করবে—এরকম সাহস ও আত্মম্ভরিতা বিপজ্জনক। নিরীহ নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়েছিল, এটা খেয়াল থাকে যেন। বনবিবির বরঞ্চ পুরুত-পাণ্ডা নেই, পুজো না পেলে কেউ তেড়ে ধরতে আসে না। কিন্তু বনকরের লোক অহরহ বাদায় ঘুরছে—জবরদস্তি করে পুজো আদায় করে এরা। এ পুজোর ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ। মাপের হেরফেরে বড় নৌকা ছোট হচ্ছে, আবার ছোট নৌকা বড় হয়ে যাচ্ছে দেবতাদের সন্তোষ বা রোষের অনুপাতে।

কিন্তু কেতুচরণদের ধরন আলাদা। দুই রীতি তাদের—কখনো সাপ, কখনো বাঘ। সাপের মতো ঝোপঝাড়ের অন্তরালে অসংখ্য খাল-খাঁড়ি ঘুরে তার ডিঙি বনকরের লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে বাদায় ঢোকে। পিটেল-পুলিশের সাড়া পেলে ডিঙির মাথা বলা-বনের ভিতর ঢুকিয়ে চুপচাপ থাকে প্রায় নিরুদ্ধশ্বাস হয়ে। এমনি অবস্থায় সত্যি সত্যি একবার সাপের মুখে পড়ে গিয়েছিল সে—বিষধর এক কালাজ সাপ। সাপটা আস্তে আস্তে সরে গেল—কিন্তু সরে না গিয়ে কামড়াতও যদি, কিছুতে সে টুঁ-শব্দ করত না শত্রুকবলিত হওয়ার আশঙ্কায়।

আবার অমাবস্যা-পূর্ণিমায় গাঙের জল বেড়ে ঢেউ উত্তাল হয়, মর্জালের করাল স্রোতে কুটাগাছটি ফেললে ভেঙে দু-খান হয়ে যায়। কেতুচরণ তখন বাঘ। বাঘের মতো বিক্রম তার—প্রয়োজন হলে দিনের আলোতেও বড় গাঙে বনকর-স্টেশনের সামনে দিয়ে ডিঙি নিয়ে আসে। নিঃসাড়ে চলে যাওয়ায় সুখ হয় না, চেঁচিয়ে

ওঠে স্টেশনের ঠিক সামনাসামনি হয়ে। একদিন তো গুড়ুম করে দেওড়ই করল সেই চোরাই বন্দুকে। ধরবি তো ধর, কলা দেখিয়ে এই চলে যাচ্ছি—মনোভাব এইরকম। আওয়াজ করেই দ্রুত বোঠে বেয়ে স্রোত যেখানটায় সব চেয়ে তীব্র, তার উপর ডিঙি নিয়ে ফেলল। চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক দেওয়ার মতো। ঋষিবর বা গোল-পাঁচু প্রায়ই সঙ্গে যায়। তারা হিসাবি লোক—যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করে, কি দরকার সরকারি মানুষদের এমন খোঁচা মেরে ক্ষেপিয়ে তোলবার? কেতুচরণ হা-হা করে হাসে। সে কল্পনার চোখে দেখে, বন্দুকের শব্দে স্টেশনে হৈ-হৈ লেগেছে, সাজ-সাজ পড়ে গেছে অপরাধী ধরবার জন্য। ততক্ষণে কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে গেছে কেতুচরণের ডিঙি! কে ধরবে তাদের?

এক রাত্রে যাচ্ছে অমনি। কেতুচরণ দৃঢ় হাতে বোঠে ধরে আছে তীব্র স্রোতে ডিঙির মুখ যাতে ঘুরে না যায়। বাইছে না, বোঠে বাইবার প্রয়োজন নেই এত বড় টানের মুখে। ডিঙি এমনিতেই ছুটেছে।

মর্জাল স্টেশনের ঠিক বিপরীত কূল ধরে যাচ্ছিল। কোটালের খরস্রোতে তীরের বেগে ডিঙি ছুটেছে—কিসের পরোয়া? এমনি সময় তাজ্জব দেখল। চোখ রগড়াল একবার। না, ভুল নয়—ঠিকই দেখছে। সরকারি মানুষ কেউ নয়—ধবধবে কাপড়-পরা বউ একটি। ছকড়ি মাঝি গল্পে যেমন বলে থাকে, অবিকল তাই।

এপারে-ওপারে নিঃসীম অরণ্যভূমি ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন—জলের কুমির ডাঙার বাঘ অবধি ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনি মনে হয়।

স্টেশনে টিমটিমে এক কেরোসিনের আলো—সদাসতর্ক সরকারি চোখের প্রতীক। ঐ লণ্ঠনটি মাত্র জাগ্রত রেখে স্টেশনের লোকজন অকাতরে ঘুমোচ্ছে—কতক ডাঙার উপর ঘরের মধ্যে, কতক বা স্টেশনের ঘাটে বোটের পাটাতনে। চাঁদ ডুবু-ডুবু। ক্ষীণ জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে—চরের উপর মাচা তৈরি করে স্টেশনের যে উঠান হয়েছে, তার উপর। জ্যোৎস্নার আলোয় সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। সত্যি মেয়েমানুষ হওয়া সম্ভব নয়—মেয়েমানুষ কি করতে আসবে বাদারাজ্যের বনকর-আফিসে? দৈবাৎ এসে পড়লেও এমনি সময়ে তো ডবল খিল এঁটে ঘরের মধ্যে ঘুমোবার কথা। গরম বাদা—সেবার ঐ স্টেশনের উপরই এক ভোঁদড় (বাদার এলাকার মধ্যে বাঘের নাম উচ্চারণ কোরো না কেউ, খবরদার!) এসে পড়ে একজনকে মুখে করে নিয়ে গেল। আর জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে ঢের বেশি প্রতাপ যাঁদের—তাঁরাও পরিব্রজন করেন এমনি সময়ে। ডুকড়ির গল্প বানানো নয়—সর্বনাশীই বিমুগ্ধ চোখে অস্তায়মান চাঁদ, কোটালের জলোচ্ছ্বাস কিম্বা জোনাকির সমারোহ দেখছে রাত্রির মধ্যযামে চুপি-চুপি ফরেস্ট-আফিসের নিষুপ্ত প্রাঙ্গণে এসে।

১৯

ও ভাই, ও পাঁচু!

সাড়া নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। ঘুম যেন সাধা থাকে এদের—চোখ বুজবার সুবিধা পেলেই হল। নৌকার গুরোর

উপরে বসে আছে তলিতে জলের মধ্যে পা রেখে। একটু পিঠ-ঠেশান দেবে, সে জো নেই। ঐ রকম বসে থেকেই ঘুমুচ্ছে। দাঁড়িয়েও এরা ঘুমুতে পারে। হাঁটতে হাঁটতেও পারে বোধ হয়।

কেতুচরণ ভ্রূকুটি করে। রাগের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু গালিগালাজের সময় নয় এটা। আর লাভই বা কি পাঁচুকে ডেকে তুলে? তাড়াতাড়ি এখন সরে পড়ার দরকার।

বড় দীর্ঘ বাঁক। অনেকদূর এগিয়ে এসে কেতুচরণ পিছনে তাকিয়ে একবার দেখে। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তি—নিশ্চল, কুমোরের হাতে-গড়া এক প্রতিমা যেন।

বাঁকের অন্তরালবর্তী হয়ে অবশেষে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে। হাঁক দিয়ে উঠল, ওরে পাঁচু—

পরনের কাপড়ের অর্ধেকটা এবং তদুপরি গামছা গায়ে জড়িয়ে প্রায় গোলাকার হয়ে অঘোর ঘুম ঘুমুচ্ছে। ডাকাডাকিতে গোল-পাঁচু সেই অবস্থায় একটুখানি দুলে উঠল মাত্র। ধৈর্য হারিয়ে কেতুচরণ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, ওরে পেঁচো হারামজাদা!

অ্যাঁ—

সে চোখ খুলল এবার।

বড্ড তো বাদাবনে চরে বেড়াবার শখ। নজর পড়ে নি তাই বাঁচোয়া—নইলে উঠে বসে আর 'অ্যাঁ'—করতে হত না।

বিষম উদ্বেগে গোল-পাঁচু খাড়া হয়ে বসে। হয়েছে কি?

এর পরে আমি একা-একা আসব। দায়ে-বেদায়ে যদি সাড়া না পাওয়া যায়, কি হবে এক কাঠের কুঁদো নৌকায় বয়ে বেড়িয়ে?

লজ্জিত গোল-পাঁচু বলে, ঘাট মানছি রে ভাই, নাক-কান মলছি। খালি গালমন্দ করবি—বলবি নে কি হয়েছে?

ঘটনা বলল কেতুচরণ। বিরক্ত মুখে বলল, যাত্রাটা আজ ভাল নয়।

গোল-পাঁচু একরকম উড়িয়ে দেবার ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, কি দেখতে কি দেখেছিস। মেয়েলোক আসবে কোত্থেকে? বাদাবনে মেয়েছেলে? এই যা কেবল মেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে রায়বাবুর বন্দোবস্তে।

কেতুচরণ বলে, বোঝ তাহলে। সত্যিকার মেয়েলোক নয়—এসেছেন সর্বনাশী ঠাকরুন। আজকালকার মানুষ সব ভয়তরাসে—রাত-বিরেতে দূর-দূরস্তর যায় না। কাচিপাতার মুখ ছেড়ে ঠাকরুন তাই মানসেলার ধারে ধারে ধাওয়া করেছেন। দেখাবো বলেই তো ডাকছিলাম। তা যেন মরে ঘুমুতে লাগলে তুমি।

কৈফিয়তের ভাবে গোল-পাঁচু বলে, জুতমতো একটু বসেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন ঘুম এসে গেল। কাল-পরশু দুটো রাত্তির দু-চোখ মোটে এক করতে পারি নি।

কেতুচরণ বলে, বাসায় ছিলে—কোথাও বেরোও নি তো?

মর্জাল স্টেশনের পর দু-তিনটা বাঁক অতিক্রম করে জঙ্গলে এসে পড়েছে। আবাদের চেয়ে বাদাবনে এসে কেতুচরণ বেশি আরাম পায়। রাতও শেষ হয়ে এল—পাখি ডাকছে। আতঙ্ক গিয়ে কথাবার্তা সহজ হয়েছে এতক্ষণে। বক্র হাসি হেসে কেতুচরণ বলে, বাসায় ছিলি না কি বল? মধুবাবু পাড়া বসিয়েছে, সেইখানে চক্কোর দিয়ে বেড়িয়েছিস বুঝি?

গোল-পাঁচুও হাসে।

দূর! সেই যে কবির দলে গেয়েছিল না—'উনুনমুখীর খোঁপার ছাঁদে হেঁসেলঘরে বেড়াল কাঁদে—' এ-ও হল সেই বিত্তান্ত। ঝিকালে

দেখবে দাওয়ায় বসে খোঁপা বাঁধছে মাগীরা—বাঁধছে তো বাঁধছেই। বেড়ালও কাঁদে সারা রাত্তির ধরে···সত্যি দাদা, বড্ড জ্বালাতন করছে হুলোবেড়াল একটা। রাত দুপুরে কানাচে এসে গজরায়। ঘুম ভেঙে যায়—তারপরে আর কিছুতে ঘুম হয় না। আজ ক রাত্তির বিষম বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে।

কেতুচরণ বলে, ধরে বস্তায় পুরে আনলে নে কেন? বাদাবনে ফেলে দিয়ে যেতাম, আর উৎপাত করত না।

বস্তায় পুরব কি করে?

কিছু খাবার-টাবার দিতে হয়। খেতে লাগবে আর অমনি ধরে ফেলবে। আচ্ছা, আবার যখন করবে, নৌকো থেকে আমায় ডেকে নিয়ে যেও। ঠিক ধরে দেবো।

২০

দুকড়ি মাঝিকে তোমরা দেখ নি। বুড়ো অথর্ব—হাঁপানি রোগ আছে, দাওয়ায় বেড়া ঠেশ দিয়ে পড়ে পড়ে হাঁপায়। মানুষ পেলে এবং হাঁপানির প্রকোপ কিছু কম থাকলে গল্প করে। করছে তো করছেই—গল্পের আর অন্ত নেই। শ্রোতার কাজকর্ম ভণ্ডুল হয়ে যায়, অথচ হাত এড়াবার জো নেই। জোঁকের মতো—লোক পেলে সহজে ছেড়ে দেবে না।

কেতুচরণের হাতে-খড়ি—উঁহু হাতে-বোঠে এই দুকড়ির কাছে। বয়সকালে প্রতি বছর শীতকালে দুকড়ি বাদায় যেত বড় পলোয়ার নৌকা নিয়ে। একবার এমনি গিয়েছে। রাত্রিবেলা নোঙর করে

তারা শুয়ে আছে। পালা করে পাহারা দেবার বিধি। কিন্তু সেদিন সকলের কি কাল ঘুম পেয়ে গেল—যে লোকের জেগে থাকবার কথা, ঢুলতে ঢুলতে সে-ও এক সময় গড়িয়ে পড়েছে। ধোঁয়ায় কালিতে আচ্ছন্ন লণ্ঠনটা শুধু মিটমিট করছে একদিকে। ভাঁটা সরে গেছে—মরা গোন, জল সরে গিয়ে গাঙের প্রায় মাঝখানেই ডাঙা দেখা দিয়েছে।

ছকড়ি কাড়ালে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ উষ্ণ নিশ্বাস মুখের উপর। ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারে নি, কোথায় সে আছে। তারপর চোখ মেলে সে স্তম্ভিত। নৌকার পাশে বাঘ—তার গায়ের -উপর বললে হয়। চোখ দুটো চকচক করছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন বলো দিকি? বাঘবন্ধন পড়ে চাপান সারা আছে। ছকড়ির পাশেই কেষ্ট কত্থ। ঘুম ভেঙেছে তারও। সে ভুল করল। বাঘ দেখে 'বাবারে—'বলে ছঁইয়ের খোলে পালাতে যায়। বাঘ অমনি টপ করে তাকে মুখে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। ছকড়ি কাছে, একেবারে মুখের উপরে—কিন্তু তাকে টপকে কেষ্টকে ধরে নিয়ে গেল।

চেঁচাল কেন কেষ্ট কত্থ? মন্ত্রে বিশ্বাস না থাকলে কখনো কাজ হয়? 'নেই' বললে সাপের বিষ অবধি থাকে না। পালাল বলেই তো বোঝা গেল, লোকটা একেবারে আনাড়ি—না জানে কোনরকম গুণজ্ঞান, না আছে মনে বল-ভরসা।

আর কি ধরনের বাঘ—তা-ও বিবেচনা করো। সত্যিকার বাঘ হলে বাঘ-বন্ধন ভেদ করে নৌকা ছোঁয় কি করে? বাঘ সেজে তবে এসেছিলেন কেউ। এমনি আসেন ওঁরা। বাদাবনে যারা

ঘোরাফেরা করে সবাই তো দুকড়ি-কেতুচরণের মতো তুখড় লোক—ফেলনার ধরনের আর কজন! মরে গিয়েও শয়তানি ছাড়েন না তাঁরা।

গল্পের আতঙ্কে কেউ পারতপক্ষে দুকড়ির কাছ ঘেঁসে না। কিন্তু সম্প্রতি তার নসিব ফিরেছে। গল্পের এক ভক্ত জুটেছে—যে সে ব্যক্তি নয়, মধুসূদন রায়। মৌভোগে এসে কাজকর্মের ভিতর ফাঁক পেলেই তিনি দুকড়িকে ডেকে পাঠান। শরীরগতিকের জন্য একদিন সে যেতে পারে নি বলে মধুসূদন নিজেই এসে উঠেছিলেন তার বাড়ি। সে এক বিষম বিপদ। ভাঙা চালের নিচে নড়বড়ে এক বাংলাঘর—তার মধ্যে অত বড় মানুষটাকে কোথায় বসাবে, কি করবে, কিছুই ভেবে পায় না। তারপর থেকে রায়বাবুর ডাক এলে তিলার্ধ সে দেরি করে না, যে অবস্থায় থাকুক বেরিয়ে পড়বে। হাঁপানি রোগী—দশ পা গিয়ে ধপ করে যেখানে হোক বসে পড়ে খুব খানিকটা হাঁপায়। সামলে নিয়ে আবার উঠে পড়ে। এত কষ্টের পথ চলা—তবু সমস্ত পাড়াটা বেড় দিয়ে, ইচ্ছে করে প্রায় দুনো পথ অতিবাহন করে, অবশেষে মধুসূদনের কাছারিবাড়ি গিয়ে ওঠে। বিশ নম্বর সুতোর বুনন ছেঁড়া ময়লা কাচা পরনে, খালি গা—কেবল বিশেষ সজ্জা হিসাবে অতীত সমৃদ্ধির সময়ে কেনা চটি জুতাজোড়া পায়ে পরেছে। পরা বললে ঠিক হয় না—বারো মাস চালের বাতায় গোঁজা থাকার দরুন সে জুতো বেঁকে দুমড়ে নৌকার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—সরষের তেলে ভিজিয়ে এবং রাত্রিবেলা শিশিরে রেখে দিয়েও জুতসই করা যায় নি। কোন গতিকে পায়ের কটা আঙুল মাত্র ঢোকে। তাই পায়ে দিয়ে ফটফট আওয়াজ তুলে দুকড়ি পাড়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ

সর্বজনে তাকিয়ে দেখুক, সে বিশিষ্ট স্থানের নিমন্ত্রণে চলেছে। এবং বুঝুক, শরীর অশক্ত হয়ে পড়লেও তাকে খাতির করবার মানুষ আছে এখনো।

তা খাতির আছে বটে মধুসূদনের কাছে। মাটির পাঁচিলে ঘেরা কাছারি-বাড়ি। তারই লাগোয়া অসমতল প্রশস্ত উঠানে জলচৌকির উপর মধুসূদন বসে গড়গড়া টানছেন। আর হাত-পা নেড়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে দুকড়ি গল্প জমিয়েছে মাটিতে উবু হয়ে বসে।

জঙ্গলের ভিতর মানুষ নেই—কে বলেছে? অবশ্য সে এক ধরনের ভয়াবহ মানুষ—আমাদের সঙ্গে রীত-প্রকৃতি কিছুই মেলে না। একটা খাল আছে পুবে—অনেক পুবে। ঠিক কোন জায়গায় দুকড়িও সঠিক বাতলাতে পারবে না। অত দূর-অঞ্চলে নৌকা কদাচিৎ যায়। দুকড়ি একবার গিয়ে পড়েছিল তার স্বভাবটা নিতান্ত বিদঘুটে ভবঘুরে গোছের বলেই। কেউ যদি নিয়ে যায়, নির্ঘাৎ সে চিনিয়ে দিতে পারবে খালটা। মিথ্যে প্রমাণ হয় তো যে শাস্তি হুকুম হবে, তাই সে মাথা পেতে নিতে রাজি আছে।

বলতে বলতে নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ দুকড়ি চুপ করে যায়। বয়স ও রোগে দেহ জখম করে ফেলেছে। যে হাতে হাল বেয়ে সাগর-মোহানায় বড় বড় ঢেউয়ের মাথার উপর দিয়ে নৌকা নিয়ে অবহেলায় খেলা করে বেড়িয়েছে, সে হাত এখন এমনিতেই থরথর কাঁপে, একখানা লাঠি মুঠো করে ধরবার মুরোদটুকুও নেই—এমন কে আছে, ঠাকুর-স্থাপনার মতো তাকে নৌকার উপর বসিয়ে সেই দূর দুর্গম বনের মধ্যে নিয়ে যাবে?

মধুসূদন গড়গড়া থেকে কলকে নামিয়ে দিলেন। দু-হাতের চেটো একত্র করে তার মধ্যে কলকে বসিয়ে দুকড়ি গোটা দুই-তিন

টান দিয়েছে—সে কি কাশির দমক! কাশি আর থামে না। সারা দেহ আকুঞ্চিত হচ্ছে। রক্তাক্ত চোখ দুটো কোটর থেকে ছিটকে পড়ে বুঝি বা! তবু কলকে এঁটে ধরে আছে এই অবস্থায়।

মধুসূদন কলকে কেড়ে নিলেন।

দিয়ে দে। মারা পড়বি যে দম আটকে! আর কক্ষনো টানতে যাবি নে।

দুকড়ি হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। রোগ আরাম হবে না বাবু মশায়? কি বলেন? পাঁচুকালীর তাগা পরে অনেকরই তো সেরে যাচ্ছে। তাগার জন্য মোহান্তবাবার কাছে যাবো—তা সেখানে পুজোর খরচই সকলের আগে সাত সিকি। তার উপর যাতায়াতের নৌকো-ভাড়া আছে। মবলক টাকার ব্যাপার—কোত্থেকে জুটোই বলুন। হাঁপটা সেরে গেলে আমি বাবু নিজে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতাম। বাদার নাম করে সবাই তো কপচে বেড়ায়—আসল বাদায় গেছে কজনে? ছিটে-জঙ্গলে দু-একবার পাক দিয়ে এসে মানসেলার মধ্যে জাঁক করে বেড়ায়।

মধুসূদন হেসে আশ্বাস দেন, সেরে যাবে রোগ—আমি বলছি, নিশ্চয় সারবে। সারাতেই হবে। সাগর অবধি যত বাদা আছে, সব আমি চোখে দেখতে চাই। তুমি সঙ্গে থেকে চিনিয়ে দেবে দুকড়ি—তুমি না থাকলে তো হবে না!

দুকড়ি ভাবে হাঁপানি তার সত্যিই সেরে যাবে। ফিরে পাবে আগেকার মতো গায়ের শক্তি ও দুরন্ত যৌবন। তার অবস্থা হয়েছে—যে লোক স্বজনদের কাছ থেকে সুদূরবর্তী হয়ে আছে, তারই মতো। রোগমুক্তির পর অরণ্যচারী আবার স্বস্থানে ঘুরে ফিরে বেড়াবে, পঙ্গু হয়ে এই রকম জনালয়ে পড়ে থাকবে না।

শুনুন বাবুমশায়, পুবে এক খাল আছে—বাগদা গাঙ থেকে বেরিয়েছে। কেউ যায় না সেদিকে, সরকারি মানুষদেরও পা পড়ে নি। আমি দৈবাৎ ঢুকে পড়েছিলাম সেই খালে। দুপুরবেলা—কিন্তু হলে কি হবে, রাত দুপুরের অবস্থা হয়ে উঠেছে···

শান্ত আকাশে তারা ঝিলমিল করছে। সেইদিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে দুকড়ি বহুকাল আগেকার এক দুর্যোগ দিনের ছবি মনে আনছে। পুঞ্জিত মেঘ চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাস বন্ধ, অসহ্য গুমোট। জলের রং কালি-গোলার মতো। স্থল-জল-আকাশের এ মূর্তি দুকড়ি খুব চেনে—বড় গাঙে থাকা অতঃপর কোনক্রমে উচিত নয়। খালের মধ্যেও একেবারে নিরাপদ নয়—গাছপালা ভেঙে পড়ে সবসুদ্ধ সলিল-সমাধি ঘটিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু উপায় কি—ঘরের মতো নিশ্চিন্ত আশ্রয় কোথায় মিলবে বনের ভিতর? কোন এক পাশখালি বা খাঁড়ির মধ্যে নৌকার মাথা ঢুকিয়ে ঝড়-বাতাস না থামা পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করবে, এই মতলবে সে খালে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা দূর গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় দেখল—খাল বা খাঁড়ি নয়—মহাব্যস্ত কতকগুলো মানুষ। কালো-কালো চেহারা, লম্বায় আমাদের দুনো তে-দুনো হবে। মানুষ বলা উচিত নয়, মানুষ তারা নয়ও—পাথর কুঁদে কে বুঝি জীবন্ত দানব বানিয়েছে। খাল-ধারে কিসের প্রয়োজনে আনাগোনা করছে, কি করছে—জঙ্গলের আড়ালে থাকায় ঠাহর করা যাচ্ছে না। আসন্ন ঝড়ের মুখে এরা একদল নৌকা নিয়ে এসেছে—তা চোখ তুলে কেউ তাকাল না। টেরই পায় নি, এই রকম ভাব।

নৌকায় আর যারা আছে, সাহায্য চেয়ে হাঁকডাক করতে যাচ্ছিল। বহুদর্শী ছুকড়ি বুঝতে পেরেছে—হাত তুলে তাদের নিষেধ করল। যেমন করছে ওরা করুকগে, ঘাটা দিয়ে কাজ নেই।

আকাশের ঘনঘটায় খুব ভয় হয়েছিল, কিন্তু সামান্য একটু বাতাস হয়ে মেঘ উড়ে গেল। আকাশ পরিষ্কার। ছুকড়ি এগুচ্ছে তবু খাল দিয়ে। জোয়ারবেগে তরতর করে জল ঢুকছে—নৌকা আপনি ছুটেছে, বাইতে হচ্ছে না। খালপথে, দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ওঠা যায়! মনে হচ্ছে, খুব এক সংক্ষিপ্ত পথে আগুন-জ্বালায় পৌঁছনো যাবে। আগুন-জ্বালার নতুন পথের আন্দাজ পেয়ে ছুকড়ি মেতে গিয়েছে।

কিন্তু ঝড় নেই, বাদলা নেই—ব্যাপারটা কি বলো তো? গাছপালা নুইয়ে এনে জলের উপর ধরছে, পথ আটকাচ্ছে। পিছন ফিরবার জো নেই—সেদিকেও ঠিক ঐ অবস্থা। ডাল ঠেসে ধরছে নৌকার উপরে। ছুকড়ি অবস্থা বুঝেছে। ভয় পেয়ে নৌকা থামালে ঐখানেই দফা শেষ করবে। অবিরত বাইছে প্রাণপণ শক্তিতে, আর দমাদম ধ্বজির বাড়ি মারছে ডালপাতায়।

খাল শেষ হলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। সেই সময় এক তাজ্জব জিনিস দেখতে পেল—নরম চরের উপর বড় বড় পদচিহ্ন। ছুকড়ি নেমে গিয়ে মেপে এসেছে, সওয়া হাত, দেড় হাতের কম নয়। পা থেকেই পুরোপুরি মানুষটার আয়তন আন্দাজ করে নাও। শুধু কানেই শুনে থাকো বনবাসী অতি-মানুষদের কথা—ছুকড়ি তাদের চোখে দেখেছে।

আর শুধু এমনি নির্বাক দুশমনের দল নয়, কথাও বলে অনেকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সাগরের কাছাকাছি ঝাঁকে

ঝাঁকে ইলিশ পড়ে। উপরের মাছের মতো তেমন স্বাদ নেই, তবু জাত্যংশে ইলিশ তো! ঢুকড়ির দল সেবারে শিকারে গিয়েছিল। জেলেরা জাল তুলছে—গরানের কষে ভিজানো রাঙা জাল রূপালি ইলিশের প্রাচুর্যে ঝিকমিক করছে। নৌকা বেয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকড়ি বলে, খাবার মাছ দাও—

জেলেরা তাকিয়ে দেখল, সত্যি সত্যি শিকারি নৌকা কিনা। দিয়ে দিল পাঁচ-ছটা মাছ। শিকারিরা মাছ চাইলে বিনা তর্কে দিয়ে দিতে হবে, বাদাবনের এই অলিখিত আইন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাত্রে আজ জবর খাওয়া-দাওয়া হবে। মাছ কোটা-ধোওয়া হতে লাগল। মনের আনন্দে একটু ভাল জায়গা দেখে নৌকা বাঁধল তারা। জেলেরা কাছাকাছি মাছ ধরে বেড়াচ্ছে, শঙ্কার কিছু নেই।

কিন্তু পাড়ের জঙ্গলের মধ্য থেকে অনতিপরে খোনা গলায় বলে ওঠে, মাছ দাও না খানকয়েক—

কে তুই ?

কাঠুরে। ওপারে আর সবাই কাঠ কাটতে গেছে, আমি একলা বসে আছি ওদের জন্যে।

ঢুকড়ি খুব জোরে হাঁক দিয়ে উঠল, আ মরি আমার বাপের ঠাকুর! মাছ খাবি—তা হাত-পা রয়েছে কি করতে ? ধরে খাগে—

তবু সেই করুণ আকুতি, মাছ দাও—

যা-যা-যা—ফাজলামির জায়গা পাস নি ?

ঢুকড়ি বুঝতে পেরেছে। এত চিৎকার করল—কিন্তু ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও উঠছে না। এমন হয়, ওঁরা যখন আবির্ভূত হন শুধু সেই সময়ে। আরও দু-একবার হাঁকডাক করে সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হল।

তখন বলে, আচ্ছা—তাই হবে। কাঁচা-মাছ খাবি কি রে? ভেজে দিচ্ছি—

উনুন টেনে ছুঁইয়ের নিচে নিয়েছে। কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে মাছ ছেড়ে দিতে কলকল করে উঠল। বনভূমি ভরে গেল ভাজা-ইলিশের সুবাসে।

দুকড়ি বলে, হাত পাত—

ভয়ে কাঁটা হয়ে আর সকলে সোয়ারিখোপে ঢুকে পড়েছে, দুকড়ির কাণ্ডকারখানা দেখছে। দুকড়ি দেখল, নদী-জলের উপর আলগোছে কুলোর মতো একজোড়া হাত পাতা। মন্ত্র পড়ে চাপান-দেওয়া নৌকা—স্পর্শ করবার জো নেই, সে জানে।

নে, ধর—

উ-হু-হু, পুড়ে গেল—জ্বলে গেল—

ভয়াল আর্তনাদ দূর থেকে দূরবর্তী হয়ে অবশেষে বনান্তরালে মিলিয়ে গেল। দুকড়ি খলখল করে হাসে। হাসি চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। উচিত শাস্তি পেয়ে পালিয়ে গেছে মৎস্যপ্রত্যাশী। করেছে কি—মাছ দেবার নাম করে এক হাতা গরম তেল ঢেলে দিয়েছে হাতের উপর। সাহস বোঝো। অতি-সাবধানী পুরুষ দুকড়ি—তার মতো বহরদার অঞ্চলের মধ্যে নেই। আট প্রহরের অষ্টবন্ধন সেরে, তাগা ও শিকড়বাকড়ের পোঁটলা নিয়ে তবে সে বাদায় বেড়ায়। সে ভয় করতে যাবে কেন?

শোন, হিতার্থে বলছি, সদুপদেশ কয়েকটা শুনে রাখো। স্রোত কাটান দিতে কূলে কূলে চলেছ—চাঁদাকাঁটার আড়াল থেকে

ফিসফিসিয়ে হয়তো কে কথা বলে উঠবে। আলাপ-পরিচয় করতে চাইবে, শুধাবে ছেড়ে-আসা অনেক দূরের পাড়াপড়সি আত্মীয়জনের কথা। কোন দেশের লোক তুমি গো? যশোরে মণিরামপুরের হাটে গুড় উঠছে এবার কেমন? কোষ্টার দর কি?··· প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে। কোন জবাব দিও না। নৌকা বেয়ে যেমন যাচ্ছিলে চলে যাবে।

বলবে, বেলকাটির জামির দপ্তরির খবর জানো? নৈমদ্দি কবিরাজ বেঁচে আছে না মরেছে? জানা থাকলেও জবাব দিতে যেও না।···অথবা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলতে পারে, রাতে পথের দিশা পাচ্ছি নে, দোহাই তোমাদের, একটুখানি তুলে নাও। বাঘে খেয়েছে মনে করে সঙ্গীসাথীরা নৌকো ভাসিয়ে সরে পড়েছে—এই দেখ, গাছের মাথায় উঠে বসে আছি, সেখান থেকে কথা বলছি, অতি-বড় দিব্যি—নিয়ে যাও নৌকোটা একটু কিনারে লাগিয়ে, নয়তো এবারে সত্যি সত্যি জানোয়ারের পেটে যাবো।

হয়তো সত্যিই বনের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া কোন মানুষ। ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু সে রকম কদাচিৎ ঘটে।···

দরদও দেখান ওঁরা সময়ে অসময়ে। তোমার নৌকা একলা পড়ে গেছে উদ্দাম নদীর মাঝখানে—গা ছমছম করছে—বাঁকের মুখে এসে দেখবে, ভরা-পালে আরও খান পাঁচ-সাত চলেছে। আগে পিছে চলল তারা নিঃশব্দে···যেই কোনো বনকর-অফিস কি জনালয়ের কাছাকাছি এসেছ, চকিতে বহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তোমায় ভরসা দিতে এসেছিল ঐ সব মায়াতরী। বাওনে যাচ্ছ সরু খাঁড়ির মধ্য দিয়ে। কিম্বা গুলোবন ভেঙে চলেছ মৌমাছির ঝাঁক লক্ষ্য করে। দেখবে তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে এক প্রান্তে

গাছগাছালির ভিতর—অথচ দশটা হাত দূরে একেবারে শান্ত। এ সমস্ত কৌতুক ওঁদের—তোমাকে ভয় দেখিয়ে একটুখানি মজা করলেন।

মোটের উপর তোমার কোনদিকে চোখ-কান দেবার গরজ নেই—কিছুই দেখ নি, কিছু শুনতে পাও নি, এইভাবে টেনে বেরিয়ে যাও। জঙ্গলরাজ্যে কেবা কার? সমাজ-সামাজিকতার দায় নেই এখানে। মানুষ এখানে এসেই জন্তু হয়ে যায়। দয়াধর্ম লোকালয়ে ফিরে গিয়ে আবার দেখিও।

২১

আর একবারের বৃত্তান্ত বলি। এত অভিজ্ঞতা ও গুণজ্ঞান সত্ত্বেও সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল তুকড়ি নিজেই। অল্পের জন্য বেঁচে গেল। তাই তো বলি—বাদার কথা কিছু বলবার জো নেই, কার কপালে কখন কি ঘটে। মানুষ সেখানে গেলে আর একরকম হয়ে যায়, মাথা পরিষ্কার রাখা শক্ত।

রাত দুপুর। পাশখালির মুখে নৌকা বেঁধে আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে—তুকড়ি নিজে পাহারায় আছে হুঁকো-কলকে ও আগুনের মালসা নিয়ে। ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে ঘুম তাড়ানোর জন্য…

সেদিন এক ফুটফুটে ভদ্রলোক এসেছেন মৌভোগের কাছারি-বাড়ি। সুকুমার নাম। এসেছিলেন রায়গ্রামে—মধুসূদন সঙ্গে করে এখানে এনেছেন। সুকুমার টিপিটিপি হাসছিলেন তুকড়ির

গল্প শুনে। তারপর ছোট্ট একটু প্রশ্ন করলেন, বড়-তামাক খাচ্ছিলে বুঝি বুড়ো? এমনি সাধারণ তামাকে নজর এত খোলতাই হয় না তো!

ভ্রূকুটি করে দুকড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল সুকুমারের দিক থেকে। নগরবাসী কি বুঝতে পারে বাদার ব্যাপার? এ হল আলাদা এক জগৎ—তোমাদের বাঁধা ছকের জীবন থৈ পাবে না জঙ্গলে ঢুকলে। গল্প যেমন চলছিল, চলতে লাগল—

দা-কাটা তামাক—বিষম তলোক। যা বলছেন নতুন বাবু—বড়-তামাকের কাছাকাছিই বটে। তার দু-একটান টানলে নির্ঘাত তোমরা মাথা ঘুরে পড়বে। সেই বিষ নাকে মুখে এত উদ্গীরণ করছে, দুকড়ির তবু ঝিমুনি আসছে। এক একবার ঢলে পড়ার অবস্থা হয়। সেটা মধু ও মোম-আহরণের মরশুম। সারাদিন মৌমাছির ঝাঁকের পিছনে ছুটোছুটি করে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছে। এখন ঝিরঝিরে জোলো-হাওয়ায় ঘুম ঠেকানো মুশকিল।

হৈ-হৈ শুনল যেন হঠাৎ অনেক দূরে—অনেক লোক বুঝি তেড়ে আসছে। কি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড বেধেছে ওদিকে! ঘুম ছুটে গেল, চোখ রগড়ে সে খাড়া হয়ে বসল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।…না, কোন-কিছু নয়। চাঁদ উঠেছে ধূসর জ্যোৎস্নায় বাদাবন পরিপ্লাবিত করে। তখন হাসি পেল দুকড়ির। দুর্গম জঙ্গলে আক্রমণ করতে আসবে কারা, আর শয়লা-পথে দুটো মানুষই পাশপাশি যেতে পারে না—বড় দল নিয়ে হুল্লোড় করে আসবার পথই বা কোথায়? স্বপ্ন দেখছিল সে নিশ্চয়।

কিন্তু এখন নিঃসন্দেহ পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা—কান্না আসছে যেন কোন দিক থেকে। কে কাঁদে? কান পেতে একাগ্র হয়ে শোনে

দুকড়ি। হরিণ বা আর কোন পশু-প[illegible] ডাক এ নয়। অনতিস্পষ্ট—কিন্তু এ যে কান্নার আওয়াজ, তাতে সন্দেহ নেই। নিশিরাত্রে মহারণ্য গুমরে গুমরে কাঁদছে বুঝি! কিন্তু মানুষের গলা যে! মেয়েমানুষের।

নতুন রকমের কোন-কিছু দেখলেই সকলকে ডেকে তোলবার বিধি। বাদাবনের নিয়ম-কানুন কিছুই দুকড়ির অজানা নয়। কিন্তু সেই আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে কি মোহ তাকে পেয়ে বসল—দুরন্ত লোভ হল, এগিয়ে ব্যাপারটা চা[illegible] দেখে আসবার জন্য। দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে টানছে, যেতে হবে—যাবেই সে। লোকজন ডেকে তুললে রাত্রিবেলা এখানে-সেখানে কখনো যেতে দেবে না, সে-ই বা কেমন করে এই অসঙ্গত প্রস্তাব তুলবে? সবাই অবাক হয়ে যাবে তার কথা শুনে, সে পাগল হয়ে গেছে মনে করবে।

কাউকে কিছু না বলে দুকড়ি নিঃসাড়ে কাছি খুলে দিল।

গাঙটা ছোট সে জায়গায়—প্রায় নিস্তরঙ্গ। জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে জলের উপর। দুকড়ি বৈঠা বেয়ে চলেছে। অতি সন্তর্পণে বাইছে, জলে নাড়া না লাগে। এতটুকু দুলছে না নৌকা। নৌকার লোক জেগে না ওঠে, সেজন্য তো বটেই—তা ছাড়া, ওপারের রোরুদ্যমানা বোঠের আওয়াজে সচকিত হয়ে বনান্তরালে না পালায়, সেইটেই এখনকার সব চেয়ে বড় ভাবনা।

একটা বাঁক এইভাবে এগিয়ে গিয়ে আড়াআড়ি পাড়ি ধরেছে। কূল ঘেঁষে চলেছে এবার। এমনিভাবে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক—চড়ায় আটকে যেতে পারে, জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে, জঙ্গল থেকে সাপ উঠতে পারে নৌকার পাটাতনে।

বাদাবনের বহুদর্শী মাঝি—সবই সে জানে। কিন্তু জেনেশুনেও দ্বিধা করল না এতটুকু। এমনি এক-একটা ক্ষণ আসে, প্রাণের তখন কানাকড়ি দাম থাকে না—মাটির ঢেলার মতো হাতের মুঠোয় নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা যায়।

কিন্তু কই....বুনো-ঝিঁঝির আওয়াজ শুধু। কান্না থেমে গেল, কিম্বা ঝিঁঝিরাই কৌতুক করে নারীকণ্ঠে কাঁদছিল আরণ্য-রাত্রে। চাঁদাকাঁটার ঝোপের আড়ালে পড়ে গেছে এখন। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। দু-চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করে তাকিয়ে আছে। ভাল দেখতে পাবে বলে নরম কাদায় বৈঠা বসিয়ে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তবু হয় না—টিপিটিপি নামল তখন ডাঙায়। চাঁদাকাঁটায় পা ছড়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

দেখতে পেল—হ্যাঁ, স্পষ্ট চোখে দেখছে সে—

গল্প থামিয়ে হঠাৎ দুকড়ি মধুসূদনের পায়ে হাত দেয়।

পা ছুঁয়ে বলছি বাবুমশায়, যে দিব্যি করতে বলেন রাজি আছি—দেখলাম, ঝোপের আবডালে সোনার প্রতিমা এক মেয়ে। হত্তেলের মতো রং—অমন রূপসী কেউ কোনদিন আপনারা দেখেন নি....

টিপিটিপি পা ফেলে দুকড়ি তখন একেবারে কাছে এসে গেছে। হেঁতালঝাড়টা পার হয়েই চাঁদের আলোয় মুখোমুখি হবে। ঢিব-ঢিব করছে বুকের মধ্যে—সামলাতে পারে না। আর একটু—সামান্য হাত কুড়ির মধ্যেই—

কিন্তু টের পেয়ে গেল এত সতর্কতা সত্ত্বেও। পালিয়েছে। হাউইবাজির মতো আলো ছিটকে সাঁ করে ছুটে গেল। বনজঙ্গল তার গায়ে বাধে না—অবহেলায় যেন হাওয়ায় ভেসে ছুটেছে।

পালিয়ে গিয়ে খালের ধারে ধারে—ঐ, ঐ যে—অনেকটা দূরে ফাঁকার মধ্যে একটা বেঁটে বা'নগাছের ডাল ধ... াড়িয়ে। হাসছে কি তার দিকে চেয়ে চেয়ে—চোখের ইশারায় ডাক দিচ্ছে? দুকড়ি তো ছুটতে পারবে না কাঁটা-জঙ্গলের মধ্যে—লাফিয়ে এসে উঠল নৌকায়। খালের জল মৃদু কল্লোলে গাঙে এসে পড়ছে। মোহানায় স্রোত প্রখর—একটা মাত্র বৈঠার সাহায্যে এগুনো দুষ্কর। জোয়ান বয়স তখন, গায়ে অসুরের বল—সে কি কোন বাধা গ্রাহ্য করে? নেমে পড়ল কাদার মধ্যে। গায়ে যত জোর আছে, নৌকা ঠেলছে। ঠেলে ঠেলে খালে ঢুকিয়েছে, উজোন কেটে চলেছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে....

হঠাৎ একজন মউলের ঘুম ভাঙল। ভাগ্যিস ভেঙেছিল। লোকটা মনে করেছে, জলের টানে কেমন করে বাঁধন খুলে নৌকা ভেসে চলেছে। মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে লাফিয়ে উঠে বসল। পিছন থেকে দুকড়িকে চিনতে পারে । বুড়োমানুষ সে—বাদায় অনেক ঘোরাফেরা আছে। কাজে কর্মে যারা বনে আসে, তাদের মধ্যেও বদলোকের অন্ত নেই। কি মতলবে কে কোথায় দলসুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছে—আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে ওঠে, কে রে?

চুপ, চুপ!

ফিসফিস করে অতি কাতরতার সঙ্গে দুকড়ি বুড়োকে থামতে বলে। এত কষ্ট করে—জীবন পণ করে এই যে নৌকা টেনে আনছে—সকল কষ্ট নিরর্থক হবে, আবার পালিয়ে যাবে এদিক দিয়ে যদি শব্দ-সাড়া পায়।

চুপ! তোমার পায়ে পড়ি দাদা, একটাও কথা কোয়ো না—

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলে, হল কি তোমার ঢুকড়ি? উঠে এসো।

হাত ধরে ফেলে একরকম জোর করে সে ঢুকড়িকে টেনে তুলল তেয়াজিখোপে। পাড়ের একগোছা কাশ মুঠো করে টেনে রেখেছে, নৌকা যাতে ভেসে না যায়। মুহূর্তকাল লোকটা ঢুকড়ির দিকে নিস্পলক চেয়ে রইল। তারপর বলে, হয়েছে কি?

মাটি করে দিলে। কে-একজন কাঁদছিল ইদিক পানে। আর তো দেখতে পাই নে।

এদিক-ওদিক ঠাহর করে দেখে বুড়ো শিউরে ওঠে। বলে, ওরে বাবা! চিনতে পারছ না কোনখানে চলে এসেছ? খালটুকু শেষ হলেই যে সর্বনাশীর মুখ—

সর্বনাশীতে এনে ফেলেছে রে! ওঠ—উঠে পড় সবাই—

চেঁচামেচিতে সকলে জেগে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে চারিদিক তাকিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করে। তাই তো—আর একটু হলেই সর্বনাশ হত। সবসুদ্ধ গাঙের নিচে যেতে হত। ঝড়-তুফান না-ই থাক, নৌকার পরিত্রাণ ছিল না সর্বনাশীর চোরাদহে পড়লে। নিঃশঙ্কে এরা নিদ্রিত ছিল—গভীর রাত্রে সেই সময়ে ঢুকড়ি নিয়ে চলেছিল সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। যে ঢুকড়িকে কাণ্ডারী করে তারই ভরসায় ঘরবাড়ি ছেড়ে এতগুলো মানুষ দুর্গম জলজঙ্গলে এসেছে।

ডাইনে বাঁয়ে দু-জনে ঢুকড়িকে জাপটে ধরে বসে আছে। ঢুকড়ি আর নয়—এবারে হালে গিয়ে বসল এদেরই একজন।

জোরে বাও মরদের বেটারা। সাবাস, সাবাস! উড়িয়ে নিয়ে চলো। বিষখালিতে উঠে তবে জিরান পাবে—

এক সঙ্গে ছখানা বৈঠা পড়ছে, বাইচের মতো নৌকা তীর-গতিতে ছুটছে। দুকড়ি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে অপরাধ। কি হয়েছিল যেন তার—কি মোহে পেয়ে বসেছিল। এখন দু-হাঁটুতে মুখ গুজে সে বসে আছে।

সর্বনাশী থেকে যত দূরে আসছে, একটা দুটো করে ততই কথা ফুটছে সকলের মুখে। দুকড়িকে যাচ্ছে-তাই করে বলছে। আর সেই বুড়োই তর্ক করছে দুকড়ির হয়ে।

হুঁশজ্ঞান ছিল কি ওর? সর্বনাশী বেটী মাথা ঘুলিয়ে দেয়। সর্বনাশীর চোলে যে-কেউ তোমরা পড়তে, ঠিক এমনি দশাই হত। বকাঝকা ছাড়ান দাও, বাপের ভাগ্যি যে প্রাণে ফিরে চলেছ।... চাপান দেওয়া যাক এই জায়গায়--কি বলো? ঐ যে, আরও ক-খানা বেঁধে আছে। আর ঘুমানো নয়—রাতটুকু জাগতে হবে সকলে মিলে গল্পগুজব করে। কি জানি, বলা যায় না—সর্বনাশী আশে-পাশে আছে হয়তো ওত পেতে। কটা আলো আছে? সবগুলো জেলে দাও—

২২

কাচিপাতা নদীর একটা মুখ সর্বনাশী। এর দহে পড়ে কত যে ভরাডুবি হয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। বাদাবনে নবীন আগন্তুক নদীর এই অদ্ভুত নামে অবাক হয়। পণ্ডিতজনে ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করবেন, পাড় ভেঙে তছনছ করতে বোধ হয়—তাই কীর্তিনাশার সমগোত্রীয় এই নাম।

সর্বনাশীর কাহিনী শুনবার পর তুকড়িই আবার কতজনের সঙ্গে সেই কথা বলেছে। বাদাবনের অন্ধি-সন্ধি নিয়ে এমনি কত গল্প মাঝিদের মুখে মুখে চলে। আগে যে দুকড়ি কেন শোনে নি, সেইটে আশ্চর্য।

একদা বসতি ছিল এই সমস্ত নদীর কূল ঘিরে—জঙ্গলের চিহ্নমাত্র ছিল না। জমি উঁচু ছিল—জোয়ারের সময় জলতলে ডুবে থাকত না এখনকার মতো। লোকের পেটে অন্ন মনে সুখ ছিল। পালপার্বণ ফুরাতো না বছরের মধ্যে কোন সময়।

তারপর লুঠেরার দল এসে পড়ল। এখনকার এই ধুমাকল নয়—পালের জাহাজ ভাসিয়ে তারা আসত। হার্মাদ বলত তাদের—পুরাপুরি মানুষ নয়, তামাটে গায়ের রং, তামাটে চুল-দাড়ি, দৈত্য-দানবের মতো চেহারা, বিচিত্র পোশাক, অবোধ্য কথাবার্তা। ঘাটে জাহাজ লাগিয়েই গুড়ুম-গুড়ুম বন্দুক ছুড়ত, আগুন বেরুত নলের মুখ দিয়ে। গরু-ছাগলের মতো মনে করত তারা মানুষকে, অকারণে কষ্ট দিত, মানুষ মেরে ফেলে হো-হো করে হাসত।

বাসিন্দারা যে ভীরু ছিল, তা নয়। কিন্তু ঢাল-সড়কি-লাঠির নাগালের মধ্যে না পেলে তারা কি করতে পারে? নিরাপদ ব্যবধানে থেকে কলের সাহায্যে মানুষ মারা—কাপুরুষতা ছাড়া আর কি? সেই সেকালে ইন্দ্রজিতের লড়াইয়ের মতো। মরদ-জোয়ান হলে সামনাসামনি এসে দাঁড়াও—বোঝা যাবে তখন ক্ষমতা।

বছর বছর আসে হার্মাদরা। শেষাশেষি কামান নিয়ে আসতে লাগল। একবার এমনি হানা দিয়েছে কাচিপাতার তটবর্তী বিশাল এক গ্রামে। যেন সবুজ ভরা-ক্ষেতে দাঁতালের দল ঢুকে পড়েছে।

বিকালবেলা থেকে তাণ্ডব চলছে—দেড় প্রহর রাত্রি, এখনো তাদের কাজকর্ম সারা হল না। জাহাজ নিশ্চল অবস্থায় ঘাটে বাঁধা—রাতের মধ্যে ভাসানো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। মালপত্র কিছু কিছু পাওয়া গেছে—সোনাদানা এবং দামী দামী জিনিসগুলো জাহাজে তুলছে, ভেঙে তছনছ করে ছড়িয়ে দিয়েছে বাকি সমস্ত। কিন্তু মানুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—পূর্বাহ্ণে টের পেয়ে যেন কর্পূর হয়ে উবে গেছে। যা ত্ু-একজন পাওয়া যায়, নিতান্ত অকেজো। অতি-বৃদ্ধ বা অত্যন্ত শিশু। এ আবর্জনা জাহাজ বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাবে কোন লাভের আশায়? রাত বাড়ছে আর ব্যর্থতার অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে লুঠেরারা। ঘর-কানাচ, গোয়াল, বাগবাগিচা—সর্বত্র হানা দিয়ে ফিরছে। মানুষ চাই—শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ! মেয়েমানুষ কমবয়সি।

এক বাড়ির চার-ভাইকে পাওয়া গেল দৈবক্রমে। খাঁড়ির মধ্যে বহুদূরব্যাপী হোগলাবন—তারই মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে চুপচাপ তারা বসে ছিল। শেষরাত্রির দিকে ক্লান্তিতে হার্মাদদের আক্রোশ ঝিমিয়ে পড়বে, সেই সময়ে বোধ করি নিঃশব্দে সরে পড়ার মতলব। ধরা পড়ার কথা নয়—কিন্তু নড়াচড়ার দরুন সেই জায়গায় হোগলার মাথা অল্প-একটু নড়েছিল বুঝি—একজনের নজরে পড়ে গেল। তখন লম্বা তলতাবাঁশ এনে সেইখানে ঢুকিয়ে দিতে নৌকায় ঠোক্কর লাগল।

ধরা পড়ল চার ভাই। বিস্তর জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে সঙ্গে নিয়েছিল, নামিয়ে আনল সমস্ত। বেটাছেলেদের তো পাওয়া গেল, বউগুলো গেল কোথায়?

আরও রাত হল।

সহসা কাচিপাতার কূলে আপনি এসে হাজির হল ছোট বউটি। যে জায়গাটায় জাহাজ বেঁধেছে সেখানে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। বিস্রস্ত চুল, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। মুখের অপরূপ গৌর আভা উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়েছে। বলে, তোমাদের কাপ্তেনের কাছে যাবো।

লোকজন যেতে দিচ্ছে না। পাগল বলে ভেবেছে। তা ছাড়া নিগূঢ় মতলবও আছে। কাপ্তেন সকল দিকে ভাগ্যবান—তা হলেও এমন ভালো জিনিসটা অত উঁচু অবধি যেতে দেবে না, নিচে থেকে বাঁটোয়ারা করে নেবে। একঘেয়ে সমুদ্রচর জীবনে নারীসঙ্গের জন্য লোলুপ সকলেই। উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে দুঃসাহসিক লুঠতরাজে আসে নারী ও সোনার লোভে। ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির পর নারী সোনার দামেই বিক্রি করে দেয় বিদেশের বাজারে। পুরুষলোকও বিক্রি হয়, কিন্তু ভাল যুবতী নারীর দামের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

বউ হুমকি দিয়ে ওঠে, পথ ছাড়ো বলছি—

কামরায় বিশ্রাম করছেন কাপ্তেন। দেখা হবে না।

কথা মিথ্যা নয়। আলো নিভিয়ে দিয়ে কেবিনের মধ্যে সাহেব অনেকক্ষণ চুপচাপ আছে। নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে স্খলিত পায়ে সে ডেকের উপর বেরিয়ে এল।

ক্রোধে ফেটে পড়ে বউটি।

বর্বর ইতরগুলো আমার স্বামী-ভাসুরদের বেদম মারছে। তোমার কাছে নালিশ জানাতে এলাম সাহেব। তোমার লোকজন ফিরিয়ে আনো—এনে চাবকাও আচ্ছা করে। চাবকে পিঠের ছাল তুলে দাও।

সাহেব পায়ে পায়ে অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে! এই নোনা অঞ্চলে গোলাপ ফুটবার জায়গা নয়— মেয়েটি এদিককার নয়ও, ভূষণা থেকে তাকে বিয়ে করে এনেছে বছর চার-পাঁচ। চালচলন ও কথাবার্তায় যেন বিদ্যুতের ঝিলিক হানে মেয়েটা।

টলতে টলতে কাপ্তেন দ্রুত নেমে আসছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। তখন সম্বিৎ হল বউটার। এ কি করেছে—হিতাহিত না ভেবে স্বামী-ভাসুরদের বাঁচাবার আগ্রহে এ কোন মাতাল ক্ষুধার্ত জানোয়ারের সামনে এসে পড়েছে?

পালাল বউটা। ভারী বুটের আওয়াজ তুলে সাহেবও ছুটেছে পিছু পিছু। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি—দড়াম করে সদর-দরজা খুলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বউটা বারাণ্ডায় উঠল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল মুহূর্তকাল। দেখছে। দরদর রক্ত পড়ছে চার ভাইয়ের হাতের আঙুল বেয়ে। আহা-হা, করেছে কি দেখ! বাঁ-হাতের পাতা ছেঁদা করেছে চার জনেরই—বেতের ছোটা হাতের ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিয়ে চারখান হাত একসঙ্গে বেঁধেছে। আপাতত থাকুক এমনি। পালাবার সম্ভাবনা নেই এই রকম হালি-বাঁধা অবস্থায়। এ অঞ্চলের লোকে ভেটকি-ভাঙান মাছ মেরে কানকোর ভিতর দিয়ে দড়ি পরিয়ে এই রকম একত্র ফেলে রেখে দেয়।

ওরা থাকুকগে পড়ে, বউটির দিকে সকলের একাগ্র নজর। কিন্তু কাপ্তেন পিঠ-পিঠ উঠানে এসে ভেস্তে দিল। বউ সুড়ুত করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অমনি!

দশ-বারো জনে তন্ন-তন্ন করে খুঁজছে। পাত্তা পায় না। কাপ্তেন হুকুম দেয়, বেরোবার যতগুলো দরজা আছে, সমস্ত

আগলে থাকো। কত ঘণ্টা অথবা কদিন পালিয়ে থাকতে পারে, দেখা যাক।

বেশি দেরি হল না, বউ নিজেই বেরিয়ে এল। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই মুখে—সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সরু বেতির চিকন কাজ-করা শীতলপাটি এনে সযত্নে সে পেতে দিল।

বসুন—

গল্পের মধ্যে বউটার নাম কেউ উল্লেখ করে না। নাম আন্দাজ করতে পারো নগরবাসী ভাই? মধুসূদনের—কেন জানি না, একটা নাম দিতে ইচ্ছে করে—দামিনী। অথবা বিজলীলতা। স্বামী ও ভাসুররা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, বিজলীলতা সে দিকে তাকাল না একবার। মধুর মাদক হাসি হেসে লীলায়িত ভঙ্গিতে আহ্বান করে, আসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনারা বসুন এসে পাটির 'পর।

কথা হয়তো বুঝছে না—তাই হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেয়। কাপ্তেন ও সেই দশ-বারো জন এক পা দু-পা করে এগিয়ে এলো অলক্ষ্য আকর্ষণে। অপ্রতিভ ভাব লোকগুলোর—এতক্ষণ এখানে যে ব্যবহার করছিল, তার জন্য লজ্জা বোধ করছে বিজলীলতার সামনে। তারা কি করেছে—আর তার বদলে মেয়েটার কি রকম ব্যবহার! আগের সমস্ত ব্যাপার চাপা পড়ে গেলে যেন তারা বেঁচে যায়।

বিজলীলতাও যেন কিছু জানে না, সে দেখেও দেখছে না। কতক মুখে কতক বা আকারে ইঙ্গিতে জানাল, পরম বাধিত হয়েছে সে এই সব মহামান্য বিদেশি অতিথিদের বাড়ির উপর পেয়ে।

কাপ্তেন লোকজনদের বাইরে যাবার হুকুম দিল। ঘাড় নেড়ে বিজলীলতা প্রতিবাদ করে, না-না—যাবে কেন? সবাই এ বাড়ির অতিথি। কত হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে বেড়াচ্ছ তোমরা এই রাত দুপুর অবধি, কত কষ্ট হয়েছে! ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয় খুব।··· পরমান্ন খাবে সাহেব? খেতেই হবে। নতুন খেজুর-গুড় দিয়ে রান্না করব, কি রকম বাস বেরুবে দেখতে পাবে।

সাহেব আর পারে না—ধৈর্য হারিয়ে খপ করে তার হাত এঁটে ধরল। হাসতে হাসতে হাত ছাড়িয়ে বিজলীলতা লঘুপক্ষ পাখির মতো রান্নাঘরে ঢুকল। বারাণ্ডার প্রান্ত থেকে স্বামী ও ভাসুররা রক্তচক্ষে তার রকম-সকম দেখছে। হাত বাঁধা—কি করবে? নইলে মেলতুক ধরে এক কোপে বলি দিত স্বৈরিণী বউকে। প্রাণটাই কি এমন বড় হল ওর কাছে?

রান্নাঘরের ভিতর এতক্ষণ ধরে কি রাঁধছে, কে জানে? সাহেব ইতিমধ্যে আরও কিছু রসদ আনিয়ে নিয়েছে জাহাজ থেকে। টইটম্বুর অবস্থা। আর সবুর সইছে না। চোখ লাল, মুখে বীভৎস উগ্র গন্ধ—চলল সে রান্নাঘরের দিকে। আগে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। চুপ করে আছে বিজলীলতা। চুল্লি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। পরমান্ন ফুটছে টগবগ করে, সুগন্ধ বেরিয়েছে। পাঁজাকোলা করে তুলে রান্নাঘর থেকে তাকে সাহেব বড়-ঘরে নিয়ে আসে।

হাত-পা ছুঁড়ছে বিজলীলতা।

আঃ, কি করো? দেখতে পাচ্ছ না ঐ যে—

ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সাহেবের হুঁশ হল, বারাণ্ডায় চার ভাই ওরা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। একবার দুরন্ত ইচ্ছাও জাগে,

দেখুক ওরা—স্বামী ও ভাসুরদের চোখের উপরেই যা ঘটবার ঘটুক সমস্ত। কিন্তু বিজলীলতার দিকে তাকিয়ে মুষড়ে পড়ে। সাহস হয় না বেশি পশুত্ব-প্রকাশের।

উঠানের পাশে গাঁদা-দোপাটি-জুঁই ফুলের বাগান। আজকের এত বুটজুতোর দাপাদাপিতে ফুল-বাগান বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। চার ভাইকে টেনে তুলে সাহেব একরকম ছুঁড়েই দিল উঠানে। ঘড়াং করে ঘরের দরজা দিতে যায়।

বিজলীলতা হেসে বলে, আগে খেয়ে নাও—তারপর। এত কষ্ট করে রাঁধাবাড়া করলাম।

কাপ্তেন খেলো না। খাবার অবস্থা ছিল না তার। তা ছাড়া বিষ-টিস দিতে পারে, এ সন্দেহও আছে। নেশা হলেও আখেরের বুদ্ধিটুকু লোপ পায় নি। আর সবাই গোগ্রাসে গিলছে সারবন্দি পাতা পেতে বসে। এমন চমৎকার খাওয়া অনেককাল ভাগ্যে জোটে নি।

এবারে এসো বিবি—

আর একটু। একটুখানি ছুটি দাও—

পরনের কাপড় দেখিয়ে বউটি বুঝিয়ে দেয়, রান্নাঘরের কালিঝুলি মেখে গেছে—সরম লাগছে সাহেব, কাপড়টা বদলে আসি।

সবুর সহ্য হচ্ছে না কাপ্তেনের। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—পথ কিছুতে ছাড়বে না। কিন্তু ছোট্ট পাখির মতো সাহেবের আটকানো হাতের নিচে দিয়ে হাসতে হাসতে পালাল বিজলীলতা। সাহেব গিয়ে দেখল, দাওয়ার পাশে ছোট খোপটায় ঢুকে পড়ে সত্যিই সে কাপড় বদলাচ্ছে। সে দিকে মুখ বাড়াতে বিজলীলতা লাবণ্যময় ছুটো আঙুল তুলে বলে, এই····এইও—

ঢুকতে পারে না সাহেব। বাইরে দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে অসম্বৃত-বেশার রূপ দেখছে।

বিজলীলতা দেখে খিল-খিল করে হেসে তাড়া দেয়, সরে যাও বলছি—

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। সাহেব আবার উঁকি দিয়ে দেখে। নেই তো! কি সর্বনাশ, পালিয়ে গেছে ওদিককার দরজা দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? রাগে রাগে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে— বিজলীলতা পিছন দিক দিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল।

কি ব্যস্ত মানুষ গো। সিঁদুর পরতে গিয়েছিলাম। আর দেরি নয়, ঘরে চলো—

অপরূপ সেজেছে। লাল টকটকে শাড়ি পরনে, সমস্ত কপাল ভরে বিশাল গোলাকার সিঁদুরের ফোঁটা। কাপ্তেনের হাত ধরে টেনে অধীর কণ্ঠে সে-ই বলে, চলো—

খিল এঁটে দিল দরজায়। বর ও ভাসুরেরা উঠান থেকে দেখে দাঁত কড়মড় করছে। আর ও-ঘরে হৈ-হল্লা করে ভোজ খাচ্ছে লুঠেরা অতিথির দল। কালামুখী সকলের চোখের উপর দরজা এঁটে দিল দলপতিকে নিয়ে। দরজা বন্ধ করল তবু রক্ষা। খোলা থাকলে দেখা যেত, সাহেবের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বউটা। আনন্দে কিংবা বেদনায় আঃ-আঃ—করছে সাহেব। জাপটে ধরেছে বিজলীলতা।

দেরি হয়ে গেছে—না? আর দেরি নেই।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। না, দেরি নেই আর। ধোয়াচ্ছে। কাপ্তেন তখন শয্যার উপর। বিজলীলতার নিজের হাতে রচিত কত সাধ আর কত স্বপ্নে মণ্ডিত শয্যা। সুরামত্ত সাহেব আবেশে চোখ বুঁজেছে।

দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল শুকনা ঘরের চালে বাঁশের বেড়ায়। আগুনের তাপে সাহেবের নেশা কাটল।

এ কি!

চারিদিকে একসঙ্গে আগুন লেগেছে—পালাবার ফাঁক নেই। জ্বলন্ত চালের খানিকটা ভেঙে পড়ল সামনে। কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে সাহেব। সাধ্য কি, বিজলীলতার বাহুবেষ্টন ছাড়িয়ে বেরুবে! সোনার বরন এক নাগিনী শত পাকে বেঁধেছে যেন তাকে।

আগুন দেখতে দেখতে গ্রামব্যাপ্ত হল। এ আগুন বিজলীলতার—হার্মাদরা দেয় নি। পুড়ে মরল কাপ্তেন। ভোজের আসরেও মারা পড়েছিল প্রায় সবাই। উঠানের চার ভাইয়ের খবর কেউ বলতে পারে না। হয়তো মারা গিয়েছিল তারাও আগুনে পুড়ে। কিংবা পালিয়েছিল এই সুযোগে। এমনও হতে পারে, জাহাজ বোঝাই করে দূর দেশে নিয়ে তাদের বেচে দিয়েছিল হার্মাদরা।

বাসুকী ক্ষেপে উঠলেন এর পর। এত অন্যায়ের ভার সইতে পারেন তিনি? শোনা যায়, ঘন ঘন কাঁপতে লাগল সারা অঞ্চল, কামান-নির্ঘোষ হতে লাগল জলতলে। কাচিপাতা উচ্ছ্বসিত হয়ে সমৃদ্ধিবান্ আনন্দোচ্ছল বিশাল জনপদের জল-সমাধি রচনা করল।

গুম-গুম-গুম—বর্ষায় এখনো কামানের মতো আওয়াজ পাওয়া যায় সাগর-তলে। লোকে বলাবলি করে, দূর লঙ্কাদ্বীপে ঘড়াং-ঘড়াং করে রাবণ রাজার প্রাসাদ-তোরণ বন্ধ করছে। আওয়াজের বিলাতি নাম বরিশাল-গান। ঢুকড়ি সাবধান করে দেয় মধুসূদনকে,

জঙ্গল হয়ে আছে বাবুমশায়—সর্বরক্ষে! তাই আর নতুন করে তেমন-কিছু প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটছে না। কিন্তু আপনি যে রকম বলেন—সব জঙ্গল শেষ করে যদি আবাদ বসাতে যান, আবার ওঁরা ক্ষেপে উঠবেন। রাগ পড়ে নি এত কালের পরেও। আর, সেই সর্বনাশী বউটা আজও বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নানান অবস্থায় নানাজনের কাছে দেখা দেয়।

রাতবিরেতে বাদাবনের নদীপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবোধ আগন্তুক-দের সর্বনাশী মোহগ্রস্ত করে—যেমন একদা জাহাজ থেকে টেনে নামিয়েছিল ফিরিঙ্গি কাপ্তেনকে। কপালে তেমনি ডগমগে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, লেলিহ আগুনের রঙের শাড়ি পরনে। সেকালের খোড়োঘরের গ্রামের মতো কাঁচা বাইন-খলসি-গরান-গর্জনের জঙ্গলে আগুন ধরানো যায় না তো—তাই ধাঁধা লাগিয়ে নৌকা-ডিঙি সর্বনাশীর চোরাদহে এনে ফেলে। নিতান্ত বাপ-পিতামহের পুণ্যবল ছিল—সেবারে তাই দুকড়িরা কোন গতিকে বেঁচে এসেছিল তার কবল থেকে।

ছোকরা মাঝিদের এবং কেতুচরণকেও দুকড়ি কতবার সামাল করে দিয়েছে, রাত্রিবেলা কদাপি যেন নৌকো না ছাড়ে। বেলাবেলি ভাল জায়গা দেখে চাপান দেবে, যেখানে আর দু-দশখানা নৌকো বেঁধে আছে তারই মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আর বাওয়ালিদের কাছে আগেভাগে ভাল করে জেনে নেবে, জায়গাটা গরম, অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল কিনা।

আগে পিছে নৌকা—নিরাপদ মনে করে সেই সঙ্গে তোমার নৌকাও যাচ্ছে। চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেছে, খেয়াল করতে পারো নি—হঠাৎ এক সময় হয়তো দেখবে একটা নৌকাও নেই

কোন দিকে, তুমি একা। মায়া-নৌকার বহর সাজিয়ে ওঁরা ফাঁকি দিয়ে এমনি এনে ফেলেন খপ্পরের মধ্যে। সামাল নাই, খুব সামাল!....হয়তো বা শুনতে পাবে, বনান্তরাল হতে অতি-পরিচিত কণ্ঠে কে তোমার নাম ধরে ডাকছে, কিংবা পরমাসুন্দরী কেউ নদীকূলে দাঁড়িয়ে আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদছে। তুমি ভান কোরো, ঘুমিয়ে আছ—কোন-কিছুই দেখছ না, কিছুই কানে যাচ্ছে না তোমার। চোখের সামনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাক না—ভয়ে বা করুণায় নৌকা ছাড়বে না রাত্রিবেলা। উঁহু—কদাপি নয়।

২৩

তুকড়ির মহামূল্য উপদেশ কেতুচরণ বলে নয়—জোয়ান ছেলে কেউ বড়-একটা কানে নেয় না। বয়সের ধর্ম। ছেলেছোকরারা কজনে নিয়মনীতি মানে? হাসিরহস্য করে হিতকথা নিয়ে। তুকড়ির নিজের ব্যাপারেই দেখ না—সেই একরাত্রে জোয়ান বয়সে কি সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল বলো দিকি!

কিন্তু এবারে কেতুচরণ কি বলবে—সর্বনাশীকে চাক্ষুষ দেখবার পর? সর্বনাশী গাঙটা অনেক দূর মর্জাল বনকর-স্টেশন থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাহস বাড়তে বাড়তে বাদার প্রান্তে প্রায় জনপদ-সীমান্ত অবধি ধাওয়া করে এসেছে বউটা। গভীর জঙ্গলে শিকার মেলে না বুঝি আজকাল? বুড়ো তুকড়িদের উপদেশক্রমে মাঝিমাল্লা কাঠুরে-বাওয়ালি—যত জোয়ান পুরুষ সাবধানী কাপুরুষ হয়ে গেছে?

টপ্পায় গেয়ে থাকে—

পরালি প্রেমের ফাঁসি, সর্বনাশী,
বারে বারে ঘুরে ফিরে তাই তো তোরে
দেখতে আসি—

কেতুচরণের তাই হয়েছে। নৌকায় শোয় সে। অস্থায়ী এক কুঁজি বেঁধে নিয়েছে, সেখানে আর সকলে থাকে। মেলায় রকম-বেরকমের মানুষ আসছে—ওরা যেমন জুটিয়েছে, আবার ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ঐ প্রণালীতে আর কেউ এ ডিঙি সরিয়ে নিতে পারে তো! নৌকায় শুয়ে কেতুচরণ পাহারায় থাকে।

রাত দুপুরে এক-একদিন যেন সে পাগল হয়ে ওঠে। ঘুম হয় না, পাটার উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে। ঘাটে-বাঁধা নৌকার খোপে চুপচাপ পড়ে থাকতে কিছুতে মন লয় না। পুরন্দরের উদ্দাম ঢেউ কূলের উপর আছড়াচ্ছে। বিনিদ্র আচ্ছন্ন চেতনায় সে যেন দুরন্ত ঘোড়ার পদ-দাপ শোনে। তরঙ্গের পিঠে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে ছুটে যেতে চায় মর্জাল-স্টেশনে—নিশিরাত্রে সর্বনাশী অতুল রূপে বনভূমি যেখানে আলো-আলোময় করে রেখেছে। মৃত্যু সুন্দরী বউ হয়ে ডাকছে—এসো গো চলে এসো। এ ডাক উপেক্ষা করে সদাসতর্ক জীবন বাঁচিয়ে রাখবার কোন মানে হয় না।

নদী ও খালের মোহানায় দুধের মতো সাদা চর। এক কণিকা মাটি মুখে দিয়ে দেখ—নোনতা, বিস্বাদ। নুন ফুটে আছে ধরিত্রীর গায়ে। কোটালের সময় চর ডুবে যায়, জলতরঙ্গ বাঁধের গায়ে ধাক্কা মারে। পর পর দুটো এই রকম বাঁধ—একটা যদিই বা

দৈবাৎ জলের তোড়ে ভেঙে যায়, অন্যটা রইল। বাঁধ মেরামতের জন্য ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে দিনরাত্রি এস্টেটের মাইনে-করা লোক ঘুরছে। বিশেষ করে বৃষ্টিবাদলার সময়।

বাঁধের ঠিক ওপারে মেলার জায়গা। দোকানঘরগুলো মেলা অন্তে হাটের চালা হিসাবে থাকবে। পাকাপাকি দোকান খুলে কেউ যদি থাকতে চায়, মধুসূদন সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পয়সা খরচ করে মালপত্র সাজিয়ে বসতে সহসা কেউ রাজি হচ্ছে না। কোন্ লাভে থাকবে? তবে মাছের সায়েরটা জমবে সুনিশ্চিত। এত মাছ পড়ে এ দিকে—মাছ কেনাবেচার একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া অতিমাত্রায় জরুরি। সায়ের বসলে সেই সূত্রেও অনেক লোকের ওঠা-বসা হবে। মানুষ হল লক্ষ্মী—মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে হাট জমানোর।

মেলার বাইরে একটা উঁচু জায়গা খুশাল সায়েরের জন্য পছন্দ করেছে। গোলপাতার দোচালা-বেঁধে আপাতত কাজ চালাবে। দু-খানা চাই অন্তত। সায়েরের বেচাকেনা ফাঁকা চরের উপরেই চলবে, তবে বৃষ্টিবাদলার সময় অথবা শীতের রাত্রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদনের দরকার। একটা ঘর থাকবে এইজন্য। আর একটায় খুশালের দলের বাসা। রান্নাবান্না ও তহ্‌বিল ইত্যাদি রাখার জন্য আলাদা একটুকু বাসার প্রয়োজন।

সমস্তটা দিন নৌকায় মেলার মানুষজন বওয়াবয়ি চলে; রাত্রিবেলা সায়ের-ঘরের সরঞ্জাম তৈরি হয়। বাঁশ দুষ্প্রাপ্য এদিকে—কয়েকটা তবু অনেক কষ্টে জোগাড় হয়েছে। বাঁশ ফেড়ে ফেলে চালের বাখারি হচ্ছে। চরের উপর তিন-চারজনে পাশাপাশি বসে বাখারি চাঁচে ও গল্পগুজব করে। গরানের ছিটের রুয়ো—

ছাল তুলে স্তূপাকার করে ফেলেছে। এই ছালও ফেলার বস্তু নয়—জলে ভিজিয়ে রাখলে ক্রমশ রক্তাভ হবে জল, তাই দিয়ে খেপলাজালের কষ ধরাবে। গোলপাতা বাছাই করে পস্তর-ছায়ায় সাজিয়ে রাখছে—ছায়ায় আস্তে আস্তে শুকোবে, রোদে থাকলে পাতা খারাপ হয়ে যায়। কেতুচরণ লেগে আছে এই সব কাজকর্মে—মন উতলা হলেও বেরুবে কোন সময়? আবার দ্বিধাও আসে! যাক গে, কি হবে আর বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে? টুনিকে নিয়ে ঘরসংসার করতে চেয়েছিল—সংসার না হলেও ঘর হতে যাচ্ছে তো? ধরণীর পিঠের উপর কায়েমি বসবাসের একটুখানি ঘর। অনেক তো হয়েছে—চালের নিচে মাথা গুঁজে থাকা যাক এবার সুস্থির হয়ে।

ভারি নিরিবিলি জায়গা। এমনটা থাকবে না অবশ্য। গাঙে খালে মাছের ভরা বেয়ে মাছ এনে এনে ঢালবে শুধুই নয়—অকারণে আড্ডা দিতেও অনেকে আসবে। সায়েরটা জমিয়ে নিতে পারলে যে হয়!

ঋষিবর হেসে চোখ-বড় বড় করে বলে, আসবে কি বলো—আসছে এখনও। রাতদুপুরে চাদরে মুখ ঢেকে আসে, তাই জানতে পারো না। একজন দু-জন করে চুপিসারে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সাঁজ না লাগতে মাগিগুলো ঘুরঘুর করে বেড়ায়, সে কি এমনি-এমনি?

হি-হি করে হাসতে হাসতে কাটারি দিয়ে সজোরে সে চেরা-বাঁশের গেরো কাটে।

মেলায় কয়েকটি দেহজীবিনীর আমদানি হয়েছে, ছোটখাটো একটা পাড়া বসেছে তাদের। মেলা জমাতে যাত্রা-জারিগানের

মতো এরাও অত্যাবশ্যক। খবর রাখে, কখন কোন জায়গায় জাঁকালো রকমের মেলা বসছে—সঙ্গে সঙ্গে এরাও গিয়ে গোল-পাতার ছাউনি, গোলের বেড়া, বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে রাতারাতি ঘর তুলে ফেলে। মেলা ভাঙলে তল্পিতল্পা নৌকা বোঝাই করে চলে যায় আবার যে অঞ্চলে নূতন মেলা বসাচ্ছে—নব নব খরিদ্দারের সন্ধানে।

সায়েরের জায়গা এই পাড়ার প্রান্তে নদী ও খালের মোহানার উপর। ইতিমধ্যে খুশাল একদিন রায়-এস্টেটে টাকা জমা দিয়ে যথারীতি মোহর-মারা রশিদ নিয়ে এসেছে। খোঁটা পুঁতে সায়ের-ঘরের নিশানা হল। বেচাকেনা শুরু হতে আর দেরি নেই।

এক রাত্রে কেতুচরণ অমনি শুয়ে আছে, গোল-পাঁচু দ্রুত এসে গলুইতে লাফিয়ে উঠল! দুলে উঠল ডিঙি। ঘুমের আবিল কেটে গিয়ে কেতু মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসেছে।

কে রে?

গোল-পাঁচু বলে, চুপ চুপ! শুনতে পাচ্ছ না? থির হয়ে কান পাতো।...কেমন, এইবার?

অ র্ র্—অ-অ-অ—

বিড়ালের ডাকই বটে! এমন জোর আওয়াজ, যে এতদূর থেকেও কানে আসে। বিড়াল বাঘের মাসী—আর এটা হল সুন্দরবন জায়গা তো—অতএব রয়্যাল-বেঙ্গলের মাসী, ডাক শুনে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। ওরা যে কুঁজি বেঁধেছে, তার পাশেই। কানের কাছে এই কাণ্ড হতে থাকলে মরা মানুষ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে—পাঁচুদের অপরাধ কি, ঘুমাবে তারা কেমন করে?

কেতুচরণ ফিস-ফিস করে বলে, একটা বস্তা নিয়ে আয় তো শিগগির—

বস্তা কোথায় পাবো? মাছের ঝুড়ি আছে।

নিয়ে আয় তাই। ঝুড়ি চাপা দিয়ে তো রাখা যাক। দিনমানে যখন চড়ন্দার নিয়ে বেরুব, বস্তা সেই সময় চেয়েচিন্তে নিতে হবে কারো কাছ থেকে!

গোল-পাঁচু কুঁজির দিকে যাচ্ছিল ঝুড়ি-সংগ্রহের জন্য। কেতুচরণ ডেকে বলল, মাছ আছে ঘরে? কিম্বা দুধ হলেও হবে।

পাঁচু ঘাড় নাড়ে।

পান্তা-ভাত আছে সকালের জন্য। আর নুন-লঙ্কা।

তাই সই। নিয়ে আয়।

নারিকেল-মালায় করে পান্তা-ভাত নিয়ে এল পাঁচু। আর একটা চাঁপাকলা—খোসা ছাড়িয়ে ভাতের উপর দিয়েছে।

কেতুচরণ ঠাহর করে দেখে হেসে উঠল।

কলা কি হবে রে?

পাঁচু বলে, ছিল—তাই নিয়ে এলাম। শুধু পান্তার চেয়ে কলা দেখতে পেলে লোভ বেশি হবে।

বেড়াল ধরতে যাচ্ছি। বানর নয় যে কলা দেখলে হাত বাড়াবে।

চাঁদ ডুবে গেছে। তার উপরে মেঘ জমেছে কিছুক্ষণ ধরে আকাশে। অন্ধকার—ভাবুকজনে স্বচ্ছন্দে সূচীভেদ্য বিশেষণে অভিহিত করতে পারেন। মনে অনুভূতি জাগে, এ অন্ধকার বুঝি রীতিমতো একটি ঘন পদার্থ—হাতে পায় ঠেলে ঠেলে এগুতে হয়। সুঁচ চালিয়ে অন্ধকার ছেঁদা করা চলে—এ কল্পনা নিতান্ত অলীক বলে মনে হয় না।

এদের কুঁজি ও আতরবালার বাসার মধ্যবর্তী জায়গায় কয়েকটা দীর্ঘ কেওড়াগাছ ও গিলেলতার ঝোপ। ঘর-কানাচের জঙ্গল সাফ করবার প্রয়োজন নেই—তাই পড়ে রয়েছে অমনি। হুলোবেড়ালটা ঐখানে এসে জুটেছে। আওয়াজ অতি প্রখর—কিন্তু গাছের ছায়ান্ধকারে বিড়ালটা নজরে আসছে না।

মালাসুদ্ধ ভাত মাটিতে রাখল, রেখে ওষ্ঠ ও জিভে শব্দ করছে—চুঃ-চুঃ-চুঃ—। বিড়ালের যাতে মনোযোগ পড়ে এদিকে, ভাত খেতে চলে আসে। গোল-পাঁচু শব্দ করছে, আর কেতুচরণ একটু পিছনে ঝুড়ি তুলে তৈরি হয়ে আছে। খেতে শুরু করলেই ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে দেবে। আপাতত এখন ঝুড়ির উপর ভারি একটা কিছু চাপিয়ে রেখে দেবে।

কিন্তু ক্ষণপরেই বোঝা গেল, আহার-দ্রব্য দিয়ে আকর্ষণ করা অসম্ভব—মনোযোগ তার অপর দিকে।

পিছনদিককার ঝাঁপ খুলল আতরবালা। হেরিকেন উঁচু করে ধরে আহ্বান করে, আসেন বাবু—

বিড়ালের ডাক বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ছাঁচতলায় জুতো খুলে রেখে ঘরে উঠল বিড়াল নয়—একটি লোক, ভদ্রলোক—গলায় মাথায় চাদর জড়িয়ে যথাসম্ভব পরিচয় গোপন রেখেছে।

কৌতূহল উদগ্র হল কেতুচরণের। দেখতে হবে তো লোকটাকে। কালিঝুলি-মাখা হেরিকেনের ক্ষীণ আলোয় এত দূর থেকে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। ভাল করে দেখবার জন্য কাছাকাছি চলে গেল। দেখে, আতরকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা।

সন্ত্রস্ত হয়ে আতরবালা বলে, আঃ, ঝাঁপ খোলা—করেন কি বাবু?

ফিক করে হেসে তারপর সোহাগ করে, আরে আরে ছাড়্—করিস কি মুখপোড়া?

আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে আতরবালা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ করল। কেতু তখন গিয়ে দাঁড়াল একেবারে বেড়ার ধারে। বেড়া ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করছে। চেনা মানুষ যেন। একবারও মুখ ফেরায় না এদিকে—তা হলে নিঃসন্দেহ হওয়া যেত।

হেরিকেন নিভিয়ে দিল এই সময়ে।

২৪

তারপরে কি হল কেতুচরণের--ঘাটে ফিরে এসে ডিঙি খুলে দিল তখনই। কাউকে কিছু বলল না, গোল-পাঁচুকে শুধু সঙ্গে নিয়ে চলল।

গোল-পাঁচু দাঁড়ে বসেছে—নৌকা ছুটেছে বাদার দিকে। দূরের লোক আনবার প্রয়োজন হলে এরকম রাত্রেও তারা বেরোয় কখনো কখনো।

পাঁচু বলে, জঙ্গলমুখো চললে যে? মানুষ কোথা ওদিকে?

কেতুচরণ জবাব দেয়, আছে—

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, কষে টান্ দিকি ভাই। মানুষ আছে বলেই সন্দ করি। চেনা-মানুষ। কপালে থাকে তো দেখতে পাবি।

পাঁচু বলে, সে কথা হচ্ছে না। মেলার মানুষ ধরতে হবে না? আমি বলি কি—পাতালবাড়ির দিকে পাড়ি ধরা যাক। কদিন যাওয়া হয় নি, বিস্তর সোয়ারি পাওয়া যাবে।

কেতু সংক্ষেপে বলে, আজ সোয়ারি ধরব না।

পাঁচু প্রতিবাদ করে, সাত সকালে বাদাবনে গিয়ে উঠবে—সাহস দিনকে দিন বড্ড বেড়েছে। এত বাড় ভাল নয় কিন্তু। পিটেল বাবুরা তক্কে-তক্কে আছে সেই নৌকো-বন্দুক সরানোর পর থেকে। বাগে পেলে আস্ত রাখবে না।

কেতুচরণ কথা কানে নিল না। তর্কাতর্কিও করল না। তর-তর করে নৌকা যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলতে লাগল। এয়ার-বন্ধুরা তার এই রকম স্থিরগম্ভীর ভাব আগেও দেখেছে। সবাই সমীহ করে এই অবস্থা দেখলে। অকস্মাৎ সে যেন বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়ে পড়ে সকলের থেকে।

খরস্রোতে দেখতে দেখতে তারা মর্জাল-স্টেশনে পৌঁছল। অন্ধকার আছে তখনো, আকাশে পোহাতি-তারা জ্বলজ্বল করছে। মর্জাল পার হয়ে আরও এগিয়ে যারা বাদায় ঢুকবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কেবলমাত্র মর্জাল অবধি যাদের গতি, তারা বিষখালির মুখে নৌকা বেঁধে বাঁধের ধারে ধারে পায়ে হেঁটে যায়। হাঁটা-পথে আধক্রোশটাক পথ—অথচ জলপথে পুরো তিনখানা বাঁক ঘুরতে হয় এইটুকুর জন্য। কেতুচরণ কিন্তু বিষখালিতে নৌকা রাখে নি—স্টেশনের ঘাটে পাশাপাশি খান তিনেক তক্তা জুড়ে যে প্লাটফরমের মতো হয়েছে, তারই পাশে এনে লাগাল।

ঘুমুচ্ছে স্টেশনের লোকজন। ঝুলানো লণ্ঠনটা তেল শেষ হয়ে নিভে রয়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে—হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপিয়ে তোলে। মনের মধ্যে ভয়-ভয় করছে এতক্ষণে—কেতুচরণ তাই একটু প্রক্রিয়া করে নিল। ডিঙি থেকে নেমেই মাটিচালক দিল সর্বাগ্রে। মন্ত্রটা ছকড়ির কাছে শেখা। মাটি গরম হয়ে ওঠে

মন্ত্রের তেজে। গুণীন নিজে কিম্বা অপর মানুষ বুঝতে পারবে না—কিন্তু মানুষ ছাড়া আর সকলের পক্ষে এই মাটিতে পা রাখা অসহ্য হয়। ছুটে পালায় তারা উষ্ণ অঞ্চল ছেড়ে। তবে শয়তান জন্তুও আছে—মাটি-চালার আঁচ পেলে তারা জঙ্গলের কাটা-গাছপালার উপর উঠে পড়ে, পালায় না। মাটি ঠাণ্ডা হলে তখন আবার চরে ফিরে বেড়ায়।

তা জন্তু-জানোয়ারেই যখন এত চালাকি জানে, ওঁদের আর কতটুকু মুশকিলে ফেলা যাবে মাটিচালক দিয়ে? মাটির জীব নন ওঁরা—শখ করে একটু-আধটু কখনো বা মাটিতে পা ঠেকান। সেই যে কেতুচরণ সেদিন এই জায়গায় দেখেছিল—সত্যি সত্যি যদি সর্বনাশী হন, কঠিন মাটির উপরে কখনো তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন না। দেখাচ্ছিল ঐরকম। বাতাসে ভেসেছিলেন ভূমির অত্যন্ত কাছাকাছি। মন বোঝে না—রাত্রির এই নিঃশব্দ শেষ-যামে সেদিনের দেখা সেই পরমাশ্চর্য মূর্তির কথা ভেবে প্রাণ বড় চঞ্চল হয়েছে—মন্ত্র পড়ে কেতুচরণ রীত রক্ষা করল। একটুখানি ভরসা পাবার চেষ্টা—আর কিছু নয়।

সকাল হয়ে একে দুয়ে সবাই জাগল। হরিপদ বাবলার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে আসছে। নৌকা দেখে প্লাটফরমে নেমে এলো।

পাশ করতে হবে? তা এইটুকু এক ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছ কোন কর্মে? কটা মাল ধরবে এতে?

কেতু চমকে উঠল হাতকাটা-হরির বীভৎস চেহারা দেখে। কোথায় যেন দেখেছে একে! কোথায়....কোথায়? গলা শুনে আরও সন্দেহ হয়। কিন্তু গোল-পাঁচুর তাহলে তো বেশি করে

চিনবার কথা। সে যখন চিনছে না, হরিপদও না—তখন কেতুচরণেরই ভুল সুনিশ্চিত।

গোল-পাঁচু সহজভাবে কথা বলছে হরিপদর সঙ্গে। চালাকি করে বলল, না রে দাদা, বাদায় যাচ্ছি নে। কাছেপিঠে থাকি আমরা—মৌভোগের মেলায় সোয়ারি বওয়াবয়ি করি। ফাঁক পেলাম এট্টু—শখ করে তোমাদের আপিস দেখতে বেরিয়েছি।

হরিপদ বলে, যাত্রা হবে নাকি শুনলাম মেলায়?

হুঁ, তরশু দিন—

জবাব দিচ্ছে আর কেতুচরণের নজর ঘুরছে এদিক-ওদিকে। স্টেশনের পিছনটায় কসাড় জঙ্গল। জানোয়ারের উৎপাতের ভয়ে পশুর ও গরানের বাতির দু-সারি বেড়া ওদিকে, তার পিছনে মাটির উঁচু বাঁধ। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এই বছর তিনেক আগে একবার বাঘে হানা দেয়। সেই থেকে আর-এক নূতন ব্যবস্থা হয়েছে। মাটি থেকে হাত আষ্টেক উঁচুতে প্রশস্ত মাচা—সেই মাচার উপরেই সরকারি আফিস, ঘেরিবাবু ও অপর লোকজনের শোবার ঘর, রান্নাঘর, উঠান। কারও মাটিতে পা ঠেকাবার আবশ্যক হয় না। মোহানার দিকটায়—পুরাপুরি নয়, খানিকটা অংশমাত্র খোলা। প্ল্যাটফরমে এবং নদীর খোলে নামবার জন্য মই লাগানো আছে ঐ খোলা জায়গা থেকে। কোথাও যেতে হলে নৌকা সম্বল। পদব্রজে খানিকটা বাঁধ ধরে খানিকটা বা নদীর কূল বেয়ে যাওয়া যে যায় না, তা নয়। কিন্তু বিপজ্জনক এই ভাবে যাওয়া। যাতায়াতের বড় একটা দরকারও হয় না—জায়গা কোথায় যাবার? বড়দলের হাট অন্তত পক্ষে বিশ ক্রোশ। আর ক্রোশ চার-পাঁচের মধ্যে মৌভোগে

ঐ নতুন হাটের পত্তন হচ্ছে। হাট কায়েমি হলে তখন অবশ্য বেড়াতে যাবার একটা জায়গা হবে কাছাকাছি।

কেতুচরণ কথা বলছে, তার দৃষ্টি ঐ উপরের মাচার দিকে। উঁচু গলায় কথা হচ্ছিল। যাত্রার কথা উঠতেই লক্ষ্য করল, বেড়া শেষ হয়ে যে জায়গা থেকে মই নেমেছে—সেখানটায় সহসা হাতের একটুখানি বেরিয়ে এল। বেড়া এঁটে ধরে কেউ তাদের দেখছে আড়াল থেকে। সুগৌর নিটোল হাতটুকু—কেতু ধরেছে ঠিকই তবে! আঙুলের আংটি প্রভাত-আলোয় ঝিকমিক করছে। আহা, অমনি আঙুলেই তো আংটি পরাতে হয়!

কেতুচরণ তখন আরও ফলাও করে বলে, নট্ট-কোম্পানির নাম শুনেছ—তারাই। ঢোল-ডুগি নয়—ইংরাজি বাজনা বাজিয়ে তারা পালা গায়। শহর-বাজারের লোক বলে কত সাধ্য-সাধনায় দেখতে পায় না—সেই যাত্রা রায়বাবু বাদাবনে নিয়ে আসছেন। তরশুদিন হবে—পরশুর পরদিন। যেও গার্ডমশায়, চোখ-কান সার্থক হবে।

হরিপদ নিশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের যাওয়া হবে না, আমরা যাবো কেমন করে? মাসের গোড়া—বাবু খুলনেয় চলে যাবেন। আমার উপর ভার থাকবে, আপিস কার উপর রেখে যাবো?

তারপরে সরকারি লোকের যথাযোগ্য ভারিক্কি চালে বলল, খুলনেয় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখে দেখে আসছি। যাত্রাগান তার কাছে লাগে? আমি যাত্রা শুনি নে।

বললাম তো, যেমন-তেমন যাত্রা নয়—

সহসা কেতুচরণের তেষ্টা পেয়ে গেল বিষম। বলে, একঢোক জল খেয়ে যাবো। হেঁকে বলে দাও তো গার্ডমাশায়, খাবার জল দিতে।

যাত্রা শোনার সুযোগ হবে না, সেজন্য এমনই মনটা খারাপ লাগছিল—তার উপর কেতুর এই অভিনব ও আশ্চর্য প্রস্তাবে হরিপদর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, না। জলসত্র বসানো হয়েছে নাকি উঁ? চার দিন জলের বোটের দেখা নেই—নিজেদেরই শুকিয়ে মরতে না হয়। কোন আক্কেলে জল না নিয়ে বেরিয়েছ তোমরা শুনি?

এক লহমা বিদ্যুৎ চমকে গেল উঠানে—মইয়ের মাথায় অবারিত জায়গাটুকুর উপর। আন্দাজে তবে ঠিকই ধরেছে—এলোকেশী। নিশিরাত্রের বউটি ঢুকড়ির গল্পের সর্বনাশী নয়—মতিরাম সাধুর মেয়ে। সর্বনাশী এলোকেশীও। বিপজ্জনক অরণ্য-ভূমে রাতদুপুরে একাকী বেরিয়ে অমন করে দাঁড়াবার মেয়ে এলোকেশীই বটে। এলোকেশী কেতুদের দৃষ্টির সামনে দিয়ে উঠান পার হয়ে বোধ করি ঘরের ভিতর ঢুকল।

অতি কাতর কণ্ঠে কেতুচরণ বলে, দেখি ঠাকরুনকে বলেকয়ে। ছাতি ফেটে যায়—উনি যদি দয়া করেন। মুখ থুবড়ে গাঙের মধ্যে পড়ে যাবো, এমনি ধারা মনে নিচ্ছে।

পাঁচু আশ্চর্য হয়ে গেছে। কেতুচরণ যেমনই হোক, সে অতি-সতর্ক এসব বিষয়ে। খাবার জল এখনো আধ-কলসির উপর নৌকার খোলে। বাদা-রাজ্যে মিঠা জল নিয়ে দুর্ভাবনা—তাই নৌকায় চড়ন্দার নিয়ে ওরা যখন মানষেলায় যায়, ভাল জলের খবর পেলে গোল-পাঁচু কলসি ভরতি করে আনবেই। অথচ কেতুচরণ, দেখ, শখ করে চৌকিদারের কথা শুনছে। কি মজা পাচ্ছে, কেতুই বলতে পারে। কোন রকম মতলব আছে কিনা সঠিক না জেনে সে-ও জল রয়েছে সে কথা চেঁচিয়ে বলতে পারে না।

মই বেয়ে কেতুচরণ উপর-উঠানে গিয়ে উঠল। আছে ভাল সত্যিই এরা—মাটি পায়ে লাগে না।

খাবার জল দেবে ঠাকরুন ?

একপাঁজা বাসন নিয়ে এলোকেশী বেরিয়ে এল। চোখাচোখি হল। কত দিন—ওঃ, কত বছর পরে দেখা! আজকে দৈবাৎ এলোকেশীর ঘরকন্নার মাঝখানে এসে পড়েছে একেবারে।

কেতুচরণ নিচু গলায় বলল, এখানে এত কাছে রয়েছ, তা তো জানতাম না।

এলোকেশীর দ্বিধা হয় এক মুহূর্ত। তারপর সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে উঠানের প্রান্তে কেতুচরণের সামনেই বাসন মাজতে বসে গেল।

ভাল আছ ? খবরবাদ ভাল ? আমায় চিনতে পারছ না বুঝি ?

এলোকেশী মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। ন্যাকড়ায় বাঁধা কি একটা জিনিস নিয়ে এসেছে। এলোকেশী বলে, ওটা কি ?

বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা বাদাবনের পীর-পয়গম্বর তো এঁরা—মনে ভাবলাম, কিছু হাতে করে আসা উচিত।

খড় ও ছাইয়ের মাজনি দিয়ে সজোরে ঘষে ঘষে এলোকেশী কড়াইয়ের কালি তুলছে, আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে—কেতুচরণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

তারপর প্রশ্ন করে, হালদার মশায়ের সঙ্গে বনছে কেমন ? যত্ন-আত্তি করে ?

হুঁ—

কেতুচরণ হি-হি করে হাসে।

এলোকেশী রাগ করে বলে, হাসছ যে?

যত্ন-আত্তির একটা নমুনা এই চোখে দেখছি কি না?

কেতুর কণ্ঠস্বর বেদনার্ত হয়ে উঠল। বলে, শহরে-বাজারে সোনাদানায় মুড়ে খাট-পালঙ্কে বসিয়ে রাখলে যাকে মানাত, বাসন মাজিয়ে কি হাল করেছে তার! তোমার দশা একই রকম রয়ে গেল এলোকেশী। যেমন বাপের বাড়ি, তেমনি এখানে—

এলোকেশী বলে, নিজের সংসারের কাজ আর কে করে দেবে? বাদাবনে লোক আসতে চায়? খোরাক-পোশাক আর আট টাকা কবুল করে খুলনা থেকে এক ঝি আনা হয়েছে, বাতের ব্যথা বলে সে ঠাকরুন বিছানা নিয়েছেন। এখন তারই সেবা করতে হচ্ছে। লোক মেলে না—কি করা যাবে বলো?

তা তুমিই বা বাদাবনে কেন? খুলনায় থাকতে পারতে। অঢেল তো উপরি-আয়! খুলনায় বাসা করে রেখে দিতে পারল না?

তা হলেই হয়েছে! চোখে হারায় যে! কাজকর্মের মধ্যে ঘড়ি-ঘড়ি এসে দেখে গিয়ে তবে সোয়াস্তি পায়।

ফিক করে হেসে ফেলল এলোকেশী। বলে, হল কদ্দিন? তা কম দিন তো নয়! যত দিন যাচ্ছে, ততই আরো ক্ষেপে যাচ্ছে আমায় নিয়ে।

কথাবার্তা শুনে কেতুচরণের মনে সন্দেহ জাগে। ভুল দেখল তবে নাকি সে? লোকটি দুর্লভ নয়? চশমা চোখে থাকলেই দুর্লভ হালদার হবে—এই বা কেমন কথা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল এলোকেশীর দিকে। পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই সে দুর্লভের ভালবাসার কথা বলছে। বলতে বলতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কেতুচরণ।

আচ্ছা, চলি। ম্লান মুখে কেতুচরণ বলতে লাগল, ভারি খুশি হলাম সুখে স্বচ্ছন্দে আছ দেখে। চললাম।

এলোকেশী বলে, জল না খেয়ে যাবে কেন? এই হয়ে গেল আমার—রোসো, হাত ধুয়ে জল দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে কেন? বোসো ঐখানটায়।

কিন্তু বসল না কেতু, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

বাসন ধুতে ধুতে এলোকেশী বলে, তোমার কথা তো কিছু বললে না কেতুচরণ। কেমন আছ, কি করছ?

আমি? একশ'খানা করে কেতুচরণ নিজের কথা বলে। আমি মন্দ থাকতে যাবো কেন? তোফা আছি। গয়নার নৌকা চালাচ্ছি। নৌকা বোঝাই করে মেয়ে-মদ্দ একপাল চড়ন্দার রোজ মৌভোগের মেলায় নিয়ে যাই। চার আনা ভাড়া ফি-জনের। মুনাফাটা কি রকম, তাহলে আন্দাজ করো।

এলোকেশী আবদারের ভঙ্গিতে বলে, আমায় একদিন নিয়ে চলো না মেলায়। আমি দেখি নি।

কেতুচরণ আরও প্রলুব্ধ করে, বরিশালের ভারি যাত্রার দল আসছে। খুব ভাল গায় তারা।

নিয়ে যাবে?

কেতু সবেগে ঘাড় নাড়ল।

না—তোমার মতো ফাঁকিবাজ চড়ন্দার আর নৌকায় তুলব না। কত মেহনত করে জল-কাদা মেখে চিতেবাঘের মতো হয়ে সেই একদিন হালদারের কাছে পৌঁছে দিলাম। দিব্যি ঘর-সংসার জমিয়ে বসে আছে—তা বখশিস-টখশিস কিছু দিয়েছ?

এলোকেশী প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেয়। পাল্টা সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি ঘর-সংসার করেছ?

কেতুচরণ অবাধে মিথ্যা কথা বলে যায়।

একটা নয়—দু-দুটো। শেষের পরিবারটা বড় সুন্দর হয়েছে। টুনি নাম—ছোটখাটো দেখতে, যেন টুনটুনি পাখিটি!

বাদার মেয়ে?

তা ছাড়া কি? তোমাদের মতো শহর থেকে কজন আর আসে এদিকে? বাদা থেকেই বরঞ্চ ছিটকে চলে যায় শহরের পানে।

কৌতূহলী এলোকেশী জিজ্ঞাসা করে, কি রকম সুন্দর তোমার বউ? সবাই তো এখানে মা-কালীর চেলা-চামুণ্ডা। সুন্দর আমার মতো?

কেতুচরণ তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, তুমি আর তেমন সুন্দর কোথায়? সেকালের সেই দেখনহাসি আছ কি তুমি? বুড়িয়ে গেছ। নোনা রাজ্যে রংও কালচে মেরে গেছে।

কিন্তু এমন কথাগুলো এলোকেশীর কানে গেল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। বাসন নিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ক্ষণ পরে বেরিয়ে এল—রেকাবিতে দুখানা তাল-পাটালি আর এক গেলাস জল।

কেতু বলে, আবার মিষ্টি আনতে গেলে কি জন্যে?

শুধু জল দেয় নাকি গেরস্তবাড়ি?

কেতুচরণের মনের মধ্যে পুরানো ব্যথা কাঁটার মতো খচখচ করে ওঠে। এলোকেশী আর দুর্লভ গৃহস্থালী পেতেছে। বেড়ার ওধারে ঘন জঙ্গলে বাঘ বিচরণ করে, কুমির ভেসে বেড়ায় সামনের দিগ্‌ব্যাপ্ত নদীজলে—মাঝখানে এদের লক্ষ্মীমন্ত সুচারু ঘর-সংসার।

পিঠালি-গোলায় তুলোটেপারির ছাপ দিয়েছে চৌকাঠে, অজস্র ছোট ফুলের মতো দেখাচ্ছে। বড় পদ্ম আর কল্কাও এঁকেছে কপাটের উপর। ভারি শৌখিন মেয়ে এলোকেশী—আলপনায় তার চমৎকার হাত।

মিষ্টি খেয়ে গেলাসের জল ঢকঢক করে মুখে ঢেলে কেতুচরণ বলে, চলি এবার। কিন্তু বখশিস শুধু এই পাটালিতে শোধ না যায়।

আবার এসো। একা-একা থাকি, পুরানো চেনা একটা মানুষ—

কেতুচরণ দরজার কাছে ন্যাকড়ার পোঁটলাটা নিয়ে রাখল। এলোকেশী তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সেটা খুলছে।

কি ভেট নিয়ে এসেছ, দেখি—

কেতুচরণ হেসে বলে, সন্দেশ। খুলনার গোলোক ময়রার দোকানের।

হ্যাঁ—সন্দেশ না আরো-কিছু! এ কি, জুতো এমনি করে জড়িয়ে নিয়ে এসেছ—কার জুতো?

কেতুচরণ বলে, দেখ তো—চিনতে পার কিনা?

ভারি চাপা মেয়ে এলোকেশী। কে কি মতলবে ঘুরছে, ভাল করে না বুঝে ধরা দেবে না। মহকুমা-শহরে সেই বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাবার ফল হয়তো। মুখের উপর এতটুকু ভাববিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না।

কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলে পুরানো জুতো?

কেতু বলে, চিনতে পারো কার?

না—

তবে আর শুনে কি হবে? সে আমলে দুর্লভ ম্যানেজার কিন্তু লপেটা জুতো পরত এইরকম।

এখন সংসারি মানুষ—এত বড় আপিসের ঘেরিবাবু। এখন পরেন বুটজুতো আর সাহেবি প্যান্টালুন।···তুমি শখ করে কিনেছ বুঝি? না—এ তোমার পায়ে হবে না তো!

কেতুচরণ বলে, একজনের ছাঁচতলায় পেয়েছি। রেখে দাও এলোকেশী, হালদার মশায়ের পায়ে যদি খেটে যায়। আমি রেখে দিতাম লোহার তৈরি হলে। এ চামড়ার জুতো—আমাদের পায়ে ঢুকোতে গেলেই ফেটে যাবে।

হি-হি করে কেতুচরণ হাসতে লাগল। বলে, আমাদের বাসার ঠিক পাশে পাড়া বসেছে। হরেক মজা চোখে দেখি, হরেক সোহাগ কানে আসে। চশমা-পরা একজন এসেছিল কাল। প্রায়ই নাকি আসে, সকলে বলল। মাগীটার নাম আতর হবে বোধ হয়—তা শুধু আতরে তার সুখ হয় না—কখনো ডাকছে আতরবালা, কখনো আতরবাসিনী। ঘুমোবার জো নেই ওদের ভালবাসার গুঁতোয়।

খড়মের খটখটি শোনা গেল আফিস-ঘরের দিকে। কেতুচরণ জিজ্ঞাসা করে, কে?

উনি—আবার কে?

কেতু বলে, বাসায় আছেন হালদার মশায়?

যাবেন কোথা? স্টেশনের সমস্ত ঝক্কি ওঁর মাথায়—এক-পা নড়বার জো আছে?

রাত্তিরেও ছিলেন?

ছিলেন বই কি!

সহসা কঠোর কণ্ঠে এলোকেশী বলে ওঠে, চলে যাও তুমি কেতু—

কেতুচরণও দুর্লভের মুখোমুখি পড়তে চায় না। বিশেষ করে এলোকেশী যখন থাকে, সেই সময়ে। এলোকেশীর ঝাঁকিতে পড়ে

নৌকা বেয়ে মরেছিল—সেই একদিনের কথা মনে পড়ছে। লাঠি-খাওয়া কুকুরের মতো কেতুচরণ পালিয়েছিল সেদিন ছুজনের সামনে থেকে। ভাবতে গেলে গা রি-রি করে ওঠে। দ্রুত সে নেমে গিয়ে ডিঙিতে উঠল।

গোল-পাঁচুকেও দেখা গেল অতি-গম্ভীর—সে একটি কথা বলল না। কথা বলতে মন নেই কেতুচরণেরও। নিঃশব্দে তারা নৌকা ছেড়ে দিল।

•

কেতুচরণের আড়ালে এলোকেশীর মুখ ভ্রূকুটিমলিন হল।

হরিপদ!

খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল—সে মানুষ ছুর্লভ হালদার নয়, হরিপদ।

বাবু কাল কোথায় গেছেন—ঠিক করে বলো তো হরিপদ?

হরিপদ বলে, সুপতি-স্টেশনে রেঞ্জার সাহেবের কাছে। খুব হরিণ মারছে ওদিকে—মাংস-টাংস খেয়ে রাত হয়ে গেল, তাই বোধ হয় এসে পৌঁছতে পারেন নি।

হুঁ—

এক্ষুনি এসে যাবেন। না এসে উপায় আছে? কালকে রিপোর্ট ছাড়তে হবে, এখনো তার কিচ্ছু হয় নি।

২৫

দুর্লভ ফিরে এলে পরম শান্তভাবে জুতোজোড়া এনে এলোকেশী তার সামনে রাখল।

দেখ তো পায়ে হবে কিনা?

দুর্লভ স্তম্ভিত।

ফিক করে হেসে এলোকেশী বলে, কোথায় পেলাম জিজ্ঞাসা করলে না তো?

শুষ্ক গলায় দুর্লভ তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে। কোথায় পেলে?

ফেলে গিয়েছিলে বাসায়। খালি-পায়ে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে। তোমার মনে নেই।

বলে দ্রুত সে শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল।

পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আর তো সন্দেহমাত্র নেই। দুর্লভ খালি-পায়ে ফিরেছে। মৌভোগের মেলায় জুতার দোকান নেই—তাহলে নতুন একজোড়া নিশ্চয় কিনে আনত।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে তারপর আয়না পেড়ে নিয়ে এল দেয়াল থেকে। দেখছে নিজেকে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরীক্ষা করে দেখছে। ডাক্তারি ছাত্র ছুরি দিয়ে চামড়া চিরে চিরে অস্থি-সন্ধি দেখে—শাণিত দৃষ্টি দিয়ে তেমনি করে দেখছে। রোজ

মুখ দেখে থাকে—আজকেই উপলব্ধি হল, সেই কিশোর বয়স থেকে আলাদা হয়ে গেছে কতখানি! কান্না পাচ্ছে না তার, ভয় করছে। ভয়ে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। খোলা চুলের রাশি কাঁধের উপর দিয়ে সামনে এনে দু-হাতের আঙুলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেখে। বুক ঢিব-ঢিব করে—শাদা চুল বেরিয়ে পড়বে না তো? সন্দেহ বশে ছিঁড়েও ফেলল দু-এক গাছি। জানলায় রোদের দিকে নিয়ে দেখে। চিকচিক করছিল বটে—কিন্তু না, শাদা নয়—কালোই।

চোখ···দুর্লভ একদিন বলেছিল, চোখে তোমার ঝিলিক দেয় এলোকেশী। এমনি কত আজব কথা বলত মানুষটা। চোখের সে আলো স্তিমিত এখন। দু-ঠোঁটে হাসি লেগে থাকত—স্থির-গম্ভীর সেই ঠোঁট দুখানি আঁটা থাকে এখন প্রতিনিয়ত। হাসো এলোকেশী দেখনহাসি, চেষ্টা করে হাসোই না! হাসো দিকি—

আয়নায় তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে এলোকেশী। হাসতে পারে সে···· কেন পারবে না? কি হয়েছে তার? বয়ে গেছে—সাত পাকের বউ তো নয়—পাল্টা শোধ নিতে সে-ও জানে।

ময়লা হয়ে গেছে গায়ের রং। সে চিক্কণতা আর নেই নোনা রাজ্যে এসেছে বলে। বয়স হয়েছে—সেজন্যও বটে। কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে—ছবির মতো তার যে নিটোল মুখখানি, রাগ করে কে চিরে চিরে দিয়েছে সেই মুখ! কিশোরকালের কোরক-উন্মেষ—কত কৌতুক, কত কৌতূহল, মনে মনে কত অনুরাগ! একটা তুলনা মনে আসে এলোকেশীর। দিনান্তে কাল-কপাটি যেমন পাতা বন্ধ করে, তার সর্বদেহের রূপ তেমনি মুদিত হয়ে আসছে একসঙ্গে।

সাজতে বড় সাধ হল অকস্মাৎ। শুধু সাধ নয়—প্রয়োজন। পিতলের রেকাবে সকাল বেলাকার ফুল রয়েছে। বেড়ার কাছে নদীর কূলে অজানা গাছে লতায় নানা রঙের ফুল ফোটে। ফুল বড় ভালবাসে এলোকেশী। হরিপদকে বলা আছে, ঝি কালিদাসীও জানে—সুবিধা পেলেই তারা ফুল এনে দেয়। এখন এই পড়ন্ত বেলায় খিল-আঁটা ঘরে আয়না নিয়ে একটা-একটা করে সমস্ত ফুল সে খোঁপার চারিদিকে গুঁজল। পাউডার মাখতে গেল—মুখের উপর জালের মতো রেখাগুলো ঢেকে দেবে গোলাপি পাউডারে। আগে যে লাবণ্য ছিল—দেখা যাক, তার কতকটা আনা যায় প্রসাধন-নৈপুণ্যে। কিন্তু খালি কৌটা—পাউডার ফুরিয়েছে, এক কণিকা অবশিষ্ট নেই। কোন একবার খুলনা যাবার মুখে বলে দিলে দুর্লভ নিশ্চয় এনে দিত—এ বিষয়ে তার কৃপণতা নেই। কিন্তু খেয়াল ছিল না এলোকেশীরই। সাজসজ্জা সে বড় একটা করে না ইদানীং। জঙ্গলপুরীতে রয়েছে—শহরে বাজারে তো নয়—সজ্জার কি দরকার এখানে? সেজেগুজে রূপ দেখাবে সে কাকে? এমনি ধরনের এক অবহেলার ভাব ছিল মনে মনে। দুর্দিন যে এমনি ঘনিয়ে এসেছে, তা কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে?

পোর্টম্যান্টো খুলে রঙিন বোম্বাই-শাড়িখানা পরল সে ফেরতা দিয়ে। ওরই জুড়িদার রঙিন ব্লাউজ চড়াল একটা গায়ে। জুত হল না—বড় ঢিলেঢালা—আয়নায দেখে পছন্দ হয় না। খুলে ফেলল। সারা বাক্স হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে অবশেষে বের করল আর-একটা। সাধারণ ছিটের ব্লাউস, কিন্তু আঁটোসাঁটো। এই সে চাচ্ছিল। অনেকদিন আগেকার—যৌবন যখন বিকচোন্মুখ—সেই সময়কার

জিনিস এটা। সেদিনের মাদকতার ছোঁয়াচ যেন লেগে আছে এর সঙ্গে। আয়না এপাশ-ওপাশ করে দেখে। সেদিনের নিটোল অঙ্গশোভারও যেন আদল আসে ব্লাউসটা পরে।

অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দুর্লভ ও হরিপদ ফুসফুস-গুজগুজ করছিল। হরিপদ সরে গেল। দুর্লভ রক্তদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। ভেবেছিল, প্রসাধনে হতবাক্ হয়ে যাবে দুর্লভ—সুড়ুত করে পাশে এসে বসবে। আর এলোকেশীই সরিয়ে দেবে বাঁ-হাতের ধাক্কা মেরে। ধাক্কা খেয়েও আবার ঘনিয়ে আসবে পোষা-কুকুরের মতো। এমন কতবার হয়েছে। শাস্তি দেওয়ার এই তার এক কঠোর প্রক্রিয়া। দুর্লভ ক্ষেপে যায় যেন এই প্রৌঢ় বয়সেও।

কিন্তু আজকে গতিক উল্টা। দুর্লভ জিজ্ঞাসা করে, জুতো পেলে কোথায়?

বলব না—

চোখ পাকিয়ে দুর্লভ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বলো—

যেখানে ফেলে এসেছিলে, সেইখানে।

তবে রে!

ছুটে এলো সেই জুতোর এক পাটি উদ্যত করে। এলোকেশী কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল!

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জুতোর পাটি কুড়িয়ে দুর্লভ পটাপট মারছে।

নষ্ট মেয়েমানুষ....জানি তোর চরিত্তির। মেলার মানুষ আসা-যাওয়া করে আমি যখন না থাকি। হারামজাদা রায়-বাবু দূত পাঠায়। কি করে খবর পেয়ে গেছে। বেটা রাঘব-বোয়াল—

ভাল মাল দেখলেই নোলায় জল আসে। সেটা হচ্ছে না। আবাদ তার এলাকা—বাদাবনে কারো এস্তাজারির ধার ধারি নে। দরজায় ডবল তালা দিয়ে আটকে রেখে যাবো, আমি এসে তবে তালা খুলব। ঘর-সংসার তোকে দিয়ে কিচ্ছু করাব না নচ্ছার মাগী। রাত-দিন চৌপহর আটক রেখে সায়েস্তা করব—হ্যাঁ।

এবং মুখের কথা মাত্র নয়—টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ফেলল ঘরের ভিতর। মেঝেয় ফেলে লাথি কষিয়ে দিল একটা। গৌর অঙ্গে জুতার দাগ কেটে কেটে বসেছে। পরনের পুরানো বোম্বাই-শাড়ি শতছিন্ন হয়ে গেছে—ব্লাউসটাই রয়েছে শুধু আঁটা। এলোকেশীও চুপ করে নেই, মুখে যাচ্ছেতাই করে বলছে।

লাথি মেরে দুর্লভ চলে যাচ্ছিল—গালির জবাব দিতে ফিরে দাঁড়াল। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। এলোকেশী কিল মারছে তার মুখে-বুকে গুমগুম করে। পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কিন্তু শক্ত বাঁধনে এঁটেছে দুর্লভ। বয়সে দেহ নুয়ে এসেছে, কিন্তু দৈত্যের বল যেন গায়ে ··

গলার স্বর এখন একেবারে আর একরকম।

কাল খুলনেয় যাচ্ছি মাইনে-পত্তোর আনতে। ভাল জর্জেট শাড়ি কিনে আনব তোমার জন্যে। আর কোন-কিছুর দরকার থাকে তো বলে দিও।

এবং দরজায় তালা দেবার কথা—কিন্তু দিল না চলে যাবার সময়। মনে ছিল, কিন্তু তালা আটকাবার ইচ্ছে হল না এর পর।

২৬

মিথ্যা স্তোক কিংবা আদরের মুহূর্তের প্রলাপোক্তি মাত্র নয়। খুলনায় যাবার সময় দুর্লভ জিজ্ঞাসা করে, কি চাই তোমার বলো?

মারে এবং বাহির-ফটকা দোষও আছে। তা সত্ত্বেও ভালবাসে সে এলোকেশীকে। ভালবাসে বলেই মারে। মেদলেশহীন শির-ভেসে-ওঠা চেহারা ও প্রৌঢ়ত্বে-পৌঁছে-যাওয়া বয়স—কোনটার উপর দুর্লভ ভরসা রাখতে পারে না। পাখি কখন উড়ে পালায়—তাই জবরদস্তি করে খাঁচায় আটকে রাখছে। রওনা হবার মুখে হরিপদকে সতর্ক করে যায়, দুটো দিন বাসায় থাকব না—বুঝলি রে, কেউ যেন বাসায় না ঢোকে। হোন না তিনি গুরুঠাকুর—অফিস থেকেই ধুলো-পায়ে বিদেয় করে দিবি।

আবার একবার ঘরের মধ্যে ঢুকে মোলায়েম কণ্ঠে এলোকেশীকে জিজ্ঞাসা করে, কাগজে ফর্দ করে দাও, বুঝলে, কি-কি আনতে হবে। লিখে না দিলে কোনটা আনতে কোনটা আনব না—তুমি দুঃখ করবে শেষটা।

মধুসূদন রায় অঘটন ঘটিয়েছেন। যাত্রার আসর কে বলবে—বাদাবনের মধ্যে ইন্দ্রলোক বসেছে। এমন আলো-বাজনা, গান-একটো, রাজা-রানী-রাজকন্যার সাজসজ্জা মানবেলার মধ্যেই বা

কজনে দেখে থাকে? মধুনগরে আবাদ করতে গিয়ে বিস্তর লোকসান দিয়েছেন—সেই দুঃখ ঢাকবার জন্যই কি এত বাড়াবাড়ি? জনপদ এগিয়ে এসে তবু তো এতদূর—এই লা-ভাঙার মোহানা অবধি বনভূমি দখল করে নিয়েছে, তারই যেন বিজয়োৎসব। জয়ের কথাটাই শুধু উজ্জ্বল হয়ে থাকুক লোকের মনে, মধুনগরে তাঁর ব্যর্থতা ভুলে যাক। খালপারে বনবিবিতলার দিকে রাত-বিরেতে এখনো বাঘে হামলা দেয়, গাছে গাছে বানর নাচে। আজ রাত্রে উৎসব-কোলাহলে ওপারের সেই-আদি-বাসিন্দারা ভয়ে সরে পড়েছে—ভয়ে এবং পরাজয়ের অপমানে।

যাত্রার আসরে মধুসূদন নেই। আগে যে-কোন অনুষ্ঠানে তিনি সকলের সঙ্গে মিশতেন। ইদানীং ব্যবধান গড়ে তুলেছেন, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বেরোন না তিনি। নানা রকম রটনা এ নিয়ে। সন্ধ্যার পরে নাকি খাড়া হয়ে দাঁড়াবার অবস্থাই থাকে না—বেরোবেন তিনি কি করে? কেউ বলে, জমাজমির ব্যাপারে মন-কষাকষি আছে ভালমন্দ নানা মানুষের সঙ্গে—ঠিকই করেছেন—ভাল করে বুঝে-সমঝে তবে বাইরে ঘোরা উচিত। আবার এমনও বলাবলি হয়—মধুনগরের ব্যাপারে অত টাকা গচ্চা দেওয়ার পর কিচ্ছু ভাল লাগে না—চুপচাপ থাকেন তিনি কাছারির চৌহদ্দির মধ্যে।

সত্যি, এই তাঁর সুবৃহৎ পরাজয়। কিছু দক্ষিণে মধুসূদন নতুন এক আবাদের পত্তন করছিলেন, তার নামকরণ অবধি হয়েছিল—মধুনগর। যথানিয়মে কাজ হচ্ছিল। বাঁধবন্দি করে জঙ্গল কাটা হল—তিন বছর পর পর জঙ্গল কেটে ধান ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একটি ধানের অঙ্কুর উঠল না—জঙ্গলই জেঁকে উঠল আবার।

পরের বছর কোদালি দিয়ে একটা একটা করে সকল গাছের গোড়া তুলে দিলেন, মাটি তুলে আবার নতুন এক ঘেরি দিলেন পুরানো বাঁধের উপর আস্থা রাখতে না পেরে। ফলের কিন্তু ইতরবিশেষ হল না। ধানের কোন চিহ্ন নেই, জঙ্গলে ভরে গেল আবাদের খোল।

মুষড়ে গেলেন মধুসূদন, সুকুমারকে চিঠি দিলেন আসবার জন্য। বাল্যবন্ধু সুকুমার—কৃষি ও ভূতত্ত্ব নিয়ে নানারকম গবেষণা করে, টাকাওয়ালা মানুষ। কিন্তু মধুনগরের এ ব্যাপার একজন সামান্য চাষাও বুঝিয়ে দিতে পারে। চাষাভূষোর কথা মধুসূদন বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু সুকুমার এসেও ঠিক সেই কথা বলল। আবাদ করা অসম্ভব এ জায়গায়। মাটি এখনো সুদীর্ঘকাল লোনা থাকবে। বাঁধ এবং নতুন ঘেরি বরঞ্চ কেটে দেওয়াই উচিত—নদীজলের তরঙ্গ অবাধে খেলা করে বেড়াক। কোথাও জলে ডুবে থাকবে, চর জাগুবে কোথাও। আরও অনেককাল পরে পলি পড়ে পড়ে নদীর কুক্ষিমুক্ত হবে জায়গাটা; মাটির নুন ধুয়ে ধুয়ে নদীস্রোতের সঙ্গে চলে যাবে। মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি খাটবে সেই সময় থেকে। তার অনেক দেরি—কত দিন কত বৎসর হিসাব করবার জো নেই। সমস্ত গাঙের মরজির উপর নির্ভর করছে।

মধুসূদনের দম্ভ ভেঙেছে। সেই তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন, বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত অবধি গাছের একটি সবুজ রেখা খাড়া থাকতে দেবেন না; কিন্তু মানুষের ইচ্ছার সর্বময়ত্ব কোথায়? নদী-সমুদ্র কবে অবহেলায় উচ্ছিষ্ট ত্যাগ করে যাবে, সেই দিন অবধি অপেক্ষা না করে উপায় নেই। পোকা-মাকড়ের বাড়বৃদ্ধি হয় উচ্ছিষ্ট আবর্জনায়—মানুষের বেলাতেও অবিকল তাই। এত অসহায়

ও অকর্মণ্য তাঁরা জল-জঙ্গলের কাছে। যত ভাবছেন, মধুসূদনের মন রি-রি করে অপমানের বিষে।

রায়গ্রামে বহু জনে সহানুভূতি দেখাতে আসত। মধুসূদন আবিষ্কার করলেন—মুখে তারা দরদের কথা বলে, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে হাসাহাসি করে তাঁর আহাম্মুকির জন্য। রায়গাঁয়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল—সেই থেকে মৌভোগে পড়ে থাকেন অধিকাংশ সময়। এখানে প্রায় সবাই প্রজাপাটক—সমশ্রেণীর কেউ নেই। দরকারের সময় হাত কচলে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ায়, দরদ দেখাবার দুঃসাহস করে না। শুধু এই কারণেই কাছারিবাড়িতে তিনি একরকম পাকাপাকি এসে উঠেছেন।

পনের-বিশ বিঘা জমি মাটির পাঁচিলে ঘেরা—বিচালি-ছাওয়া সরু চাল বরাবর চেলে গেছে পাঁচিলের উপর দিয়ে, বৃষ্টির জলে মাটির গাঁথনি যাতে ধ্বসে না পড়ে। পাঁচিলের ভিতরে মূল-কাছারি, শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়াল, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি মিলে খান আষ্টেক ঘর। ধান তোলবার তিনটে বড় খোলাট—খোলাটের ধারে ধারে সারবন্দী গোলা। ধান কেটে এনে গাদা দিয়ে রেখেছে চতুর্দিকে—মলন-ডলনের পর ধান গোলায় তুলবে। লোনা জায়গায় বিচালি অল্পে খারাপ হয়ে যায়—বিচালির ভরা তাই অগৌণে রওনা হয়ে যাবে দূর অঞ্চলে বেচে দিয়ে আসবার জন্য।

কি নেই রায়বাবুর কাছারিবাড়ি? সব্জি-ক্ষেতে লাউ-কুমড়ো, মূলো-পালং, আলু-পেঁয়াজ, এমন কি কপি-টম্যাটোরও চাষ হচ্ছে। পুকুর আছে, এবং খালের খানিকটা বেঁধে ফেলে ঝিল তৈরি করা হয়েছে। মাছ যেন জিয়ানো রয়েছে সেখানে—

যখন যে জায়গায় খুশি এক ক্ষেপ জাল ফেলে খাবার মাছ তুলে নাও।

মধুসূদনের একটা আলাদা ঘর। তিনি যখন না থাকেন, এ ঘর তালাবন্ধ থাকে। মাটির দেয়াল খড়ের চাল এ ঘরেরও বটে, তবে দেয়ালে গিরিমাটি গুলে রং করা। মাটির মেজে যদিচ—মেঝের সর্বত্র সরু-কাঠির সপ বিছানো গালিচার কায়দায়। নানা আসবাব—খাট, ইজিচেয়ার, আলমারি, আয়রনসেফ। বেলোয়ারি-ঝাড় ঝোলে আড়া থেকে। কিন্তু বিশেষ উৎসব-সমারোহ ভিন্ন ঝাড়ের আলো জ্বালা হয় না।

সেই ঘরের মধ্যে একলা মধুসূদন। রেড়ির তেলের বড় একটা প্রদীপ মাথার দিকে—ইজিচেয়ারে শুয়ে তিনি একটা ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন। আর টিপয়ের উপরের কাচের গ্লাস থেকে চুমুক দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

দরজা ভেজানো ছিল—মৃদু করাঘাতে খুলে গেল। ঘাড় না তুলেই মধুসূদন ডাকলেন, আয়। এর মধ্যে হয়ে গেল?

টিকে সর্দার পাখির মাংস কড়া-ঝালে রেঁধে আনবার জন্য বাড়ি গিয়েছিল। মধুসূদন বললেন, সুকুমার ঘুমুলো কিনা দেখ্। তাকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

চুড়ির আওয়াজে এমনি সময় চকিত হয়ে তিনি মুখ ফেরালেন। টিকে নয়—এলোকেশী। রূপ-বিভায় যেন জ্বলছে। চিনি-চিনি করছেন মধুসূদন—ঠিক ধরতে পারেন না। প্রশ্ন করলেন, কে তুমি?

আস্তে কথা বলুন রায়বাবু। পাইক-পেয়াদারা রয়েছে দেউড়িতে।

কেউ নেই। সবাই যাত্রা শুনতে গেছে। শুধু মাত্র দুটো দারোয়ান। আর আমাদের সুকুমার এসেছে কলকাতা থেকে—খাজাঞ্চি-ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

মধুসূদন মৃদু হাসলেন এলোকেশীর দিকে চেয়ে। আবার বলেন, দরোয়ানরা দেখেছে তোমায়। মেয়েমানুষ বলেই ঢোকবার সময় বাধা দেয় নি। মেলার মচ্ছবে, ভেবেছে, বাবুর ফরমায়েসি কেউ হবে। কিন্তু কে তুমি, চিনতে পারছি নে তো—

এলোকেশী বলে, কাঁচা বয়স ছিল তখন—তা এখনো একেবারে বুড়িয়ে যাই নি। দেখুন না।

মাথার কাপড় ফেলে দিল।

বলে, পারেন এবার চিনতে? বদলে গেছি, মোটা হয়ে গেছি একটু—না? আপনার বাবু সামনের কয়েকটা চুল পেকেছে—তা ছাড়া কিন্তু তেমনি একহারা চেহারা আছে।

প্রদীপের কাছে এগিয়ে এলো এলোকেশী।

সলতে পুড়ে গেছে বাবু—পিদ্‌দিম নিভে যাবে এক্ষুনি। ছেঁড়া কাপড় দিন না, সলতে পাকিয়ে দিই।

মধুসূদন শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। লঘুপক্ষ পাখির মতো এলোকেশী যেন উড়ে বেরিয়ে গেল। নিজেই খুঁজেপেতে এক ফালি ন্যাকড়া নিয়ে এল। মেজেয় বসে পড়ে হাঁটুর কাপড় তুলে এবারে সে সলতে পাকাচ্ছে।

মধুসূদন নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দেখলেন। সহসা কঠিন কণ্ঠে বললেন, কি মতলব তোমার বলো—

আপনার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিতে এসেছি রায়বাবু। সেই

তখনই দিয়ে দিতাম। কিন্তু জানেন তো—চলে গেলাম তারপরেই—গয়না দেবার ফুরসত হল না।

তোমায় একেবারে দিয়েছি—গয়না আর ফেরত চাই নে।

সত্যি সত্যি তো দেন নি। আমিই কেঁদে-কেটে ভিখারির বেহদ্দ হয়ে নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার কান্নায় আপনি দয়া করে সায় দিয়েছিলেন পুলিশের কাছে। ঐ রকম যদি না বলতেন, পুলিশ আমাদের কি সহজে ছাড়ত?

একটা নতুন খবর মধুসূদন ব্যক্ত করলেন।

শুধু মুখের কথায় ছাড়ে নি, নগদ টাকাও খসাতে হয়েছিল।

বলেন কি?

মেজে খুঁড়ে দশের মুকাবেলা মাল বের করল—নিতান্ত দু-পাঁচ টাকায় এত বড় কেস ফাঁসানো যায় না, সেটাও মনে রেখো—

এলোকেশী বলে, তবেই দেখুন। আপনি এত করলেন আমার জন্য, তার উপর ফাঁকি দিয়ে গয়না নিতে পারি? বাবাকে জানেন তো—ঐ মানুষের হাতে না পড়ে সেজন্য গয়নাসুদ্ধ পালিয়েছিলাম। কিন্তু ইচ্ছে করে মনের সঙ্গে আপনি দেন নি, আমিও নিই নি।

মধুসূদন ব্যঙ্গের সুরে বলেন, ফিরিয়ে দেবার ধর্মজ্ঞানটা এলো এত বছর পরে?

জলে-জঙ্গলে কাঁহা-কাঁহা মল্লুক করে বেরিয়েছি, কাছে-পিঠে কোথায় পেলাম আপনাকে রায়বাবু? এতকাল পরে এক মাঝির কাছে আপনার খবর শুনলাম—শুনতে পেলাম, জাঁকজমক করে হাট বসাচ্ছেন। ফাঁক বুঝে অমনি এসেছি। নৌকো নেই—তা বাঁধ ধরেই হাঁটলাম। কত কষ্ট হয়েছে ভাবুন তো! দুর্লভ খুলনা চলে গেছে, তাই সুবিধা হয়ে গেল।

ফিরে এসে কিছু বলবে না ?

বলবে না আবার ! তেমনি পাত্রই বটে আপনার ম্যানেজার। কিন্তু এ ছাড়া পথও আর-কিছু চোখে পড়ল না—

এলোকেশী বিরক্ত হয়ে উঠেছে এইসব মন্থর সাংসারিক কথাবার্তায়। বোতলের পাশে গয়নার পুঁটলি রেখে দিল। বলে, রইল তবে বাবু—

গলায় আঁচল বেড় দিয়ে দূর থেকে সে প্রণাম করল। মধুসূদনের মন কেমন করে উঠল এতক্ষণে।

সত্যিই ফেরত দিলে এলোকেশী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আসরে যাচ্ছি আমি—গান ভারি জমেছে।

দুর্লভ অনেক গয়না দিয়েছে বুঝি তোমায়—আর দরকার নেই ?

হ্যাঁ, অনেক—

ফিক করে হাসল এলোকেশী। হেসে ফিরে দাঁড়াল।

দেখবেন ? এই—এই দেখুন না, গলায় পিঠে বুকে রাঙা-রাঙা কত সব গয়না—

নিদারুণ মার মেরেছে পশুটা—নিটোল অঙ্গে কেটে কেটে দাগ হয়ে আছে। প্রণাম করে সে চলে যাচ্ছে—মধুসূদনের বুকের মধ্যে অনেক কালের এক অবসন্ন ক্ষুধা জেগে ওঠে। বাঘ যেমন শিকারের উপর ঝাঁপ দেয়—না, ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন না প্রবীণ মধুসূদন রায়—ব্যাকুল আগ্রহে ডাক দিলেন, শোন—

এলোকেশী ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি হল ?

গয়নাগুলো একটা-একটা করে আমি গায়ে পরিয়ে দেবো। দেখি, তাতে কি রকম বাহার খোলে ? দেওয়া-জিনিস আমি ফেরত নিই নে।

তবে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে নেন না বাবু—

খিল-খিল করে এলোকেশী হেসে উঠল। মধুসূদন তাকিয়ে রইলেন। হাসছে কেবলই। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়।

আপনার ম্যানেজার ভাঁওতা মেরেছিল। মিথ্যে বলে ঠকিয়েছে আমায়। কি চেয়েছিলাম, আর এ কি হল! টাকাকড়ি তালুক-মুলুক সোনাদানার লোভ দেখিয়েছিল। কিছু পেলাম না রায়বাবু, তার মনটাও পাই নি।

মধুসূদন পুঁটলি খুলে নিঃশব্দে গয়না হাতে দিচ্ছেন, এলোকেশী পরছে। পরা শেষ হলে দরজায় ঠেশান দিয়ে একটু বাঁকা হয়ে সে মধুসূদনের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলে, আপনার সামনে ভয় করে—বুঝি চোখ দিয়ে টেনে বের করে নেন মনের তলার খবরাখবর। তা গোপন আমার কিছু নেই। মা অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষটা বাবার কাঁধে জুটেছিল। সেখানেও সুখ ছিল না—মরে বেঁচে গিয়েছে। আমার অদৃষ্টেও সেইরকম। সুখ চেয়েছিলাম, মানুষজন ঘর-সংসার আমোদ-স্ফূর্তি চেয়েছিলাম—কপাল এমনি, জঙ্গলের মধ্যে কয়েদি হয়ে আছি। কোথায় যাবো, কি করবো ভেবে পাই নে। কে আশ্রয় দেবে আমাকে?

আর যে পারে দিকগে—আমি নই কিন্তু। আমারও ভিতর ফোঁপরা। রাত্রিবেলা হঠাৎ এসে পড়েছ—সামলাবার সময় পাই নি—তাই ক-গাছা চুল দেখতে পেলে। দিনমানে কলপ দিয়ে সেরে সামলে বেড়াই। দাঁতের পাটি, দেখতে পাচ্ছ, ঝিকমিক করছে—বিলকুল বাঁধানো। তেমনি উঠোনে ঐ যে গোলার সারি—কোনটার ভিতরে বস্তু নেই। যা-কিছু ছিল, আট বছর ধরে

মধুনগরে ঢেলেছি। সমস্ত গেছে। মধুসূদনবাবুও যাবে... এবার—

খাড়া হয়ে বসে ম্লান হেসে মধুসূদন গ্লাসে চুমুক দিলেন একবার। বললেন, না গিয়ে উপায় নেই। তুমি অনেক ঠকেছ—আবার তোমায় আমি ঠকাতে যাবো কিসের লোভে? সুকুমারকে অনেক বলেকয়ে খোশামুদি করে নিয়ে এসেছি, দেনাপত্তোরের ভার নেয় তো সে-ই এখানকার মালিক হয়ে বসবে। কাগজপত্র দেখছে। সে না নেয় তো অপর কেউ আসবে। আমি আর বেশি দিন নেই মোটের উপর। কিছু নেই আমার। একেবারে কিছু নেই তা-ই বা বলি কেন, ঐ যে শুনলে—একরাশ দেনা আছে। গয়না কখানা তোমার কাছে ছিল, তাই বজায় আছে—আমার কাছে থাকলে কবে এদ্দিনে বন-কাটায় খতম হয়ে যেত!

এ ধরনের কথা কেউ কখনো শোনে নি মধুসূদনের মুখে। এলোকেশী স্তম্ভিত হল। মধুসূদন তার দিকে পলক মাত্র না চেয়ে বইটা আবার খুলে নিলেন। পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছেন, এমনি ভাব। কি আছে বইয়ের ভিতর—এলোকেশীর যেটুকু বিদ্যা, তাতে বুঝবার শক্তি নেই। মলাটের ছবিটা দেখছে—ঘন জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে এক-পেয়ে সরু পথ পড়েছে। মনে হল, মধুসূদন সমস্ত বিপদ ও ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে ঐ পথ বেয়ে অনেক দূর চলে গেছেন। সে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে একটিবার তাকিয়েও দেখলেন না।

আরও খানিক দাঁড়িয়ে এলোকেশী বাইরে এল। ধীরে ধীরে চলেছে দীর্ঘ দাওয়া অতিক্রম করে। ক্ষীণ চাঁদের আলো চালে আটকে পৌঁছতে পারে নি—আবছা অন্ধকার সেখানটায়।

এ কি ?

সবাই যাত্রার আসরে, সেই ফাঁকে···চোর-ডাকাত নাকি তুই ? কি মতলবে এসেছিলি ?

হাত ছাড়ুন—

বেশ—

হাত ছেড়ে দিয়ে সেই হাতে এলোকেশীর পিঠ বেড় দিয়ে ধরল। এলোকেশী রাগ করে উঠে, দাওয়ায় পেয়ে এ সমস্ত কি বাবু ?

দাওয়া বলে দোষ হচ্ছে ? ঘরে চল্ তবে—

সেই কলকাতার ভদ্রলোক—সুকুমার। স্নিগ্ধার কলকাতায় বিয়ে হয়েছে—এদেরই কারো বউ সে এখন। পায়ে ধুলোর কণিকা লাগে না, পালঙ্কে বসে হুকুম-হাকাম দিয়ে কাল কাটায়, সুকুমার হেন কন্দর্পকান্তি স্বামী দাসানুদাসের মতো ফাইফরমাস জোগায়। কত সুখ-শান্তি, আরাম-অবসর! সৌভাগ্যবতী স্নিগ্ধা।

গুনগুন করতে করতে লঘু-পায়ে এলোকেশী কাছারিবাড়ি থেকে বেরুল। বাতাসে আঁচল উড়ছে। নিজেও সে যেন উড়ে চলেছে। সুকুমার পাঁচিলের দরজা অবধি তার সঙ্গে এগিয়ে এলো।

কামরূপ-কামাখ্যায়, শোনা যায়, যোগিনীরা মানুষকে কুকুর বানিয়ে রাখে। এলোকেশীও পারত। এবং এখনো পারে, দেখা গেল। জঙ্গলের মধ্যে এই ক-বছরে একেবারে ভুলে গিয়েছিল নিজেকে। কার উপরে প্রয়োগ করবে মোহিনী-মন্ত্র ? তাই ভেবেছিল, প্রথম বয়সের সে শক্তি হারিয়ে গেছে। কত কেঁদেছে সে জন্য! আজকে জানল, বেঁচে রয়েছে নাগরের মিষ্টি ডাকের সেই এলোকেশী দেখনহাসি।

২৭

এলোকেশী যাত্রার আসরে ফিরে গেল না। গাঙের ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর গুনগুন করছে। গান সে জানে না—তবু আজকের এই নদী-মাঠ-আকাশের মধ্যে চেঁচিয়ে গান গাইবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

ঋষিবর, খুশাল, দুই পাঁচু—সবাই আসরে গিয়ে জমেছে। কেতুচরণের গান শুনলে ঘুম এসে যায়—তাই সে ডিঙির মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে দূরাগত গান-একটো শুনতে শুনতে। নৌকা আরও চার-পাঁচখানা আছে—কেতুচরণদের দেখাদেখি এই মওকায় রোজগারের জন্য এসে জুটেছে মেলায়। আজকে যাত্রার ব্যাপারে নানা রাজ্যের উড়ো লোক জড় হয়েছে—কে কোথায় নৌকা বাইতে বাইতে সরে পড়বে, তাই সব নৌকায় পাহারাদার আছে একজন দুজন করে। অভ্যাস বশে হাঁকও দিচ্ছে—

যাবে গো শামুকপোতা—খলষেমারি—বয়রা-আ-আ! দু-আনা ফি চড়ন্দার। যাবে-এ-এ—

নিয়ম-রক্ষার মতো এক একবার হাঁক দিয়ে গল্পগুজব করছে। নৌকার খোলে রান্নাও চেপেছে কারো কারো। লোক জমবার দেরি আছে। জমজমাট আসর—এখন কি ঘরবাড়ির কথা মনে আছে কারো? গান ভাঙবার পর তখন মিলবে সোয়ারি। তার এখনো অনেক দেরি।

এলোকেশী কেতুচরণের ডিঙিতে লাফিয়ে উঠল। রাত্রি হলেও ঠিক চিনেছে—কেতুরই ডিঙি এটা। উল্লাসে ডগমগ এলোকেশী—বেপরোয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন। এমন লাফ দিয়েছে—ডিঙি যে কাত হয়ে ডুবে যায় নি, সেইটে আশ্চর্য।

কেতুচরণ তড়াক করে উঠে বসে এলোকেশীকে দেখতে পেল।

এখন ছাড়বে ?

দু-দশ জন আসুক চড়ন্দার—

কোন তিথি হল ? ষষ্ঠী। বারো দণ্ড জোছ্‌না আছে।

হিসাব করছে, আর স্রোতের জলে দুই পা ডুবিয়ে রগড়াচ্ছে। বলে, চড়ন্দার আসুক না আসুক, চাঁদ ডুববার আগেই আমায় পৌঁছে দিতে হবে। গিয়ে তবে রান্না চড়াব।

যেন কেতুচরণ নিয়ে এসেছিল তাকে এখানে, ফেরত পৌঁছে দেবার তারই দায়িত্ব। গা জ্বালা করে লাট সাহেবের ধরনের এই রকম হুকুম শুনলে। হুকুম ঝেড়ে এলোকেশী বোঁচকার গামছা খুলল। হাত বাড়িয়ে গামছাটা গাঙের জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, বাবু খুলনেয় গেছে। চুরি করে যাত্রা শুনতে এসেছি। সে কিছু জানে না।

ছই-এর ভিতর ঢুকে গেল। মুখ ও হাতের এখানে-ওখানে ঘষছে। বাবা রে বাবা! এই রাত্রিবেলা কে এখন খুঁটিয়ে রূপ দেখতে যাচ্ছে—একটু কাদার ছিটে লেগেছে বা না লেগেছে, সর্বাগ্রে তার কাদা তুলে ফেলবার দরকার পড়ল।

আবার বলে—হঠাৎ কি কারণে ক্ষেপে উঠেছে—বলল, গ্রাহ্য করি নে। আসব যাব, যাত্রা শুনব, যা খুশি তাই করে বেড়াব।

আনতে পারল তো বয়ে গেল। কড়ি দিয়ে কিনে রেখেছে নাকি ?

এমনি সময় খেয়াল হল, কেতুচরণ ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে—প্রায় মাঝ-গাঙে এসে গেছে তারা। এলোকেশী গোড়ায় ভেবেছিল, জোয়ার এসে পড়ায় সরিয়ে ডাঙার ধারে নিয়ে যাচ্ছে। তা নয়—একমাত্র তাকে নিয়েই ছেড়ে দিয়েছে।

চললে যে ? আর সোয়ারি কই ?

চাঁদ না ডুবতে তোমায় পৌঁছে দিতে হবে, বললে—

আর একটা মানুষও পেলে না ?

কেতুচরণ বলে, যাত্রা ছেড়ে কে যাবে এখন ? তোমার মতো ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে না তো সবাই।

দ্বিধান্বিত ভাবে এলোকেশী বলে, এ কেমনটা হল ! শুধু আমি আর তুমি—

বোঠে জলের উপর তুলে ধরে তার মুখে তাকিয়ে কেতুচরণ কৌতুককণ্ঠে বলল, ভয় করছে ?

ভয় ? তোমাকে ?

বোঁচকায় চাট্টি মুড়ি নিয়ে এসেছে। মেলায় কিনেছে। সেই মুড়ি এলোকেশী কোশ-কোশ গালে ফেলতে লাগল। অবহেলায় কেতুচরণের দিকে তাকিয়ে দেখে না একটিবার।

খাওয়া দেখে কেতুও ক্ষুধা বোধ করে। ডিঙি খরবেগে ছুটেছে। বোঠে কেবলমাত্র ছুঁয়ে রেখেছে জলে। অলস দৃষ্টি মেলে কেতুচরণ আহারপর্ব দেখছে।

যেখানটায় বসেছ, পাটার কাঠখানা তুলে ফেল দিকি—

ভ্রূকুঞ্চিত করে এলোকেশী বলে, কেন ?

তোলই না। তোমাদের মেয়েমানুষের এই এক বড় দোষ—সব তাতে কেন, কি বিত্তান্ত—

মুখ টিপে হেসে এলোকেশী বলে, সত্যি কথা বলো দিকি। কটা মেয়েমানুষের সংসার তোমার? দেখে দেখে একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছ!

পাটার কাঠ তুলে দেখল জলের কলসি। ফেরোয় জল ঢেলে ঢকঢক করে মুখে ঢালল খানিকটা। জল-তৃষ্ণা পেয়েছিল সত্যি। গাঙের নোনা জল মুখে দেওয়া যায় না—কি করবে—শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছিল এতক্ষণ। জল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা হল।

কেতুচরণ বলে, শুধু মুড়ি খাচ্ছ—মালসায় পাটালি দেখতে পেলে না? তোমার চোখ কানা।

এলোকেশী খিল্‌-খিল করে হাসে।

গাঁজার নেশায় ঢুলছ। মনের মধ্যে তোমার ধুকপুকানি হচ্ছে আর এক নেশায়। সব দেখতে পাচ্ছি গো! কানা যদি হব, এত সমস্ত দেখলাম কি করে?

গাঁজার কথায় রাগ হল কেতুচরণের। খামোকা এক হাড়-জ্বালানো কথা বলল। জলের উপর থাকতে হলে সময় বিশেষে দু-এক টান না টানলে চলে না। সবাই তা জানে। কিন্তু আজকের এই আচ্ছন্ন ভাব সমস্তটা দিন ধরে কড়া রোদে নৌকা বাওয়ার দরুন।

তবু প্রতিবাদে একটি কথাও বলল না কেতু। লাভ কি? জগতে কেউ নেই তাকে দরদ দেখাবার। না দেখাল তো বয়েই গেল! সে কি খেতে পরতে পাচ্ছে না? জীবনে কি প্রয়োজন মেয়েমানুষের দরদে?

আরও জোর দিয়ে কেতু বলল, আলবত কানা তুমি। আচ্ছা, দুর্লভ হালদারের মধ্যে কি দেখে তুমি মজে রয়েছ?

এলোকেশী শুনতে পাচ্ছে না যেন। মুঠো মুঠো মুড়ি মুখগহ্বরে ফেলছে। তার কত ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়া দেখে বোঝা যায়।

তখন কোমল সুরে কেতুচরণ বলে, পাটালি খাও—

তোমার পয়সার পাটালি আমি খাবো কেন?

তা বটে! সাধুর মেয়ে, ঘেরিবাবুর ঘরণী—আর আমরা গরিবগুরো মানুষ, হাল বেয়ে বেড়াই—

গলা বুঁজে আসছে দেখে কেতু চুপ করল। সামলে নিয়ে একটু পরে বলে, ও পাটালি পয়সা দিয়ে কেনা নয়—এমনি।

চুরি করেছ?

অর্থাৎ কেতুচরণ চোর, কেতুচরণ গেঁজেল—যত গুণের নিধি হল দুর্লভচন্দ্র। মেজাজ ঠিক রাখা দায়, তবু সে শান্তভাবে বলল, কতই মানুষ উঠানামা করে—

ভালোবেসে তারা দিয়ে গেছে—কেমন?

জবাব ঠোঁটের কাছে এসে পড়ে, এই যেমন তুমি এলোকেশী ভালোবাসার বস্তা খুলে বসেছিলে। একবার নয়—দু-দুবার। কুস্তিতে বিজয়ী হয়েছিল আর চোর ধরেছিল—সেই দুই রাত্রে। সংসারের সকল মানুষ তোমারই ধাঁচের এলোকেশী—কাজ আদায়ের গোঁসাই, গরজের বাইরে একটা মিষ্টি কথাও কারো কাছে প্রত্যাশা করবার জো নেই। শরীর কি মনমেজাজ খারাপ হওয়ার দরুন কোনদিন যদি পৌঁছে দিতে দেরি হয়ে যায়, সোয়ারিরা বাপ তুলে গালি দেয় ডিঙির উপর বসেই। শুধু পয়সার খাতিরে

এবং গোল-পাঁচু ঋষিবর প্রভৃতির পরামর্শে প্রাণপণে ঠোঁট দুটো চেপে চুপ করে বসে থাকে সোয়ারিরা যখন বকাবকি করে। ভালোবেসে সেই সব মানুষ পাটালি খেতে দিয়ে যাবে!

কিন্তু এসব কিছুই বলল না কেতুচরণ। বলে, একজনের কুনকে থেকে পড়ে গিয়েছিল। পরে দেখতে পেলাম, তখন সে মানুষ চলে গেছে। তা পড়ে-পাওয়া জিনিস খাও না দু-খানা। শুধু মুড়ি কত আর চিবোবে?

এলোকেশী সবেগে ঘাড় নাড়ে।

তোমার নৌকায় যাচ্ছি—নগদ পয়সা গুনে দিয়ে নামব। এই মাত্তোর। খাতির-উপরোধের ধার ধারি নে।

তুমি কেন খাতির করেছিলে সেদিন আমায় খাবার জলের সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে?

রাগ করে কেতুচরণ হাতের বোঠে কাড়ালে রেখে দিল।

থাকল এই তবে। ভারি তো দু-আনা দেবে একটা চড়ন্দার—বাইব না নৌকো। বয়ে গেছে!

পাড়ে লাগাও—নেমে চলে যাই। হেঁটেই যাবো—আসবার সময় যে রকম এসেছিলাম। এই যে মেলায় নিয়ে আসতে বলেছিলাম—আনলে না। তা বলে আটকে থাকল নাকি?

কিন্তু কলহের অবসর কোথা? মোচার খোলার মতো ডিঙি ঘোলার মধ্যে পাক খাচ্ছে। এলোকেশী বেরিয়ে আসে কেতুচরণের দিকে।

নৌকো যে গেল! দাও, বোঠে দাও আমার কাছে—

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, বুক উঠানামা করছে। বলে, ইচ্ছে হয় তুমি মরো। আমায় সুদ্ধ টানবে কেন?

তা বটে! হালদার হাপুস-নয়নে কাঁদবে। চোখের জলে সমুদ্দুর বয়ে যাবে।

হুড়োহুড়ি! বোঠে কেতুচরণ দেবে না কিছুতে। এলোকেশীর হাত দুটো এঁটে ধরল। চোখে ধ্বক করে আগুন জ্বলে ওঠে বুঝি। কোনদিকে কেউ নেই—করাল জলস্রোত খলখল হাসছে শুধু। বাঘিনীর মতো এলোকেশী তার হাত কামড়ে ধরল।

পায়ের ধাক্কায় কেতুচরণ তখন বোঠে ফেলে দিল জলে। এলোকেশীও জলে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে—বোঠে ধরতে গিয়েছিল, টাল সামলাতে পারে নি। বোঠে কি ভেসে থাকে? জলতলে ডুবে গেছে চোখের পলকে।

অবস্থা বুঝেছে কেতুচরণ। রাগের বশে বোঠে ফেলে বেকুব হয়েছে। নৌকা বানচাল হবার উপক্রম। ছইয়ের উপর আর একটা ছিল এক-পাশ ভাঙা—তাই নিয়ে প্রাণপণে বাইছে। পাকা হাত—সামলে নিল। দ্রুত বেয়ে গেল এলোকেশীর কাছে।

উঠে এসো—

এলোকেশী আগুন হয়ে বলে, কখনো না। শিয়াল-কুকুরের সামিল—তোমার সঙ্গে এক নৌকোয় বসব? থুঃ-থুঃ—

বড্ড টান আজকে। কুমির-কামটও খুব এই সব জায়গায়—

ধরে ধরবে কুমিরে। তারা সোজাসুজি কামড়ায়। এক কামড়ে টুক করে জলের নিচে নিয়ে যাবে—শরীর জুড়োবে।

কেতুচরণ মরমে মরে গেছে। অথই গাঙের উপর কেন সে ঝগড়া বাধাতে গেল পাগল মেয়েটার সঙ্গে? জানে তো তাকে! বলবার মতো কথা জোগায় না আর তার। ডিঙি বেয়ে যাচ্ছে এলোকেশীর সঙ্গে সঙ্গে। যত কাছে আসে, ততই সরে সরে যায় এলোকেশী।

কালো-মতো কি-একটা দূরে। চর উঠেছে বুঝি—মাঝ-গাঙে মাটি দেখা দিয়েছে? আনাড়ি লোকে তাই ভাববে। কিন্তু কেতুচরণ জানে। কুমির পিঠ ভাসিয়ে আছে। ভেসে থেকে লক্ষ্য করছে। ডুব দিল কুমির—এলোকেশী যে রকম জল-দাপাদাপি করছে, লক্ষ্য এড়াবার কোন সম্ভাবনা নেই। অব্যর্থ ওদের তাক—জলের নিচে দিয়ে তীরবেগে গিয়ে ভেসে উঠবে যথাস্থানে। আর এলোকেশী যেমন বলল—একটুখানি আলোড়ন জাগিয়ে চক্ষের নিমেষে জলতলে শিকার নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। শুধু পলকের জন্য রাঙা হবে স্রোতের খানিকটা।

কেতুচরণ পাগলের মতো হয়ে যায়। মিনতি করে, উঠে এসো এলোকেশী, আর কক্ষনো কিছু বলতে যাবো না। এই শেষ একটা বার আমার কথায় পেত্যয় করে দেখ—

এলোকেশীও নরম হয়েছে, জল টেনে টেনে পারছে না আর। ডিঙি কাছে এলে ছিটকে গেল না এবার। কেতুচরণ তার কাছে একেবারে পাশটিতে চলে এসেছে—সেখান থেকে বোঠে এগিয়ে দিল। এঁটে ধরল এলোকেশী—ধরে জিরিয়ে নিচ্ছে। বড় ক্লান্ত হয়েছে স্রোতের সঙ্গে এতক্ষণ লড়াই করে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

বোঠেয় হয় না—কেতুচরণ হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। একটা হাতের বলে অত বড় মেয়েকে টেনে তোলা সহজ নয়। নিজে আবার হুমড়ি খেয়ে না পড়ে ঃ

যাই হোক—তুলে ফেলল অবশেষে। এলোকেশী এলিয়ে পড়েছে। কেতুচরণ নিঃশব্দে শান্তভাবে বেয়ে চলেছে। হঠাৎ এলোকেশী চমকে উঠে বসল।

ওকি, রক্ত কিসের ?

সাপে কেটেছে—

দেখি, দেখি—

না, দেখতে হবে না। শিয়াল-কুকুরের গায়ের একটু রক্ত পড়লে কি আর ক্ষতি হয় ?

রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে—কি সর্বনাশ ? কিনারে লাগাও বলছি।

না—

আমার দোষ। যেখানে যাই একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসি।

ঠাস-ঠাস করে নিজের গালে চড় মারছে এলোকেশী। কেতুচরণ হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

আরে, দোষ তো আমারই। আমি এক নম্বরের গাধা। হাত ধরা ঠিক হয় নি—আমারই দোষ।

এলোকেশী বলে, আমিই বা কোন আক্কেলে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম। ছি-ছি, মানুষ নাকি আমি। সরো, আমি বেয়ে দিচ্ছি খানিক।

তখন কেতুচরণ সন্ধির ভাবে বলে, এখানে নয়। শিবশার মুখ এটা—এ জায়গায় পেরে উঠবে না। বরঞ্চ খালে খালে যাবো এর পর—খালে ঢুকে তারপরে তুমি ধ্বজি মেরো।

এলোকেশী খুব খুশি হল।

সেই ভালো। খালে টান কম—ধীরে সুস্থে বেশ আরামে যাওয়া যাবে।

বিষম দূর-পথ কিন্তু। তোমায় যে আবার গিয়ে রান্না চাপাতে হবে।

অধীর কণ্ঠে এলোকেশী বলে, তোমার ঐ জখমি হাতে, তা বলে, নৌকো বাইয়ে মেরে ফেলব নাকি?

তবে আর কি? বড় গাঙ ছেড়ে ঢুকে পড়ো সামনে ঐ যেটা দেখা যাচ্ছে। ধরণীর শিরা-উপশিরার মতো সংখ্যাতীত খাল অঞ্চলটা জুড়ে। সমস্ত কেতুচরণের নখদর্পণে। রাত্রি এক প্রহর হয়ে গেছে—এখনো চলেছে তারা। জাহাজ-ডুবির খাল বলে, এখন যেখানটা দিয়ে যাচ্ছে। কোন যুগে হয়তো জাহাজ ডুবেছিল, ইদানীং ভাঁটার সময় ডিঙি ডুববার মতো জলও থাকে না। স্রোত ভিন্ন পথ ধরেছে।

এলোকেশী একলাই লগি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ভিজে শাড়ি কাঁধ ঘুরিয়ে ফেরতা দিয়ে মাজায় বেঁধে নিয়েছে। কেতুচরণ কাত হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শাড়ি একেবারে এঁটে আছে গায়ের সঙ্গে—বাহুল্য এতটুকু কোন দিকে নেই। সেই আর একদিন এলোকেশী নৌকার কাড়ালে বসে বোঠে ধরেছিল—দুর্লভের কাছে তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল কেতুচরণ। আজকেও যাচ্ছে আবার দুর্লভের বাসায়।

ছিটে-জঙ্গল এধারে ওধারে—জনবসতি নেই, গাছে গাছে বানরের পাল, সাপ চরে বেড়ায় হেঁতালবন ও দিগ্‌ব্যাপ্ত উলুঘাসের ভিতর দিয়ে। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ডুবে আছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না কেতুচরণ জীবনে আর দেখল না। দিনমানের মতো জ্যোৎস্না কেওড়া-পশুরের পত্রপুঞ্জের ফাঁকে তেরছা হয়ে ডিঙিতে পড়েছে। জায়গাটার নাম বেনেপোতা। সেকেলে পাতলা পাতলা ইটের টুকরো ছড়ানো আছে ইতস্তত। বনকরের এক বাবু বলেছিলেন, খুঁড়লে দালান-কোঠা নাকি বেরুবে এই অঞ্চলে।

ঐশ্বর্যবান কোন বণিকেরা খাঁড়ির মুখে একটা আস্তানা গড়েছিল, দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে জাহাজগুলো পাল নামিয়ে বিশ্রাম নিত কি শান্ত নিস্তরঙ্গ এই খালের উপর ?

গুন-গুন-গুন—কাছারিবাড়িতে পেয়ে-বসা সেই গানের গুঞ্জনে এখনো বুঝি মজে রয়েছে এলোকেশী। বলে, ও কেতু, গীত গাও একখানা, শুনি—

কেতুচরণ ঘাড় নাড়ে।

উঁহু, দাঁড়-টানা কুড়ুল-মারা মরদ জোয়ান—গান-টান আমার আসে না। কক্ষনো আমি গাই নি।

অভিমান-ভরা কণ্ঠে এলোকেশী বলে, মিথ্যে বলো কেন ? গান গায় না সে মানুষ পিরথিমে নেই।

কেতুচরণ হেসে ওঠে।

তা বলছ বটে ঠিক! রাতবিরেতে ভয়তরাস লাগলে গেয়ে উঠি কখনো-সখনো—

আজকে ভয় করছে না ?

করছেই তো—

হঠাৎ এক ভাবের কথা বেরিয়ে এল কেতুচরণের মুখ দিয়ে। স্বপ্নেও জানত না, এ সব সে বলতে পারে। বলে, দুটো বাঁক ছাড়ালেই মর্জালের আফিস। পথ ফুরিয়ে গেল, আমার সেই ভয় করছে এলোকেশী।

চাঁদ ডুববার আগেই স্টেশনে পৌঁছবার তাগিদ ছিল—ফিরে এসে রান্না চাপাবে। কিন্তু কোথায় কি! চাঁদের দিকে নজর দেবার ফুরসত কোথায়? সকালবেলা দুর্লভ ফিরবে—তার আগে ফিরতে পেরেছে, সেই ঢের। রাত থাকতে থাকতেই তারা ফিরে এসেছে।

বাদাবনে শিয়াল নেই—প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডাকে না। ঠিকমতো তাই রাতের আন্দাজ করা শক্ত। হরিণের ডাক আসছে ক্ষণে ক্ষণে, আর বুনো ঝিঁঝির একটানা ক্ষীণ আওয়াজ। দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে আফিস-ঘরের সামনে ঝুলানো লণ্ঠনটা জ্বলছে শুধু। স্টেশন এমনই অনেক উঁচু নদীগর্ভ থেকে—আলোটা আরও উপরে খুঁটির গায়ে ঝুলানো থাকায় আকাশ-প্রদীপের মতো দেখাচ্ছে।

ডিঙি প্লাটফরম অবধি নিয়ে গেল না। ওখানে আরও নৌকা থাকতে পারে—এলোকেশী নেমে যাবার সময় যদি কারো চোখে পড়ে, সে বড় বিশ্রী হবে। খানিকটা দূরে গোলঝাড়ের নিচে আঁধার মতো একটা জায়গা—কেতুচরণ বিবেচনা করে ডিঙি সেখানে লাগাল। নোনা কাদায় এলোকেশীর পা বসে যাচ্ছে, কাদার মধ্য থেকে টেনে তোলা দায়। তুলতে গেলে পটকা-ফোটার আওয়াজ হয়। শব্দ বাঁচিয়ে দেখে শুনে সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছে। এরই মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে এক নজর সে দেখে দিল

কেতুচরণকে। পাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে বৈঠা আলগোছে জলের উপর ছুঁয়ে কেতুচরণ দু-চোখ মেলে চেয়ে আছে। তারার ক্ষীণ আলোয় অজানা কোন্ জগতের একটি মাত্র অধিবাসী সে যেন। মই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে স্টেশনের উঠানে এলোকেশী অদৃশ্য হল, কেতুচরণ ডিঙির মুখ ঘুরাল তখন।

ঘুরেই দেখতে পেল, ঠিক-সামনে এক কাঠের ভরা। আসবার সময় দেখে এসেছে, দোখালার মুখে নোঙর করা ছিল নৌকাটা। বোঝাই নৌকা নাকিসেন মুখ পার হয়ে একবার বেরিয়ে গেছে—সে নৌকা ঘুরে ফিরে আবার বনকর আফিসে আসে কি জন্য? সন্দেহের ব্যাপার। কেতুচরণ পাশ কাটিয়ে বেরুতে গেল, কাঠের নৌকাও অমনি দ্রুত সরে এসে পথ আটকায়। অবস্থা বোঝা গেল। এই এক বিষম চালাকি। সরকারি বোট দেখে বাদার বেআইনি আগন্তুক সামাল হয়ে যায়, পিটেলের (পেট্রোলিং) লোকজন তাই অনেক সময় নৌকায় কাঠ সাজিয়ে যেন কাঠুরের দল কাঠ কেটে বেড়াচ্ছে এমনিভাবে ঘোরাফেরা করে। কাঠের আড়ালে সরকারি মানুষ আত্মগোপন করে থাকে। কেতুচরণের নামে আজকের না হোক—পুরানো কাজকর্মের দরুন ভারি ভারি ফিরিস্তি আছে। আপোসে ধরা দেওয়াটা কিছু নয়।

বোঠে দু-হাতে উঁচিয়ে ধরে তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। খাঁড়া তুলে কামার পুজাস্থানে মহিষ বলি দেয়—ঠিক সেই অবস্থা। বোঠের বাড়িতে দুটো-পাঁচটা সরকারি মাথা দু-ফাঁক করে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেকায়দা ঘটাল ডাঙার দিক থেকে—আঁধার গোলবন থেকে জন পাঁচ-সাত এক সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল নৌকায়। কেউ মাজা এঁটে ধরেছে, কেউ পা, কেউ বা গলা—

জলে কাদায় ঝুটোপুটি। একা মানুষ কতক্ষণ যুঝবে? অবশেষে কায়দা করে ফেলল তাকে। হরিপদ কোমরের গামছা খুলে পিছমোড়া দিয়ে হাত বেঁধে ফেলল। বড্ড কষে বাঁধছে। হাত বেঁধেছে—পা ছুঁড়তে না পারে, পা দুটোও বেঁধে ফেলল ঝোপের লতা ছিঁড়ে এনে।

তাকিয়ে তাকিয়ে সহসা হা-হা করে কেতুচরণ দুরন্ত হাসি হেসে উঠল।

নে দাদারা, কোথায় নিয়ে যাবি—এবারে চল্। পা বেঁধে ফেললি—তা চতুর্দোলা আনবি না কাঁধে করে নিয়ে যাবি?

ধরাধরি করে কেতুচরণকে আফিসঘরের বারাণ্ডায় বসিয়ে দিল। পুবে ফরসা দিচ্ছে। এতক্ষণে এইবার সুস্থির হয়ে বসে হরিপদ তামাক ধরাল।

কেতু বলে, দোষঘাঁট কি হয়েছে—বুঝলাম না তো দাদা। বুঝিয়ে দে দেখি ঠাণ্ডা মাথায়।

রায়বাবুর চর তুই—

জিভ কেটে কেতুচরণ বলে, ছি-ছি! মিথ্যে কলঙ্ক দিস নে দাদা। ধম্মে সইবে না। সোয়ারি বওয়া আমাদের কাজ। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। কড়ি ফেলে যদি যমালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলে, তাই দিতে হবে। যাত্রা-টাত্রা শুনে মর্জাল অবধি ঠাকরুন নৌকা ভাড়া করলেন, তাই নিয়ে এসেছি। এর মধ্যে বেআইনি কি হল?

হয়েছে বই কি।

বলে আয়েশে আধেক চোখ বুঁজে হরিপদ হুঁকো টানতে লাগল।

আজামৌজা বললে হবে না। নাম করো, কি অন্যায় করেছি—

হুঁকো থেকে মুখ তুলে হরিপদ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বিনা পাশে তুই গোলপাতা কাটছিলি—

আমি? তা ভেবেচিন্তে একটা বের করেছ মন্দ নয়।

কেতুচরণ হি-হি করে হাসে। হাসি দেখে হরিপদ আরও জ্বলে যায়।

বাবু ফিরে আসুন—হিড়-হিড় করে থানায় টেনে নিয়ে যাবে, হাসি বেরুবে সেই সময়। হাসি সমেত দাঁতের পাটি উপড়ে ফেলে দেবে।

গোলপাতা কাটলে দাঁত উপড়াও তোমরা?

হরিপদ বলে, শুধু গোলপাতা কেন—খাস-বাদার সুঁদুর-পশুর কেটে পয়মাল করেছিস, চাক ভেঙেছিস, মাদি-হরিণ মেরেছিস। আর কি কি করেছিস—বাবু এসে পড়লে সমস্ত ঠিকঠাক হবে।

এত সমস্ত সত্ত্বেও কেতুচরণ নির্বিকার। বলে, যা করবার করিস রে ভাই। শীতে জমে গেলাম—কলকেটা এগিয়ে দে আগে। আর হাত দুটো খুলে দে—তামাক খেয়ে নি, তারপরে আবার বাঁধিস।

আবদার শোন! হাত নয় তো তোর—হাতুড়ি। যা কিল ঝেড়েছিস, ঘাড়ের উপর বাতাবিলেবু হয়ে ফুলেছে। হাত খুলে দেবো বই কি—নইলে জুত হবে কেন?

কিন্তু কেতুচরণের সতৃষ্ণ চোখের দিকে চেয়ে হরিপদর মনে মনে দয়া হয়েছে। নিজে নেশা করে, দুঃখ বোঝে সে নেশাখোরের।

হাতের বাঁধন খুলল না—গোটা কয়েক সুখ-টান দিয়ে ছেঁদার জায়গাটা মুছে হুঁকো কেতুর মুখের উপর ধরে রইল। কেতু ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টানছে।

দুর্লভের স্টেশনে ফিরতে অনেক দেরি হল—দুপুর গড়িয়ে গেল। কেতুচরণ সেই অবস্থায় তেমনি ভাবে আছে। রাগে হোক বা লজ্জায় হোক, এলোকেশী বাইরের এদিকে আসে নি একবারও। এক হাঁড়ি ফ্যানসা-ভাত রেঁধে তারই দু-দলা মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। দুর্লভের খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিদাসী হেঁসেল ছুঁতে পারে না—কিংকর্তব্যমূঢ় হয়ে ছিল সে। তারপর হরিপদর পরামর্শক্রমে মুড়ির চাল নিয়ে বাইরের উনুনে খোলা-হাঁড়িতে মুড়ি ভেজে নিজেরা খেয়েছে, কেতুচরণকে দিয়েছে। তামাক খাইয়েছে বলে মুড়ি অবশ্য মুখে তুলে খাইয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এতক্ষণ ধরে শাস্তি-ভোগের পর বিতৃষ্ণাও কমেছে কেতুচরণের সম্পর্কে। হরিপদ অনেক ইতস্তত করে কেতুচরণের ডান-হাতটা মাত্র খুলে দিয়েছিল মুড়ি খাওয়ার জন্য। খাওয়ার পরে যথাপূর্ব বেঁধে ফেলেছে।

ঝিমিয়ে পড়েছে কেতুচরণ। আধ-মালসা মুড়িতে ঐ লোকের কি হবে? বড় নেশার কোন বস্তু কাল থেকে ছুঁতে পারে নি—ঝিমিয়ে পড়বার তা-ও একটা কারণ বটে!

দুর্লভ উঠানে উঠে থমকে দাঁড়াল। কাঁধের উপর এক ঘুমন্ত শিশু মসীমলিন ন্যাকড়ার মতো। হাতে ক্যাম্বিসের সাদা ব্যাগ। কেতুচরণ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে রক্তাভ দু-চোখের দৃষ্টি মেলে তাকাল তার দিকে। দুর্লভের বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে।

বেড়ার ওপারের জঙ্গলে বাঘ বিচরণ করে, এই কিছুকাল আগেও হামেশা বাঘের হামলা শোনা যেত। তেমনি একটা বাঘের হাত-পা বেঁধে যেন বারাণ্ডার উপর ফেলে রেখেছে।

কেতুচরণ হাঁ করে বলে, জল খাবো—

মুড়ি খাওয়ার পর জল আরও কয়েক বার খেয়েছে। ঘটি পাশেই ছিল। হরিপদ আলগোছে দাঁড়িয়ে ঘটির জল মুখ-গহ্বরে ঢেলে দিতে লাগল। ঢক-ঢক করে পুরো ঘটি প্রায় শেষ করে ফেলল কেতুচরণ।

দুর্লভ দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বলে, হাতে বল নেই তোর হরিপদ? হাত নড়ে গিয়ে মুখে-চোখে জল পড়ছে—

হাতের দোষ কি বাবু? দেখেন অবস্থা!

হাতখানা বাড়াল সে দুর্লভের দিকে। দুর্লভ শিউরে ওঠে।

ইস—এ কি?

কোন অঙ্গ আস্ত রাখে নি। এই দেখেন। যা বোঠে তুলেছিল, মাথাটাও দু-ফাঁক করে দিত। আমরা পাঁচ-সাত জন ছিলাম, তাই রক্ষে। বেটা অসুর।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে দুর্লভ ভিতর দিকে চলল। সবিস্তারে ঘটনা বলতে বলতে হরিপদও চলেছে। কেতুচরণ কতকাল পরে মুখোমুখি সুস্পষ্ট দেখল দুর্লভকে। এই ক'দিনে তার সম্বন্ধে খবরাখবর অনেক সংগ্রহ করেছে। এলোকেশীকে মনে মনে এই চেহারার পাশে দাঁড় করিয়ে তুলনা করে দেখছে। বুড়িয়ে এসেছে দুর্লভ—ঐ যে একটুখানি দাঁড়িয়েছিল, তারই মধ্যে কয়েকবার কাশল খক-খক করে। মেদ-মাংসহীন দীর্ঘ দেহ। নিকষকালো মুখের উপর বসন্তের চিহ্ন গর্ত-গর্ত হয়ে আছে। মধু রায়ের সেই

জঙ্গল-কাটা ম্যানেজার সরকারি ঘেরিবাবু হয়ে ক-বছরের মধ্যেই রীতিমতো গুছিয়ে নিয়েছে। বাদা অঞ্চলে পশার-প্রতিপত্তির সীমা নেই। আর দেশেও শোনা যায়, চকমিলানো বাড়ি ও বিস্তর জমাজমি করেছে। বাদার সুঁদুর-পশুর দিয়ে শুধুমাত্র দেশের বাড়ির দরজা-জানলা তৈরি নয়, বাঁগবাগিচা অবধি ঘিরে ফেলেছে।

ব্যাগ ও শিশুটা নামিয়ে রেখে গায়ের জামা-গেঞ্জি ছেড়ে দুর্লভ আবার বাইরে এল একপলা তেল মাথায় থাবড়ে দিয়ে। স্নান করবে এবং কেতুচরণের সম্বন্ধে যা-হোক একটা ব্যবস্থাও করে ফেলবে। কুমিরের ভয়ে গাঙে নামা চলে না—মাচার প্রান্তে দাঁড়িয়ে একজনে বালতিতে করে জল তুলে দেয়। স্নান হয়ে গেলে তারপর মিঠা জলে মাথাটা ধুয়ে ফেলে।

কেতুচরণ দরবার জানায়, হুজুর দয়াময়—কি জন্যে আমার হেনস্তা করেছে, বিবেচনা করেন দিকি। ঠাকরুন যাত্রা শুনতে গেছেন—কখন গিয়ে উঠেছেন কি বিত্তান্ত, কিচ্ছু জানি নে। ভালমানুষের মেয়ে ফিরবার মুখে গিয়ে বড্ড ধরাধরি করতে লাগলেন—আর ভেবে দেখলাম, অনেক নুন খেয়েছি তো ওঁর বাপের—মেয়েমানুষ একলা রাতবিরেতে পথের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। নৌকায় তুলে বাসায় এনে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি—সেইটে আমার দোষ হল?

দুর্লভ প্রশ্ন করে, কোথায় আছিস? কি করিস আজকাল তুই? মধু রায়ের সঙ্গে নাকি জুটেছিস—তার চর হয়ে খবরাখবর নিয়ে বেড়াস শুনতে পাই?

জিভ কেটে কেতুচরণ বলে, না হুজুর—শত্রুতা করে বদ্‌লোকে

মিথ্যে রটিয়েছে। নৌকো বেয়ে খাই—স্বাধীন বিত্তি আমাদের। নতুন সায়ের জমা নিয়েছি। রায়বাবুর সঙ্গে এ ছাড়া কোন সম্পর্ক নেই।

দুর্লভ বলে, তাই হয় তো ভাল। মধু রায়কে বাইরে থেকে তোরা তালেবর দেখিস—সে তালগাছে আর রস নেই, শুধু জটার বোঝা।

কেতু করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, বিবেচনা করুন, আমার কাজই হচ্ছে তো এই—ঠাকরুনকে হুজুরের বরাবর পৌঁছে দেওয়া। সেই একবার দিয়েছিলাম—হুজুর আমায় কত ভাল বললেন, বখশিশ দিতে গেলেন। এবারে আপনি বাসায় ছিলেন না—তাই দেখেন, হাত-পা বেঁধে চোর-ডাকাতের হাল করেছে—

স্নান সমাধা হয়ে গেছে দুর্লভের। এটুকু খোশামুদিতে মন গলে না—গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে সে মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

হাত-পা বাঁধবে না তো গলায় মালা দিয়ে তক্তানামায় বর সাজিয়ে নিয়ে আসবে? গার্ড হলেও হরিপদ রাজ-কর্মচারী—তার গায়ে হাত তুলেছিস, মানেটা কদ্দুর অবধি উঠেছে বুঝিস রে হারামজাদা? এ হল খোদ রাজামশায়কেই ধরে পিটানো। বুঝবি ঠেলা। ফাটকে গিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে নিদেন পক্ষে দশটি বচ্ছর।

বলে দুর্লভ রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, আর্তনাদ শুনে ফিরে দাঁড়াল। এ যে নিতান্ত অভাবিত! হাত জোড় করে কেতুচরণ বলছে, ছেড়ে দিন দীনদয়াল, আর মারামারির তালে যাবো না। কখনো না—কোন দিনও না। পিটিয়ে তক্তা করে ফেললেও ঘাড় তুলে তাকাবো না। এই নৌকোর কাজেও আর থাকছি নে।

মাছের সায়ের হচ্ছে, যা দুটো-একটা পয়সা আসে—ধম্মভাবে তাতেই চালিয়ে দেবো।

দুর্লভের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। দুশমনের আকৃতি এই কেতুচরণের মুখ দিয়ে অনর্গল কাতর উচ্ছ্বাস বেরুচ্ছে, স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু আজকের ব্যাপারে যাই হোক—গাঙে খালে এরাই যে নৌকা মেরে বেড়ায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলপুলিশ সদাসতর্ক, তবু তাদেরই চোখের উপরে যেন জাদুমন্ত্রে বাদায় ঢুকে পড়ে পলকের মধ্যে কাজ গুছিয়ে সরে পড়ে। কি কারণে লোকটার হঠাৎ ধর্মে মতি হয়ে গেল, কিম্বা এ-ও নতুনতরো চালাকি কিনা, দুর্লভ ভেবে ঠিক করতে পারে না।

ছেড়ে দিন দেবতা। মারধোর আর যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছিল—মাথাটা তাই কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। ঘাট মানছি। বাঁধন খুলতে আজ্ঞা করেন—চোদ্দ পো মেপে নাকে খত দিয়ে যাচ্ছি দশজনার সামনে।

এলোকেশী বেরিয়ে এল এতক্ষণে। দু-জনকে কেতু পাশাপাশি দেখল কত বছর পরে। দেখে চর্মচক্ষু সার্থক হল। হাসবে কি কাঁদবে সে ভেবে পাচ্ছে না।

এলোকেশী বলে, ছেড়ে দাও ওকে। আমারই দোষ—যা করবে, আমায় করো। ও তো কোন দোষ করে নি—

দুর্লভ এক নজর এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে বলে, আজকে না-ও যদি করে থাকে—এদিগরের যত চুরি-ছ্যাঁচড়ামি, সকলের মূলে এরাই।

এলোকেশী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, খাঁচা থেকে পালিয়ে ঐ যে আমি একটু গান শুনতে গিয়েছিলাম—গাঙে খালে না ডুবে বাঘের

পেটে না গিয়ে সুভালাভালি নৌকোয় চড়ে ফিরে এসেছি—সেই রাগে সবসুদ্ধ তোমরা জ্বলে পুড়ে মরছ। গোলমাল হয়েছে সেইখানটায়—জানি গো জানি—

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

দুর্লভ একটু ভেবে কেতুকে বলল, ছেড়ে দিতে পারি এক কড়ারে। বাদা অঞ্চল ছেড়ে একদম তোকে চলে যেতে হবে।

কেতুচরণ এক কথায় রাজি হয়ে যায়।

আজ্ঞে—

সায়ের-টায়ের করা চলবে না।

আজ্ঞে না। চলেই যাবো—

২৯

দুর্লভ ব্যাগ খুলছে। এলোকেশী আড়চোখে তাকিয়ে—চৌকাঠে বাঁ-হাত রেখে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন ভারী, তাই এমনি উদাস ভাব। অন্য সময় হলে পৌঁছানো মাত্রই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে নিজে খুলতে বসে যেত। জিনিসপত্রে—বিশেষ করে শৌখিন জিনিসে তার বড় রোখ। মার খাবার পরেও সে ভেবে-চিন্তে ডজনখানেক জিনিসের ফর্দ করে দিয়েছিল। ফর্দটাই সান্ত্বনা হয়েছিল সেদিনকার নিদারুণ অপমানের।

মুখ তুলে বুড়ো-আঙুল নেড়ে দুর্লভ বলে, দেখ কি—ঢন-ঢন। একেবারে কিচ্ছু না। সব টাকা ফুঁকে গেল—জিনিস কিনব কি দিয়ে?

এলোকেশী বিশ্বাস করে নি—ভেবেছিল ঠাট্টা। কিন্তু সত্যি তাই। ব্যাগের মধ্যে সরকারি কাগজপত্র এবং দুর্লভের ময়লা ধুতি-জামা। এই মাত্র—আর কিছু নেই। খুলনায় প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার সে যাবেই—কিন্তু এমনটা হয়নি আর কখনো।

দুর্লভ বিরক্তভাবে গজর-গজর করছে, তিন কালের কাকভূষণ্ডী কিনা—সমস্ত খবর রাখে। মাসের গোড়ায় এই সময়টা মাইনেপত্তোর নিতে যাই, এটা-সেটা কেনাকাটা করে নিয়ে আসি। জমাখরচের হিসেব নিয়ে আগে থাকতে তাই ঘাঁটি আগলে ছিল। আর ক'টা দিন যেতে দেরি হলে শালার বেটা ঠিক জঙ্গল অবধি ধাওয়া করত।

এলোকেশী ক্ষীণ হাসি হেসে এইবার বলে, হলেন শ্বশুর—শালার বেটা কি—শালার বাবা বলো।

শয্যায় শোয়ানো ছেলেটার দিকে একবার সে তাকাল। পিলে-রোগা পেটমোটা উলঙ্গ—কোমরে কালো ঘুনসিতে এক রাশ মাদুলি। ঘুম ভেঙে গিয়ে পিট-পিট করে তাকাচ্ছে। এলোকেশী ব্যঙ্গের সুরে বলে, এইটি হলেন বুঝি জ্যোৎস্নাভূষণ? মরি মরি! কাচা-চাদর কালো দেখাচ্ছে—বলি, ঘামের সঙ্গে তোমার ছেলের গা দিয়ে কালি-গোলা বেরোয় নাকি?

দুর্লভ আশ্চর্য হল।

নাম-ধাম এত সমস্ত জানলে তুমি কি করে?

আরও অবাক করে দিয়ে এলোকেশী বলে চলেছে, ছেলে কার মতন হল? বাপ কালো—তা বলে এমন হতকুচ্ছিৎ তো নয়। মা'টি তা হলে সাক্ষাৎ অপ্সরী ছিল, বোঝা যাচ্ছে। তোমার সেই হৃৎপিণ্ডেশ্বরী সরসীবালা গো!

সে কি আজকের কথা। নতুন বিয়ের পরে বউকে সকলেই প্রাণেশ্বরী হৃদয়েশ্বরী বলে চিঠি লেখে—দুর্লভ ঐ হৃদয়েশ্বরী সম্বোধনটাই আরো কিছু কলাও করে হৃৎপিণ্ডেশ্বরী লিখেছিল। সরসীবালা স্বল্প বিদ্যায় ঐ বৃহৎ শব্দের মানে বুঝতে পারে নি—ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। এলোকেশী বাক্স খুলে অতি-প্রাচীন সেই চিঠিখানাও পড়ে ফেলেছে।

অজ্ঞতার ভান করে দুর্লভ বলে, এত সব পাও কোথায় তুমি—বলো তো?

হাত গুনতে পারি।

এলোকেশী হি-হি করে হেসে উঠল। উৎকট হাসি। হিংসার জ্বলুনি হাসির মধ্যে। বলে, গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন সেই হৃৎপিণ্ডেশ্বরী। কেন—হয়েছিল কি?

দুর্লভ বিরক্তস্বরে বলে, সেটাও গুনে বলো।

তোমার গুণে—

এ রকম স্পষ্ট অভিযোগ দুর্লভ প্রত্যাশা করে নি। কৈফিয়তের ভাবে সে বলতে লাগল, আমি তো ছিলাম জঙ্গলে পড়ে—আমি কি জানি! সোনা বলে এক জোচ্চোরের কাছ থেকে পিতলের গয়না কিনেছিল পাঁচ শ' টাকার। কাউকে কিছু জানায় নি। ভয় পেয়ে শেষটা আত্মহত্যা করল।

তুমি গিয়ে পিটুনি দেবে, সেই ভয়ে—

গাঁয়ের মধ্যে সমাজ-সামাজিকতা রয়েছে—মেয়েলোকের গায়ে হাত তোলা যায় সেখানে?

এলোকেশী বলে, বাদাবনে শুধু যায়?

এ প্রসঙ্গ দুর্লভ আর চলতে দিতে চায় না। কাগজপত্র নিয়ে

সুড়ুত করে বেরিয়ে আফিসঘরে ঢুকে পড়ল। অতি-সাবধানী মানুষ—স্ত্রীর প্রসঙ্গ কোনদিন ফাঁস করে নি এলোকেশীর কাছে। বাদারাজ্যের বাইরে যে তার ঘরবাড়ি ও আপন-জন আছে—এলোকেশী বলে নয়, এ অঞ্চলের কাউকে জানতে দিতে চায় না। সে আর-এক জীবন—এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই সেখানকার। টাকা পাঠায়—ব্যস, এই অবধি। এবং কালেভদ্রে যখন বাড়ি যেত, খুলনা ছাড়বার সময় কালীবাড়ির ঘাটে স্নান করে যা-কিছু ক্লেদ-কালিমা নদীজলে ধুয়ে মুছে গ্রামের গৃহাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এদিকের সমস্ত খবর দেশে-ঘরে ছড়িয়ে গেছে—আবার ওদিককার বৃত্তান্তও কিছু অজানা নেই এলোকেশীর কাছে। পুরানো নির্দোষ চিঠি দুর্লভ ইচ্ছে করে দু-একটা বাক্সে রেখে দিয়েছে।....আর ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে ভাবতে মনে হল, শ্বশুরের শেষ চিঠিটা ছেঁড়া হয় নি সম্ভবত। সেইটে হাতে পড়ল নাকি? তাই, নিশ্চয় তাই। ঐ এক চিঠিতে অনেক কথা ছিল। সোয়াস্তিও পেল সে এই ব্যাপারে। পড়েছে তো পড়েছে, ভালই হয়েছে—মুখে কিছু বলতে হল না। এলোকেশীর কাছে ছেলের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে অনেক রকম ভূমিকা করতে হত। নিজেই জেনে নিয়েছে, আর কোন হাঙ্গামা রইল না। মেয়েমানুষ পড়তে লিখতে জানলে এই এক বিপদ। এইজন্যই দুর্লভের এত সতর্কতা।

সরকারি চিঠি ছাড়া সমস্তই সে পাঠমাত্র ছিঁড়ে ফেলে। দু-একবার কদাচিৎ ভুলভ্রান্তিও যে না হয়, এমন নয়। যেমন এই এবার। ক'খানা সরকারি জরুরি চিঠির সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছিল—হাতবাক্সে সরকারি কাগজপত্রের সঙ্গে সে রেখে

দিয়েছিল। দুর্লভ বাসায় না থাকলে এলোকেশী এটা-সেটা হাতড়ায়। এটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে—মানুষজনের দেখা পায় না, কাজকর্মও এমন-কিছু নেই। কি করবে একা? দুর্লভ টাকাপয়সা যদি অসাবধানে রেখে যায়, এলোকেশী গাপ করে। মৌভোগের মেলায় তার নতুন কীর্তি জানবার পর এলোকেশীর কৌতূহল আরও বেড়েছে—আতর-সম্পর্কীয় বা ঐ ধরনের আর কোন তথ্য জানা যায় যদি! হাতবাক্স বন্ধ করে দুর্লভ নিশ্চিন্ত হয়ে বেরোয়, কিন্তু এলোকেশীর রিঙের একটা চাবিতে বাক্স খোলা যায়, দুর্লভ তা জানে না। বাক্স খুলে খুঁজতে খুঁজতে এলোকেশী দুর্লভের শ্বশুর বৈকুণ্ঠ ধরের চিঠিটা পেয়ে গেল।

ঝাঁপায় দুর্লভের শ্বশুরবাড়ি—সেখান থেকে বৈকুণ্ঠ লিখছেন। খুব কড়া কড়া বচন। চিঠি পড়ে এলোকেশী সেই প্রথম জানল, দুর্লভের ছেলে আছে, এবং তার অতি শৌখিন নাম—জ্যোৎস্না-ভূষণ। দুর্লভের যে বিয়ে হয়েছিল, সেটা একদিন কথায় কথায় বেরিয়ে পড়েছিল। তা সতীলক্ষ্মী স্বর্গে গিয়েছে, আপদ চুকে গেছে—এলোকেশী মাথা ঘামায় নি ঐ নিয়ে। কিন্তু বৈকুণ্ঠর চিঠিতে জানতে পারল, গলায় দড়ি দিয়ে সে স্বর্গের পথ সংক্ষেপ করে নিয়েছিল দুর্লভের জীবনপথে কাঁটার মতো ন-মাসের একটি শিশু নিক্ষেপ করে। বৈকুণ্ঠ এতদিন তাকে প্রতিপালন করে এসেছেন—দুর্লভ কিছু কিছু খরচ পাঠিয়েছে এইমাত্র। ইদানীং মাস আষ্টেক আর ফুরসত পায়নি খবরাখবর নেবার। টাকা পাঠানো চুলোয় যাক, পোস্টকার্ডে দুটো ছত্র লিখে খবর নেয় নি। বিস্মৃতির কারণ অবশেষে অবগত হয়ে ক্ষেপে গেছেন শ্বশুর মশায়। বাদাবনের ক্রিয়াকাণ্ড লোকের মুখে মুখে জনালয়ে পৌঁচেছে—রীতিমতো

পল্লবিত হয়েই পৌঁচেছে—চিঠির মারফতে জামাই-সম্ভাষণের বহর দেখে সেটা বোঝা যায়। বিশেষণগুলো একা দুর্লভ সম্পর্কে নয়—এলোকেশীকে সুদ্ধ জড়িয়ে। জ্যোৎস্নাভূষণের বোঝা আর বইবেন না—সাফ জবাব দিয়েছেন। অবিলম্বে ব্যবস্থা না করলে নিজে এসে ছেলে রেখে যাবেন, শাসিয়েছেন চিঠিতে।

সরকারি বোট সাত দিন অন্তর জল দিতে আসে। চিঠিপত্র থাকলে দিয়ে যায় ঐ সময়ে। জঙ্গলের বাইরে গতিমান জগতের সঙ্গে একটুকু মাত্র সংযোগ। কিন্তু দুর্লভের ডাকের জন্য মাথাব্যথা নেই। আগে একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ আসত, অনাবশ্যক বলে তা-ও ছেড়ে দিয়েছে বহু দিন। চিঠি দু-এক মাস না এলেও সে দৃকপাত করে না। এমন অনেক দিন হয়েছে, জল নামিয়ে দিয়ে তখনই ফিরতি-গোন পেয়ে বোট চলে গেছে ; চিঠি এসেছে—ব্যস্ততার জন্য চিঠি দিয়ে যেতে ভুল হয়ে গেছে মাঝির। পরের ক্ষেপে সেই চিঠি এনে দিল। দুর্লভ তা নিয়ে এতটুকু অনুযোগ করে না। ভুলে গেছে তার আর কি হবে ? বরঞ্চ হো-হো করে হেসে রসিকতা করে, ভুলেছিলি—তবে আবার মনে পড়ল কেন রে ? বলি, নৌকোয় রান্নাবান্না করিস তো—উনুনে দিতে পারলি নে ? অনেক ঝঞ্ঝাট চুকে যেত।

চিঠিপত্র সমস্ত প্রায় এক ধরনের—না পড়েই দুর্লভ মর্ম বুঝতে পারে। দেশের বাড়ির বৈমাত্রেয় ভাইরা এবং ঝাঁপার শ্বশুর মশায়—এঁরাই সব চিঠি লিখে থাকেন। প্রথম অংশে থাকে দুর্লভের শারীরিক মঙ্গলের জন্য অশেষ ব্যাকুলতা ও আশীর্বাদ—সেটা আসল বস্তু নয়, চিঠির বাহার শুধু—লিখতে হয়, তাই লেখেন। শেষাংশে পত্র-লেখকের দায়-বেদায়ের বিস্তারিত সংবাদ।

নির্গলিতার্থ, টাকা পাঠাও। অতএব চিঠির অভাবে তুর্লভ উদ্বেগ বোধ করে না। বরঞ্চ মনে মনে আরাম পায়।

তুর্লভ খুলনায় যাবার পর এবারই এলোকেশী আবিষ্কার করেছে বৈকুণ্ঠের চিঠিটা। পড়ার পর থেকে রাগে গরগর করছে।

ছেলেটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে—ক্ষিধে পেয়েছে। এলোকেশী তাকিয়ে দেখে না। যার ছেলে সে গিয়ে দেখুক, তুধ খাওয়াক, আদর-সোহাগ করুক। এলোকেশী পেরে উঠবে না।

তুম-তুম পা ফেলে সে উঠানে নামল। চিঠির প্রসঙ্গ উঠে মনের ভিতরটা জ্বলছে যেন। পেতো একবার বৈকুণ্ঠ-বুড়োকে—তার সঙ্গে কোন্দল করে বুঝত। এলোকেশীর কতটুকু দোষ, গুণধর জামাইয়ের সঙ্গে তার নাম কেন জড়ানো? বাদাবন অবধি আসতে চেয়েছিল, তাই যদি আসত—ভাল হত, চমৎকার হত। শুধু এলোকেশী নয়, এখন নতুন আর এক আতরবালা জুটেছে—সমস্ত জেনে বুঝে, একদিন বরঞ্চ মৌভোগ অবধি গিয়ে চর্মচক্ষে দেখে কৃতকৃতার্থ হয়ে যেতো বুড়ো! আর কি আশ্চর্য দেখ, দিন কুড়িক এই চিঠি এসেছে—তুর্লভের ভাব-ভঙ্গিতে কোন লক্ষণ নেই যে সে তিলমাত্র বিচলিত হয়েছে। এলোকেশী মনে মনে আরও একটা হিসাব করল। বউ গলায় দড়ি দিয়েছিল প্রায় তু-বছর আগে—তখনও তিলেকের তরে সে তুর্লভের মুখ শুকনো দেখে নি। হ্যাঁ—খুব ভেবে দেখেছে—রোজ যেমন সে কাজকর্ম করে, রাগ করে, আবার হঠাৎ এলোকেশীকে আদর করে—তখনও অবিকল সেইরকম।

৩০

বাদাবনে নিশিরাত্রে নৌকার চলাচল বড়-একটা নেই। পুরন্দর ও লা-ভাঙার মোহানার কাছাকাছি ইদানীং যাদের নৌকা বাঁধা থাকে, ঘুম ভেঙে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসবে তারা। ঢোলের আওয়াজ। আর বিশ্রী বেতালা গান। আমি শুনেছিলাম একবার। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেসব কিছু নয়, দানো-পোড়ো নয়—গয়নার নৌকার আর পাঁচটা সোয়ারি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল, মানুষই গাইছে। সাঁইতলার উমেশ মোড়ল—ওমশা।

ওমশা একেবারে বুড়িয়ে গেছে। পাকা চুল, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, তোবড়ানো মুখ, আলকাতরার মতো গায়ের রং। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত দুপুরে অত পথ ভেঙে সে খুশালদের নতুন সায়েরে আসে। এইখানে তার গানের আড্ডা। ফলুইমারি পার হয়েও ক্রোশখানেক হাঁটতে হয়। ওদিকটা পুরোপুরি আবাদ জায়গা এখন—কিন্তু রাস্তাঘাট তৈরি করে শ্রমের অপব্যয় কেউ করে না। দুই জমির সীমানা ঠিক করবার জন্য সরু আ'ল—সেই আ'লপথে পথিকজন যাতায়াত করে। উমেশের চোখে তেমন নিরিখ নেই, দিনমানেও সে আ'লের উপর দিয়ে হাঁটে না—একটু এদিক-ওদিক হলে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার সম্ভাবনা। তার পথ তাই মাঠের উপর দিয়ে। খালে বাঁশের সাঁকো আছে। বাঁশ দুষ্প্রাপ্য এসব দিকে। বাঁশের ভরা আসে অবশ্য মাঝে মাঝে...সে বাঁশের দাম অত্যন্ত বেশি। আর এক রকমে বাঁশ সংগ্রহ করে—দশ

ক্রোশ পনের ক্রোশ অবধি হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। সস্তা-গণ্ডায় বাঁশ কিনে নদী বা খালের জলে ভাসায়। সুবিধা পেলে কেনেও না। বাঁশ কেটে কঞ্চির ছোটা দিয়ে বেঁধে জলে ভাসাতে পারলেই হল। সেই বাঁশের আঁটি ভাঁটার স্রোতে ভেসে ভেসে চলে, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে মানুষ চুপচাপ বসে থাকে আঁটির উপর। জোয়ারের সময় তীরের কাছে চাপান দেয়। এমনি করে অবশেষে বাঁশ নিয়ে পৌঁছয়। এ বাঁশ খুব হিসাব করে খরচ করতে হয়। ঘরের খুঁটি-চাল গরানের ছিটেয় তৈরি, ছাউনি গোলপাতার—বাখারির জন্যই কেবল দুটো-পাঁচটা বাঁশ অত্যাবশ্যক।

এই মহামূল্যবান বাঁশে তৈরি খালের সাঁকো। দুটো লম্বা বাঁশ এপার-ওপার ফেলা। ধরবার জন্য গরানের ছিটে—তা-ও নেই এখন, নৌকার গতি দ্রুততর করবার জন্য লগি ঠেলার কাজে লাগিয়েছে তার একখানা খুলে নিয়ে।

সাঁকোটুকু পার হতে উমেশের ভারি কষ্ট হয়। বাঁশের উপর দিয়ে পায়ের আন্দাজে চলে। এর উপর ধরবার কিছু না থাকায়, বাজিকরেরা যেমন দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে খেলা দেখায়, তেমনি অবস্থায় পড়ে যায় সে। ভয় করে। একদিন পা কেঁপে সত্যিই যে পড়ে যাবার দাখিল হয়েছিল।

এই দুর্গম পথে প্রতি রাত্রে ঢোলক কাঁধে উমেশ যাবেই সায়েরে। দুটো ঘর বাঁধা হয়েছে পাশাপাশি। একটায় গোলপাতার বেড়াও ছিল খানিকটা উঁচু অবধি। এইটে দলের আস্তানা। ফঙ্গবেনে বেড়া—মরদ-মানুষের দাপাদাপিতে এরই মধ্যে ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন। বাসাঘরের কিছুমাত্র অবরোধ নেই

কোনদিকে। ছাউনিও পুরোপুরি হয়ে ওঠে নি। যারা আসে সবাই এয়ার-বন্ধু লোক, তাই নূতন বেড়া বাঁধা বা ছাউনি শেষ করার প্রয়োজন বোধ করে না তারা।

সন্ধ্যারাত্রে সকলে মিলে তাড়ি খায়, ফড় খেলে। ঝনাঝন পয়সা-সিকি-দুয়ানি বাজি ধরে কাপড়ে-ছাপা ইস্কাপন-রুইতন-হরতন-চিড়িতনের উপর। টেমি জ্বলে। ফাঁকার মধ্যে হাওয়ায় আলো নিভে যায় বলে চৌখুপিও কিনেছে একটা। পয়সাকড়ি লেনদেনের ব্যাপার আছে, তাই খেলার সমস্ত সময়টা আলোর প্রয়োজন। খেলার শেষে টেমি নিভিয়ে দেয়—অকারণ কেরোসিন পোড়ায় না। হয়তো বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে চারিদিক থমথমে হয়ে আছে, পাড়ের উপর জলতরঙ্গ কলধ্বনি করছে। আলো নিভিয়ে জন পাঁচ-সাত গোল হয়ে বসেছে দুরন্ত পুরন্দরের কূলে নিঃশব্দ প্রেত-মূর্তির মতো। গাঁজার কলকে ফিরছে হাতে-হাতে। টানের চোটে দপ করে হঠাৎ জ্বলে ওঠে কলকের মাথা। উগ্র কটু গন্ধে চারিদিকে ভরে যায়। কলকে শেষ করে সকলে উঠে পড়ে। নৌকা নিয়ে মাছ মারতে বেরুবে কেউ কেউ, আর সরকারি রিজার্ভ-জঙ্গলে ঢুকবার প্রয়োজন হয়তো আছে কেতুচরণ এবং গোল-পাঁচু বা ঋষিবরের।

আর যদি না বেরুনো হল তো কেতুচরণ শুয়ে পড়বে এবার। ঘুমুবে। নৌকা-সংগ্রহের পর থেকে শোওয়ার বড় জুত হয়েছে—নৌকায় থাকে সে ভাল। মশা কম জলের উপর।

আর সকলে ডাঙায় শোয়—শীতকাল বলে এখন ঘরের মধ্যে। অন্য সময় দুধের মতো শাদা কোমল চরের উপর পড়ে থাকবে, এই ঠিক করেছে। মাঝে অকাল-বর্ষা নামল ক-দিন—রাতে

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসত। সেই সময়টা কিছু বিব্রত হয়ে পড়ে। সঙ্কল্প করে, বাসাঘরের অন্তত একটা পাশে গোল-পাতা বা হোগলার বেড়া দিয়ে নেবে কালই। কিন্তু দিনমানে মনে থাকে না। ঘুম এদের নিতান্তই যেন পোষ-মানা। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসাগর্জন। যখন পাশ ফেরে, শব্দ শুনে মনে হয়—পর্বত ধ্বসে পড়ল বুঝি কোনখানে। জঙ্গল-রাজ্যে মশার উৎপাত খুব। মশা নয়, ভীমরুলের বাচ্চা—খুশাল রসিকতা করে বলে। আকারে তো বটে, হুলের জ্বলুনিতেও। ঘুমের মধ্যে মরদ-জোয়ানরা মশা মারার চেষ্টায় চটাপট গায়ে চাপড় মারে। মনে হবে, গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলেছে। আর ওদিকে ঢপাঢপ ঢোলক বাজাতে থাকে উমেশ। ঢোলক বাজায় আর গান গায়।

গান-বাজনা লহমার জন্য যদি বন্ধ হয়ে যায়, ঘুম ভেঙে কেতুচরণ ডিঙি থেকে হাঁক দিয়ে উঠবে, হল কি মোড়ল?

উমেশ সচকিত হয়ে বলে, গলা ভেঙে গেছে ভাই কাঁচা-তেতুলের ঝোল খেয়ে—

কেতু আদেশ করে, হাত ভাঙে নি তো—হাতে বাজাও।

বাজনা শুরু হয়। দু-হাতের প্রচণ্ড পিটুনি। পরম আরামে কেতুচরণ আবার চোখ বোজে।

ভাঁটার জল নেমে যায় খাল দিয়ে। রাত শেষ হয়ে আসে। বাদুড়ের ঝাঁক দূর অঞ্চল থেকে জঙ্গলের দিকে ফেরে। হরিণের ডাক শোনা যায় নদীর ওপার থেকে। বুনো হাঁসের কলধ্বনি। উমেশের গান-বাজনা একটানা চলেছে। গাইতে গাইতে এক সময় অবশেষে লা-ভাঙার কিনারে এসে দাঁড়ায়।

রাত শেষ হয়ে আসে। একটা-দুটো করে মেছো-নৌকা

ফিরতে থাকে। এসে মোহানার ঘাটে লাগে। সায়ের জমবে, বেচাকেনা শুরু হবে এইবার। আসরের শেষ—উমেশের আর এখানে ঠাঁই নেই। ধীরে ধীরে চলে যায় লা-ভাঙার তট বেয়ে। ওপারে ঘন অরণ্য—নিরবচ্ছিন্ন। এপারে আবাদ। ঢোলক বাজাতে বাজতে এই আঁকাবাঁকা ঘুরপথ বেয়ে সে বাড়ি ফেরে।

বাদাবন মানবেলার মতো নয়—মানুষের বাঁধা হিসাব সব সময় খাটে না এখানে। পদ্ম বা আর কেউ মরে গেছে—অমনি যে সঙ্গে সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যাবে, এ-রীতি এখানকার নয়। জালের দড়ির মতো নদী-খালের শত পাকে-বাঁধা বনের মধ্যে অগণ্য জন্তু-জানোয়ার—ভয়ের আছে, আদর করে পোষ মানাবারও আছে। এসব ছাড়া আরও তো আছেন—মৃত্যুর অতীত হয়ে নির্জন বন-অঞ্চল জুড়ে রয়েছেন যাঁরা। শুধু আমি, উমেশ বা ছকড়ি নয়—যে কেউ বাদাবনে যায়, জিজ্ঞাসা করে দেখো তাকে।

কেউ শুনতে চায় না উমেশের গান—একমাত্র কেতুচরণ ছাড়া। আর সেকালে সেই একজন ফরমায়েস করত—পদ্ম, যতদিন না পদা এসে পড়েছিল তাদের মধ্যে। আর সবাই হাসে, ঠাট্টা করে—কেতুচরণ উপস্থিত না থাকলে খুশাল তাকে এমন কি মারতেও গিয়েছে গান গেয়ে বিরক্তি-উৎপাদনের জন্যে। উমেশের দু-চোখ জলে ভরে আসে। চিরটা কাল একই ভাবে গেল। পারের খেয়ায় হরি ঠাকুর, যেদিন তোমার কাছে গিয়ে পড়ব, তুমিও হাসবে কি এই রকম? ঠাট্টা করবে? পদতলে ঠাঁই দেবে না?

চারিদিক নিঃশব্দ। আরও পাঁচ-সাতটা নৌকা এসে জমবার

পর চোরাই মাছের ঝাঁকা একে একে নিয়ে তুলবে সায়েরঘরে, দরদাম হাঁকেডাকে সায়ের সরগরম হবে। এরই ফাঁকে উমেশ হরি ঠাকুরকে ডেকে নেয়।

বাজাতে বাজাতে সে চলে এগিয়ে—আরও এগিয়ে। রোজই যায় এমনি। মানুষে তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু অরণ্য করে না। অরণ্য তাল দেয় তার বাজনার সঙ্গে। অরণ্যের অন্ধকারে অদৃশ্য বিমুগ্ধ শ্রোতার দল বুঝি উৎকর্ণ হয়ে শোনে! স্রোতের একেবারে কিনারে হঠাৎ এক সময় উমেশ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বেশ খানিকটা দূরে এসে গেছে সায়ের থেকে। ওপারের দিকে চেয়ে গান ধরে সে আবার। জীর্ণ শরীর, কিন্তু গলায় জোর আছে। কনকনে শীতের হাওয়ায় প্রায় খালি-গায়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে গাইছে। পদ্ম যেটা শুনে যাচ্ছেতাই নিন্দে করেছিল, এতদিনে রপ্ত করে ফেলেছে সে গান—

জল আনিবার করে ছলা
কদমতলায় দেখিস কালা,
কালার পীরিতি লেগে হইল বড় জ্বালা রে—

হইল বড় জ্বালা রে—নানা তান-কর্তবে গানের শেষটুকু বারম্বার গায়। ঘনঘোর আরণ্য রাত্রে ইহলোক-পরলোকের বাধা বিলীন হয়ে গেছে। এপারে-ওপারে মিলিত আসর—এ আসরে গেয়ে গেয়ে তার আশ মেটে না। একই পদ বারম্বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন পাগল হয়ে গাইছে।

নিস্তব্ধ শেষ-যামে সেই গান চলে যায় সায়েরের ঘাট অবধি। ঘাটের লোকজন বলাবলি করে, পাগলটা গাইছে। চলতি মেছো-

নৌকা থেকে কেউ বা রসিকতা করে—ঝপ্ পাস করে একবার দাঁড় ফেলে সেই তালে চেঁচিয়ে ওঠে, বাহবা।

অরণ্যের দিক থেকে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আসে, বাহবা।

উমেশ সচকিত হয়ে তাকায়—সত্যি কেউ তারিফ করে উঠল নাকি ওপার থেকে?

সেই যে হঠাৎ অকাল-বর্ষা নেমেছিল পৌষ মাসের দিনে। বৃষ্টি, বৃষ্টি—এমন আর দু-চার দিন চললে খোলাটের ধান পচে গোবর হবে। কারো মনে সুখ নেই। মেলা খা-খা করছে—ঘর থেকে বেরুচ্ছে না কেউ।

কিন্তু উমেশের কামাই নেই—যথারীতি এসে জুটেছে। এখন ভাবছে, না এলেই হত ভাল। আড্ডা জমল না—জেলে-ব্যাপারি কেউ আসে নি, শুধু এরা নিজেদের এই কয়েক জন। পথঘাট বিষম পিছল—উমেশ অন্ধকারে ঠাহর করতে পারে নি, নালার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পা মচকে গেছে। এতখানি পথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছে। আবার অনতিপরেই ফিরতে হল সকাল-সকাল। এমন অন্ধকার যে গলায় ঝোলানো ঢোলকটাই ঠাহর করা দায়। বাতাস বইছে হু-হু করে—বাদাবনের বাসিন্দা পোড়ো-দানোর দল যেন অরণ্য-সীমার বাইরে এসে তোলপাড় লাগিয়েছে। শীতের শীর্ণ গাং-ভাঙা সহসা জলোচ্ছ্বাসের আনন্দে ছলাত-ছলাত করে ঘা দিচ্ছে বাঁধের গায়ে। উমেশ শুকনো ডাল হাতে নিয়েছে লাঠির মতো করে—সেই ডাল ঠুকে ঠুকে পথের আন্দাজ নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে এগুচ্ছে। এত কষ্টের ভিতর মুখে গান আসে না। আর ঢোলক বাজাবে—তারও এক হাত লাঠির দরুন আটকা। শুধু বাঁ-হাতে বাজনা জমবে কেন?

হঠাৎ সর্বদেহ কেঁপে উঠল। নিশিরাত্রের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে পরিত্রাহি আর্তনাদ। মেয়েলোকে চেঁচাচ্ছে—অনেকগুলো গলা। পুরুষের গলাও পাওয়া যাচ্ছে। হাঙ্গামা বেধে গেছে রীতিমতো।

কান খাড়া করে শুনল উমেশ। দূর আছে, তা বলে কি করা যাবে? খোঁড়া পায়ে দৌড়চ্ছে। গিয়ে হাঁ-হাঁ করে পড়ল।

কি করছ তোমরা? নারী হলেন লক্ষ্মী-ভগবতী--জিহ্বাগ্রে অকথা-কুকথা আনছ ওঁদের সম্পর্কে? ছি-ছি-ছি—

একটি মেয়ে কর-কর করে ওঠে, দেখ—তাই দেখ। শুধু বুঝি মুখের কথা? কিল-ঘুসি ঝাড়ছে। উঃ—শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে ঘুসি মেরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে।

লজ্জা যেন উমেশেরই। সে মরমে মরে গেছে। গলা শুনে একজনকে চিনেছে—টিকে সর্দার। তারই নাম ধরে উমেশ বলে, অমন রায়বাবুর সংসর্গে থেকেও তোমার হীন প্রবৃত্তি গেল না টিকে? অবলা মেয়েছেলের গায়ে হাত তুললে? রায়বাবুর কানে গেলে কি বলবেন?

টিকে রাগে জ্বলছে। উমেশের অনুকৃতি করে বলে, তোমার অবলা মেয়েছেলেরা এক এক পোর্টম্যান্টো ঘাড়ে করে রাত দুপুরে সরে পড়ছিল। মেয়েছেলে বলো কাদের ওমশা, সবাই এরা মাগী আর বেটি। আর দলের সেরা শয়তানী হল এই হারামজাদী—আতর পেশাকার।

অন্ধকার হলেও আন্দাজ করা গেল, কথার সঙ্গে সে আবার এক ঝাঁকুনি দিল আতরবালাকে ধরে।

হাঁপাচ্ছে এখনো। আধ ক্রোশ ছুটে এসে তবে এদের ধরেছে। রাগের কারণ আছে সত্যি। মেলার খানিকটা অংশ

টিকে সর্দার ইজারা নিয়েছে। রায়-এস্টেটে একটা থোক টাকা দিতে হবে, সেই টাকা মিটিয়ে তার উপর যা পাবে সে তার নিজের। যত খাতিরই থাক, মধুসূদন এস্টেটের প্রাপ্য একটি পয়সাও ছাড়বার মানুষ নন। পৌষ মাস শেষ হয়ে যায়—মেলা ভাঙবে এইবার। মেয়েগুলো খোঁজ রাখে আবার মেলা বসছে কোন অঞ্চলে। সেখানে গিয়ে ছাপড়া তুলবে নতুন প্রেমিকদের সন্ধানে। তা যাক না—চিরকাল থাকতে আসে নি—কে তাদের ধরে রাখছে? সুখের পায়রা—যেখানে লোকের সমারোহ, সেইখানে গিয়ে ঢলানি করবে, এ আর নতুন কথা কি? কিন্তু জায়গার ভাড়া মিটিয়ে সকল দায়-দেনা চুকিয়ে দিয়ে দিনমানে সকলের চোখের উপর দিয়ে হাসিমুখে পান চিবোতে চিবোতে গেলেই তো হয়।

তা নয়—ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিল টিকে সর্দারকে একটা পয়সা না ঠেকিয়ে। ভেবেছিল টের পাবে না। সাঁকো পার হতে পারলেই ভিন্ন এলাকা—তখন এই কলা! কি সর্বনাশ হত, আন্দাজ করো দিকি! ভিটে-মাটি বেচেও তো টিকে মধুসূদনের দেনা শুধতে পারবে না। এ অবস্থায় রাগ সামলাতে পারে নি—স্বীকারই করছে, এক আধটা চড়-চাপড় দিয়েছে। তা-ই বা কেন—দিয়েছে কিল-ঘুসিও। কার গায়ে লাগল আর কে বেঁচে গেল—অন্ধকারে ঠাহর করে দেখে নি। পোর্টম্যান্টোগুলো টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিয়েছে, যার মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টি-সংসার পুরে মাথায় তুলে অবলা নারীদল ভীম-বেগে ছুটছিল।

উমেশ জিভ কেটে বলে, তা যা-ই বলো—পশুর ব্যবহার করেছ বাপধন টিকে। এমন কাজ মানুষে করে না।

দরদের কথায় আতরবালা হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে।

তোমার দশ টাকা খাজনা কোত্থেকে দেবো বলো? বুনো বাদায় খদ্দেরপত্তোর আসে নাকি?

টিকে বলে, বাদার দোষ কি? তুই মাগী উড়নচণ্ডী, হাজার টাকা পেলেও নেশা-ভাঙ করে এক রাত্রে সাবাড় করে দিস। তোর জুত হবে কেমন করে? তোর দুঃখ কখনো ঘুচবে না।

হুঁ, ভারি সব খদ্দের! একজনে একদিন আট গণ্ডা পয়সা দিল তো অষ্ট প্রহরে আর কোন শালার পাত্তা নেই। রায়বাবুর নাম শুনে নতুন জায়গায় এসে গুকুখুরি করেছি। ঘটিবাটি বেচে পেট চালিয়েছি। সর্বস্ব গেছে—এখন আর কোন সম্বল নেই।

কি আছে না আছে কালকে খুলে দেখা যাবে দশের মুকাবেলা—

টিকে ও তার সঙ্গে যারা এসেছে—এক একটা পোর্টম্যাণ্টো মাথায় নিয়ে ফিরে চলল মেলার দিকে। মেয়েগুলো আর্তনাদ করে ওঠে, মাইরি···মা বনবিবির দিব্যি, কিচ্ছু নেই ওতে, একেবারে খালি—

এত ভার কিসের, ইটপাটকেল পুরে রেখেছিস নাকি? তা চেঁচাচ্ছিস কেন এত? কিছু না থাকে, তোরা বেঁচে গেলি। কি আর নেবো? ও কি, ফিরছিস কেন রে? কিচ্ছু যখন নেই— চলে যা যেমন যাচ্ছিলি—

মেয়েগুলোও ছুটছে এদের পিছু পিছু। আর উমেশও, দেখা গেল, বাড়ির দিকে গেল না—ঐসঙ্গে চলেছে। ডাকছে, শোন ও টিকে সর্দার, নারীর হেনস্তা কোরো না—অমঙ্গল হবে। কত আর তোমার পাওনা হবে? আচ্ছা, আমি দায়িক রইলাম—

ওরা না দেয় আমি দেবো। খোরাকি আছে—ধান বেচে তোমার ঋণ শুধব। আমার ঢোলক বিক্রি করব। মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলো না, তাদের অকথা-কুকথা বোলো না।

৩১

দুর্লভের হাত এড়িয়ে কেতুচরণের ফিরে আসতে সেদিন অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল। সায়ের-ঘরে ফড়খেলা চলছে তখনো। তিনটে রসের ভাঁড় গড়াচ্ছে এক দিকে। তিন-তিনটে যখন, আসর আজ জমজমাট। কেতু ছিল না, তা বলে কারো দৃক্‌পাত নেই। আগের দিন সেই রাত দুপুর থেকে কত ঝড়ঝাপটা গেল তার উপর দিয়ে—কেউ এরা খবরই রাখে না। সোয়ারি নিয়ে একা-একা কোন দিকে বেরিয়ে পড়েছে—এমনি একটা কিছু ভেবে নিয়েছে। আগেও বেরিয়েছে এমনধারা কিনা।

ফড়ের আড্ডায় নিঃশব্দে কেতু বসে পড়ল। একটা সিকি বের করে পুরোটাই রাখল রুইতনের উপর। সিকি গচ্চা গেল। তবু সে একটি কথা বলল না। পথের সম্বল সিকিটা। অনেকদিন ধরে গাঁটে আছে বিড়িটা-আসটা কিনবে বলে। কিন্তু প্রয়োজন ঘটে নি, এর তার কাছে চেয়ে-চিন্তে স্বছন্দে চলে গেছে। সিকি হেরে যেন আপদ চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে সে ডিঙিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই খুশাল ঋষিবর আর গোল-পাঁচু আড্ডা ভেঙে চলে এল তার কাছে।

ঋষিবর বলে, কি যেন একখানা কাণ্ড হয়েছে মুরুব্বি ?

খুশালও উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ডুব দিয়েছিলে ? গতিকখানা কি বলো দিকি তোমার ?

সে কথা কানে না নিয়ে কেতুচরণ বলে, ওমশা কই ? মবলগ রাত হয়েছে—ফৌত হয়ে গেল নাকি বুড়ো ?

ঋষিবর বলে, সেই যে পড়ে গিয়ে পায়ে দরদ হয়েছিল—তারপর থেকে আসে না বড়-একটা। খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে বোধ হয় বিছানায়।

খোঁড়া না আরো-কিছু !

বিড়-বিড় করে প্রায় আত্মগত ভাবে বলল গোল-পাঁচু—আর কারো কানে গেল না। খুশাল কেতুচরণের একেবারে শিয়রের উপর চেপে বসে বলল, কি হয়েছে খুলে বল্ ভাই। না শুনে নড়ছি নে। সমস্ত রাত্রি বসে থাকতে হয়, সে-ও স্বীকার।

কেতুচরণের বলতে যে আপত্তি আছে, তা নয়। কিন্তু বকবক করতে এ সময়টা ভাল লাগছে না। এক বিচিত্র দোলায় দুলছে তার মন। এলোকেশীকে সেই অনেক বছর আগে একরাত্রে দুর্লভের বাসায় তুলে দিয়ে এসেছিল—কাল এক নৌকায় যাবার সময় স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, আবার সে আপনি মুঠোর মধ্যে চলে আসছে। খুশালকে তার কি বোঝাবে, আর সে বুঝবেই বা কি ছাই-ভস্ম ?

তবু বলতে হল দু-এক কথা। দু-এক কথায় শেষ করে কেতুচরণ বলল, তুই সায়ের নিয়ে থাক্ খুশাল ভাই। আমি থাকব না। এ তল্লাট ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে।

গোল-পাঁচুর বিষম উৎসাহ।

সেই ভাল। শান্তিনগরে যাই চলো। নতুন এক আবাদের পত্তন করছে সেখানে। মাংনা জমি দিচ্ছে—তার উপরে পাঁচ বছরের খাজনা মুকুব। আমার মামা চলে গেছে, আমরাও যাই চলো দল বেঁধে। বেবাক বড়লোক হয়ে যাবো। এ ঘোড়ার ডিম সায়ের চালিয়ে কিচ্ছু হবে না। রায়বাবুর খাজনা আর তহরি-পরবি মিটিয়ে দিয়ে পেটের ভাতটা জোটানো যায় যদি বড় জোর! আর ক-দিন পরে মেলা অন্তে ডিঙিটা ঘাটে বসে থাকবে, সোয়ারি জুটবে না।

এমনি সময়—ক্ষীণ যদিচ—ঢোলের আওয়াজ এল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে কেতুচরণ চেঁচিয়ে ওঠে, থাম্—

তাড়া না খেলে গোল-পাঁচুর উচ্ছ্বাস সহজে থামত না। মাথা তুলে কেতুচরণ একটুখানি কান পেতে শুনল।

হ্যাঁ, আসছে—ওমশা আসছে ঐ শোন—

গোল-পাঁচু বলে ওঠে, সে গুড়ে বালি। এখানে আসবে না। যেখানে যাবার গিয়ে উঠেছে সেখানে অনেকক্ষণ।

ঋষিবর বলে, মাগীপাড়ার দিক দিয়ে বাজনা এলো যেন—

গোল-পাঁচু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, তাই। খোঁড়া হয়েছে বলছিলে—খোঁড়া না গুষ্টির পিণ্ডি? রোজই আসে। এসে ইদিকে নয়—সোজা ঐ পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সন্দেহ প্রকাশ করে খুশাল বলে, নাঃ—কি বলিস! গান-টান শুনতে পাই তো! ওমশা এসে চুপচাপ থাকবে—কেউ জানতে পারবে না, তাই কি হয় কখনো?

হয়েছে আজকাল। বাক্যি হরে গেছে বুড়োবয়সে ধেড়ে-রোগে ধরবার পর থেকে। আজকেই কেবল ঐ ঢোলের একটু যা সাড়া পাওয়া গেল!

কেতু হুকুম দেয়, চলে যাও পাঁচু তুমি—বুড়োটাকে ধিরে নয়ে এসো পাঁজাকোলা করে।

আমি পারব না। আর যে পারে যাক—

ভ্রূকুঞ্চিত করে কেতু বলে, কেন?

আমি ও-পাড়ায় ঢুকি নে। গা ঘিন-ঘিন করে।

ওরে আমার ধম্মপুত্তুর!

হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে কেতু চেঁচিয়ে ওঠে, না পারবি তো চলে যা এখান থেকে। সবাই চলে যা। ভারি কষ্ট গেছে—আমি ঘুমোবো।

ঘুমোতে কিন্তু চায় না সে। উমেশের সম্পর্কেও তেমন আগ্রহ নেই। নিরিবিলি ভাববে এলোকেশীকে। না ঘুমিয়ে সারা রাত্রি ধরে ভাববে।

গতিক বুঝে এরা উঠে পড়ল। না উঠলে লাঠি-পেটা করাও বিচিত্র নয় কেতুচরণের পক্ষে। মেজাজ জানা আছে, রোখের মাথায় বন্ধুজন বলে সে রেহাত করে না।

যাবার মুখে খুশাল আপত্তি জানিয়ে যায়—ঘোরতর আপত্তি। গোল-পাঁচুর উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বলে, বদ মদলব দিস নে বলছি পেঁচো। ভাল হবে না। শান্তিনগরে মন টেনে থাকে, একা-একা তুই চলে যা। দল জোটাচ্ছিস কেন?

গোল-পাঁচু বলে, গিয়ে যদি দেখতে একবার! মামা গিয়েছে, মামাতো ভাইরা গিয়েছে—

খুশাল বলে, দূর—দূর! জলের তোড়ে কদিন টিঁকবে নতুন আবাদের বালির বাঁধ? শান্তিনগর জলের নিচে চলে যাবে। মধু রায়ের এত তোড়জোড়—তিনি বলে নাকানি-চোবানি খেয়ে

এলেন মধুনগরে আবাদ করতে গিয়ে!...কোথাও তোমার যেতে হবে না কেতু—আমি বলছি, কোন ভয় নেই। কচু করবে দুর্লভ হালদার। রায়বাবুর রায়ত—আমরা কি দুর্লভের এলাকায় থাকি? মোটে যাবে না মর্জাল-আফিসের দিকে—কি করতে পারে সে দেখি। রায়বাবুকেও না হয় শুনিয়ে রাখব কথাটা।

ঢপ-ঢপ ঢপা-ঢপ—

বাজনায় জোর দিয়েছে। উমেশ বাজাচ্ছে আতরবালার ঘরের মধ্যে বসে। আতর আজ গান শুনতে চাচ্ছে।

মর্জালের ওদিকে যেতে খুশাল এবং সঙ্গীসাথী সকলে মানা করে দিয়েছে। মানা শুনল না কেতুচরণ—দিন দুয়েক পরে গিয়ে উঠল সেখানে। পাছে এদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়—ডিঙি নেয় নি, পায়ে হেঁটে একাকী চলে গেছে। ভক্তিযুক্ত ভাবে সে দুর্লভকে প্রণাম করল।

আবার কি রে? চলে যাস নি মৌভোগ ছেড়ে?

আজ্ঞে, যাবো। কাল-পরশুর মধ্যে চলে যাবো। পাদপদ্মে কটা মাছ নিয়ে এলাম। সায়েরের ঝড়তি-পড়তি সামান্য দু-চারটে। আজ্ঞে করুন—ঢেলে নিয়ে ঝুড়িটা আমায় দিয়ে দিক।

মাছের ঝুড়ি ডালা দিয়ে ঢাকা। ডালা সরিয়ে দুর্লভের মুখ হাসিতে ভরে গেল। পছন্দসই মাছ বটে! প্রকাণ্ড এক ভেটকি—আর পারসে-ভাঙান-পায়রাচাঁদার গোনাগুনতি নেই। এমন সাইজের মাছ কদাচিৎ মেলে। নিয়েও এসেছে ঝুড়ির গলায় গলায়।

মেছো-নৌকা একের পর এক এসে সায়েরের ঘাটে লাগছিল,

কেনাবেচার সোরগোল পড়ে গেল, ঝুড়িগুলো সায়ের-ঘরে নিয়ে তুলেছিল একটা একটা করে—তারই এক ফাঁকে কেতুচরণ এই ঝুড়িটা সরিয়ে ফেলে। কাঁধে বয়ে আঁধারে আধারে পোয়াটাক পথ গিয়ে হেঁতালঝাড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখে। ফিরে এসে যথাপূর্ব আবার ডিঙিতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিল। মাছের ঝুড়ির জন্য খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল ওদিকে। তবে মাছ এ অঞ্চলে সুলভ বস্তু বলে ভবিষ্যতে সতর্ক হবার সঙ্কল্প নিয়ে ব্যাপারটা একটু পরে চাপা পড়ে যায়। সেই ঝুড়ি কেতুচরণ সকালবেলা চুপিসাড়ে নিয়ে চলে এসেছে।

দুর্লভ উদার কণ্ঠে কেতুচরণকে নিমন্ত্রণ করে, খেয়ে যাস এখান থেকে—বুঝলি ?

আজ্ঞে—বলে দন্তপংক্তি বিকশিত করে কেতুচরণ ঘাড় নাড়ে।

এলোকেশী এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্রস্ত চুলের বোঝা—কালিঝুলি-মাখা কাপড়। রাগ করে সে দুর্লভকে বলল, মাছ পচবে—উপোস যাবে এবেলা। হাত-পা জ্বালিয়ে রাঁধাবাড়া করব নাকি ?

দুর্লভ বলে, সকালবেলাই যে হরিপদ কাঠ এনে দিল ?

এলোকেশী বলে, যেমন তুমি, তেমনি তোমার হাত-কাটা হরিপদ। বেগার-ঠেলা কাজ—আমি মরলাম কি থাকলাম, সেজন্য কারো মাথাব্যথা নেই। যা সামনে পেয়েছে, কেটে-কুটে এনে দায় সেরেছে। দেখ তো, কি দশা হয়েছে আমার!

কেতুচরণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এলোকেশীর এই নূতন শ্রী। সাতমহলার উপর সিংহাসনে বসিয়ে রাখলে যাকে মানায়,

সেই মেয়ে বাদারাজ্যে বাঁশের মাচার উপর রান্নাঘরে ভিজে কাঠে ফুঁ পাড়তে পাড়তে দু-চোখ রাঙা করে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা কুড়ুল নিয়ে কেতুচরণ তখনই রওনা হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল প্রকাণ্ড একবোঝা শুকনো ঝাউয়ের ডাল নিয়ে। সশব্দে সেই কাঠের বোঝা উঠানে ফেলল।

কিন্তু আবার এক গোলযোগ ঘটেছে, নিমন্ত্রণের স্ফূর্তি মাথায় উঠবার উপক্রম। অনবধানতায় জলের হাঁড়া ভেঙে চৌচির। দোষ দুর্লভের—অত আহ্লাদের এই পরিণাম। বড় ভেটকিটা ওজনে কত দাঁড়াবে এই নিয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল হরিপদর সঙ্গে। হরিপদর আঁচ আড়াই সের ; আর দুর্লভ বলে, চার সেরের এক কাচ্চা কম হবে না। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—পাল্লা ও বাটখারা আফিসেই রয়েছে যখন, ওজন করে দেখা যাক। আবশ্যক হয় না বলে চালের কুয়োর সঙ্গে তক্তা ঝুলিয়ে আর দশটা আজে-বাজে জিনিসের সঙ্গে সেগুলো তোলা ছিল—পাড়তে গিয়ে হাত ফসকে সেরটা পড়ল মেটে হাঁড়ার উপর। কত দূর থেকে কত কষ্ট করে বয়ে-আনা মিঠা জল স্রোত হয়ে মাচার ফাঁক দিয়ে নদীর নোনা জলে মিশেছে।

জলের নাম জীবন—বাদাবনে সেটা বোঝা যায়। জল নষ্ট করে দুর্লভ এতটুকু হয়ে গেছে, এলোকেশী গর্জে বেড়াচ্ছে সেই থেকে। আর কলহে হার-জিতের ব্যাপারই তো নয়—মাত্র এক কলসি জল কর্পূর দিয়ে পানের জন্য আলাদা করা আছে, তাতে কটা দিন চলতে পারে ?

জলের এখন কি উপায় করা যাবে, দুর্লভ ও হরিপদ শলাপরামর্শ করছিল। কাঠ নামিয়ে কেতু এসে দাঁড়ালে ব্যাকুল দুর্লভ তাকে সব বলল।

ভারি বিপদে পড়ে গেলাম রে! হপ্তার এখনো চারদিন বাকি। বাওয়ালির নৌকোও আসছে না যে, চেয়ে-চিন্তে চালিয়ে দেবো।

কেতু নিশ্চিন্তকণ্ঠে অভয় দেয়, সে হয়ে যাবে হুজুর।

এলোকেশী ফরফর করে চলে যাচ্ছিল—থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কি হয়ে যাবে? হওয়া অত সোজা নয়। কেন ভাঁওতা দিচ্ছ? কি দরকার ছিল পাল্লা-টানাটানির? জল বিনে এখন শুকিয়ে মরো—একে ওকে খোশামুদি করে কি হবে?

কেতুচরণ হেসে বলে, শুকিয়ে মরতে হবে না—মেজাজ খারাপ কোরো না ঠাকরুন। খারাপ মেজাজে রান্নার জুত হবে না—খাওয়া বরবাদ হবে। কাঠ ছিল না—এই তো, কাঠের অভাব থাকল কি? কিচ্ছু আটকাবে না—একবার হুকুম ঝেড়ে দাও, ভূতে যোগাড় করে আনবে।

বোঝা থেকে কয়েকটা বড় ডাল খুলে নিয়ে সে বাঁধে চলে গেল। কাটারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে রান্নাঘরে এলোকেশীর পিছন দিকে এনে রাখল কাঠগুলো।

কেতুর আশ্বাস পেয়ে খাবার জলের কলসি প্রায় কাবার করে এলোকেশী রান্না করেছে। রেঁধেছে অনেক রকম তরকারি—শেষ হতে বিকাল হয়ে গেল। দুর্লভকে খাইয়ে দিয়ে তারপর কেতু ও হরিপদর পাশাপাশি ঠাঁই করে দিল। কেতুচরণ ভাতটা কিছু বেশি খায়—আজকে তার উপর এমন তরকারি পেয়ে কত যে খেল, তার মাপজোপ নেই। দোষ এলোকেশীর—বসে থেকে খাওয়াচ্ছে। সব মেয়েমানুষের এই এক রীত—হাতের রান্না খাইয়ে তাদের আনন্দ।

জ্যোৎস্নাভূষণের খুব ক্ষিধে পেয়েছে বোধকরি—ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে ঘরের মধ্যে। এমন পরিপাটি ভোজনের ভিতর ছেলের কান্না কেতুচরণের বিশ্রী লাগছে। খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে—মনের উপর। কিন্তু এলোকেশী কান্না শুনতে পাচ্ছে না যেন—সামনে বসে মিষ্টি কথায় খেতে বলছে, হুমকি দিয়ে উঠছে কথা না শুনলে। খেয়ে তারপরে আর নড়বার জো রইল না—অফিসঘরের সামনে কেতু গড়িয়ে পড়ল খালি মাচার উপর। সেই একবার পদ্মদের বাড়ি খেয়েছিল—তেমনি অবস্থা।

দুর্লভ সেইখানে এসে তাগিদ দেয়, কি করবি কর রে বাপু। তেষ্টার জল ঢোক হিসেব করে খেতে হচ্ছে। কাল থেকে তা-ও জুটবে না।

কেতুচরণ একটু ঠোক্কর দিতে ছাড়ে না।

করতে তো পারি দেবতা—কিন্তু মুশকিল হল, কালকেই একেবারে চলে যাবার মনন করেছি। বোঁচকা-বিড়ে বাঁধা সারা।

তবে বললি কেন? তোর ভরসা পেয়ে তবে তো রকমারি রাঁধাবাড়া হল।

রুখতে গিয়ে দুর্লভ সঙ্গে সঙ্গে আবার নরম হয়ে যায়। রাগের কি ধার ধারে কেতুচরণ, যখন সে তল্লাট ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে? সুর নরম করে কণ্ঠে বেশ খানিকটা খাদ মিশিয়ে বলল, যেতে বলেছি বলে একেবারে কালকেই চলে যেতে হবে, তার মানে কি? খাবার জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর ধীরে সুস্থে দিনক্ষণ দেখে যাস। গুষ্ঠিসুদ্ধ নির্জলা শুকিয়ে মরব, তার একটা বিহিত করবি নে? আমার আবার এই সময়টা রেঙ্গার্স সাহেবের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে। কোথায় লোকজন, কাকেই বা বলি—

এলোকেশীকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে কেতুচরণ দেমাক করে, তা লোকজনকে দেখুন না বলে। তারা এক থানার পুকুর চিনে রেখেছে—সেইখানে যাবে তো? নিদেনপক্ষে চারটি দিনের ধাক্কা। তার আগেই সরকারি বোট পৌঁছে যাবে। অথচ, হেঁ হেঁ—একটা গোনের মধ্যেই বনের ভিতর মিঠা জল আছে—বলুন দিকি কোথায়?

তুর্লভ বলে, সে তো জানিই রে বাপু। সেইজন্যে তোকে মুরুব্বি ধরেছি। তা এত খেলাচ্ছিস কেন? রাত্তিরের ভাঁটায় বেরিয়ে পড়্। হরিপদ সঙ্গে যাবে, হাল ধরতে পারবে।

হরিপদর উপর রাগ আছে, বিশেষ করে মারধোরের পর থেকে। এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে কেতুচরণ অনুযোগের সুরে বলে, যাচ্ছে—কিন্তু বড্ড খিচখিচ করে হাত-কাটা। সরকারি লোক বলে দেমাক দেখায়। মাঝ-গাঙে একটা হুটোপুটি বেধে না যায় আমার সঙ্গে।

এলোকেশীও সায় দিল, শুধু মুখে টঙ্ক তোমার হরিপদ—হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। কাঠকুটো চেয়েছিলাম, তা দেখলে তো কটা কাঁচা বা'নগাছ এনে দিল। আর দেখ, এর কাজ দেখ দিকি—

কলকেয় আগুন নিতে হরিপদ রান্নাঘরে ঢুকেছিল। কান খাড়া করল তার কথা উঠেছে শুনে। কেতু যে কাঠ এনে দিয়েছে, ঠাহর করে দেখে এল।

তুর্লভের হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে কেতুচরণকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, শুকনো ঝাউ পেলি কোথা? এদিগরে তো দেখতে পাই নে?

খোঁজে খোঁজে উই বাইশের লাটে গিয়ে উঠেছিলাম।

বাইশের লাট জায়গাটা বিষম গরম। সেদিনও একটা মানুষ ভালো হয়েছে ওখানে। দুর্লভ অবধি শিউরে ওঠে।

সে কি রে? কি করে গেলি?

কতকটা সাঁতরে, কতক দূর খালের কাদা ভেঙে।

হাসতে হাসতে কেতু আবার বলে, ঠাকরুন বললেন যে। ওঁর হুকুম হলে কাঠ তো সামান্য বিত্তান্ত, বাঘের দুধ দুয়ে আনতে পারি।

কিন্তু এলোকেশী শোনে নি এ চাটুবাক্য। জোৎস্নাভূষণ, দেখা গেল, উঠানের উপর নেমে পড়েছে। সেখানে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরের দিকে চলল। জ্বালাতন, জ্বালাতন! মাচার উপর থেকে গাঙে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। হলে তো হাঙ্গামা চুকে যায়, কিন্তু এ বিচ্ছু অত সহজে কি রেহাই দেবে? এলোকেশী দৌড়ে তাকে ধরতে গেল।

ছেলে বুকে করে আবার এসে দাঁড়িয়েছে। কেতুচরণের মনে হচ্ছে, নির্মল পদ্মফুলের উপর একটা গুবরে-পোকা লেপটে আছে। কুৎসিত ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মারতে ইচ্ছে করে। এলোকেশীর অঙ্কের কলঙ্ক।

দুর্লভ হেসে উঠে রসিকতা করে, মুখ দিয়ে একটু বলে দাও গো—তোমার হুকুমের অপেক্ষা, রাতের ভাঁটায় যাতে বেরিয়ে পড়ে।

দুর্লভকে গড় হয়ে প্রণাম করে কেতুচরণ বলল, তাই ঠিক থাকল, আজ্ঞে। বাসায় বলে কয়ে আসিগে। নৌকোর ব্যবস্থা এখান থেকে করে রাখবেন দেবতা। আমাদের যেটা আছে, সে হল সোয়ারি-বওয়া নৌকো। সে নৌকো আটকানো যাবে না।

ছুর্লভ বলে, সরকারি নতুন ডিঙিটা তবে নিয়ে যাস। সাহেবের কাছে ওদের একটা খালি ট্যাঙ্ক চেয়ে রেখেছি, লঞ্চ থেকে এনে রাখব। এবার থেকে ট্যাঙ্কে জল থাকবে, ভেঙে যাবার ভয় থাকবে না।

৩২

ঋষিবর আর গোল-পাঁচু যেন সোয়ারি ধরতে বেরোয়, তার ভরসায় না বসে থাকে—এই কথা জানান দিয়ে কেতুচরণ মর্জাল-স্টেশনে ফিরে এল। রাত্রি এক প্রহর হয়ে গেছে। আসার পথে দেখল, নতুন সরকারি ডিঙিখানা বড়-গাঙ দিয়ে চলেছে। অতএব জলের ট্যাঙ্ক আনতে যাচ্ছে ওরা রেঞ্জার্সের লঞ্চ থেকে। সে লঞ্চ কোন্ জায়গায় রয়েছে, কে জানে? ফিরে আসতে দেরি হবে, বোঝা যাচ্ছে। গোনের আগে ফিরে এলে যে হয়!

অফিসঘরে ঘুমুচ্ছে গোটা দুই লোক। স্টেশন একেবারে চুপ-চাপ। লণ্ঠনটা জ্বলছে, কিন্তু আলো হচ্ছে না। গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চিমনি এতক্ষণে যে ফেটে যায়নি, তা-ই আশ্চর্য। চারিদিকে বিষম অন্ধকার।

কেতুচরণ হাঁক দিয়ে সাড়া নেয়, দেবতা আছেন? দয়াময়?

এলোকেশীর তন্দ্রার ভাব এসেছিল। ঘুম ভেঙে উঃ-আঃ—করে উঠল। কাতর কণ্ঠে বলল, বেরিয়ে গেছে। মারা যাচ্ছি আমি ইদিকে। ভাটা এসে গেল নাকি?

দরজার ভিতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে কেতু বলে, উঁহু—ভাটার দেরি

আছে। এখন আধ-জোয়ার। আগেভাগে এলাম—হাতের নৌকো তো নয়, দেখেশুনে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে হবে।

ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে ঘরের মধ্যে থেকে। এলোকেশীর শখ আছে, একে তাকে ধরে জঙ্গলের অজস্র ফুল আনায়। শিয়রে রকমারি ফুলের গাদা। তক্তাপোশের উপর চিত হয়ে এলোকেশী পড়ে আছে। কেতুর সঙ্গে কথা বলছে, তা উঠে বসল না। নড়াচড়া অবধি নেই।

হল কি তোমার ?

এলোকেশী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, মাচানের কাঠ সরে ওর মধ্যে পা ঢুকে গিয়েছিল। হাড়-টাড় ভাঙল কিনা, কে জানে ? এমন গেরো, হরিপদটাকে সুদ্ধ নিয়ে গেছে। সকলে বেরিয়ে যাবার পর কাণ্ডটা হল।

বলতে বলতে জল গড়িয়ে পড়ল দু-চোখ বেয়ে। বলে, কি আর বলব—বলবার মুখ আছে কি কেতু ? সুখে আছি সেদিন বলেছিলাম। কি সুখে রয়েছি, তোমার তো অজানা নেই! মরে পড়ে থাকলেও চোখ মেলে দেখবার কেউ নেই। কবে যে যেতে পারব এখান থেকে! ঘর-বাড়ি-গ্রাম দেখব, মানুষের মুখ দেখব! মরণের আগে ছাড় নেই, বেশ বুঝতে পারছি।

থেমে গেল এলোকেশী। কার কাছে এসব কি বলছে ? কেতুচরণ মুখ টিপে হাসছে। মানুষ নাকি ওটা—পশু, জঙ্গলের বাঘ। কেতুকে হাতে পায়ে বেঁধে যখন ফেলে রেখেছিল, খাঁচায়-পোরা বাঘের তুলনাই মনে এসেছিল। তার এত দুঃখের কাহিনী শুনেও কেতু নির্বিকার। হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে সে বলল, মন খারাপ

হচ্ছে বুঝি? সব ঠিক হয়ে যাবে। দুর্লভ ফিরে এসে যখন সোহাগ করবে, আবার ডগমগ হবে সেই সময়।

এ লোকের মুখোমুখি থাকবে না এলোকেশী, এর মুখ দেখবে না। না, কিছুতে নয়। রাগ করে পাশ ফিরতে গিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। নাড়া লেগে পায়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণা হচ্ছে।

কেতুচরণ ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর চলে এসেছে। ঠাহর করে দেখছে এলোকেশীর পায়ের দিকে। একবার একটু হাত বুলিয়েও দেখল। এলোকেশী হাত সরিয়ে দিল, তা কেতুচরণ আমলেই আনল না।

অষুধপত্তোর কিছু দিয়েছ নাকি?

এলোকেশীর ভালমন্দ জবাব নেই।

নত হয়ে ভাল করে দেখে কেতু বলে, কি যেন দিয়েছ। চুন-হলুদ?

এবারে এলোকেশী ঘাড় নাড়ল।

উঁহু, ওর কর্ম নয়। যা ভেবেছ, অতখানি হেলাফেলা চলবে না—

তীক্ষ্ণ চোখে এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে বলে, ঝেড়ে দেবো? তুকড়ি আমায় দিয়েছে, তাজ্জব মন্তোর—ডেকে কথা কয়। হাড় সরে গেছে, আবার কাপে কাপে বসিয়ে দেবো। একটুখানি তেল এনে দাও দেখি। সর্ষের তেল পলা দুই-তিন লাগবে।

এলোকেশীর আড়ষ্ট ভাব। ওঠে না—এত কথা, তার একটা জবাব পর্যন্ত দেয় না।

কি রকমটা হয়, দেখই না। খেতে বলছি নে তো কিছু যে মনের আক্রোশে বিষ-টিষ খাইয়ে দেবো। উঠতে হবে না—তেল কোথায় আছে বলে দাও, আমি আনছি।

চাঁদ উঠে গেছে কখন, শান্ত আরণ্য জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। এলোকেশী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কেতুচরণের পেশীবদ্ধ ইস্পাত-কঠিন শরীর। বাঘই এই রাত্রে ঘরে ঢুকে পড়েছে বুঝি—শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম। অনেক দিনের সম্পর্কহীনতার ব্যবধানে ভয় করছে এলোকেশীর, বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে। কালীদাসী ছিল, সময়কালে এখন কোথা সে? ঘুম মারছে নিশ্চয় হতভাগীটা রান্নাঘরে পড়ে পড়ে। ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে—আফিসের ওদিকে না-ই যদি কেউ থাকে, গাঙের ঘাটে বাওয়ালির নৌকায় মানুষ আছে তো বটে!

কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। তেলের জায়গা দেখাবার জন্য ভিতর দিকে সে আঙুল নির্দেশ করল। কেতু চলে গেল সেই দিককার দরজা দিয়ে নেমে। এই ফাঁকে ছুটে এলোকেশী বাইরে যেতে পারত। কিন্তু পায়ের ব্যথা তো আছেই—তা ছাড়া সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে, হাতের কড়েআঙুলটা উঁচু করে তুলবারও বল যেন হারিয়ে ফেলেছে।

কেতুচরণ খুঁজে-পেতে তেলের ভাঁড়সুদ্ধ নিয়ে এল। আলো জ্বেলে দিল প্রদীপে তেল ঢেলে। পায়ের গিরার উপর খানিকটা তেল দিয়ে সবলে এমন চাপ দিল যে, কটাত করে শব্দ হল—এলোকেশীর মনে হল, এক দৈত্য পায়ের ঐখানটা মুচড়ে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে দেহ থেকে।

চোখে তার জল এসে গেল। বুঝি অচেতন হয়ে পড়বে, এমনি অবস্থা। এরই মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখল, কঠিন ক্রুর হাসি কেতুচরণের মুখে। বিড়-বিড় করে সে মন্ত্র পড়ছে, আর জানুদেশ অবধি টেনে দিচ্ছে। আর তাকাচ্ছে এলোকেশীর দিকে

খরদৃষ্টিতে। দৃষ্টি যেন চুম্বক। সবল বাহুর চাপে গায়ের কোমল মাংস কাদার মতো কেতুচরণ ছানছে। শুধু মাংসই বা কেন, যেন তার বুদ্ধি-বিবেচনা পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে ডেলা পাকাচ্ছে।

ছেলেটা পাশে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, কেতুর হাত লেগে গেল তার গায়ে। কেন্নোয় হাত পড়লে যেমন হয়—ঘৃণায় তার সর্বদেহ শিরশির করে উঠল। মনের মধ্যে হিংস্র দুর্বার ইচ্ছা জাগে, ঠ্যাং ধরে নদীগর্ভে ছুঁড়ে দেবে আবর্জনাটাকে। শূন্যে গোল হয়ে পাকাতে পাকাতে ঝপ্‌পাস করে জলের মধ্যে গিয়ে পড়বে। বাপ-বেটা দুটোকে একসঙ্গে ফেলতে পারলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

ক্ষণপরে কেতুচরণ প্রশ্ন করে, কেমন—কষ্ট লাগছে এখন ?

দুকড়ির মন্ত্রের জোর আছে—ভয় গিয়ে এখন সত্যি আরাম লাগছে এলোকেশীর। আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সবল হাতের আরও নিপীড়ন কামনা করছে মনে মনে। হঠাৎ জোরে এক ঝাপটা বাতাস এল। প্রদীপ নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকার।

দুর্লভরা ফিরল। ঘাটে এসে ডাকছে, কই গো ? আলো-টালো নেই কেন রে ? কোথায় তোরা সব ?

কেতুচরণ ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গল আর স্টেশনের মাঝে যে বেড়া, সেই বেড়ার খুঁটির মাথায় উঠে ওদিকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর গুইসাপের মতো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে কখনো শুয়ে কখনো বা বসে বাঁধের উপর পৌঁছে গেঁয়ো-বনের পাশে নিঃসাড়ে বসে রইল।

দুর্লভ হাঁক দিচ্ছে, ও কালীদাসী, মরেছিস নাকি তোরা ? কোথায় গেলি ?

এলোকেশী কাতরাতে কাতরাতে বলে, এসো। দোর খোলা আছে। কালীদাসী, দেখগে, কোনখানে পড়ে নাক ডাকছে। আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। পড়ে পা মচকে গেছে—যন্ত্রণায় কাটা-কতুরের মতো ছটফট করছিলাম। তারপর কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

আলো নেই কেন?

উঠতে পারছি নে, কে জ্বালে? এই যে দেশলাই বালিশের তলে। কোণে পিদ্দিম আছে। আলো জ্বেলে দেখ, কি হয়েছে আমার। আর আমি বাঁচব না।

প্রতিটি কথা কেতুচরণের কানে যাচ্ছে। নিরুদ্বেগে তার এখন গলা ছেড়ে সখীসোনার গান ধরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। আরও অনেকক্ষণ কাটল। তারপর ধীরে ধীরে বাঁধের পথ ঘুরে সে ঘাটের প্লাটফরমে এসে উঠল।

ভালমানুষ হয়ে কেতুচরণ ডাকে, দেবতা আছেন নাকি? কাঙালের ঠাকুর? কই, জলের কি পাত্তোর আনবেন সাহেবের কাছ থেকে—আনা হয়েছে?

৩৩

বাদাবনের বাইরে বেগুনবেড়ে বলে জায়গা—সেখানকার থানার পুকুরের জল ভাল। রোজ দু-চার শ কলসি জল ওঠে পুকুর থেকে। জলের কলসিগুলো দূর থেকে দেখায় যেন পেট-মোটা বামনের দল। নৌকা-ডিঙির উপর তারা সারি সারি বসে

আছে। জলের ভরা দাঁড় বোঠে বেয়ে জঙ্গলের এদিকে-সেদিকে অন্তরালবর্তী হয়ে যায় চক্ষের পলকে।

বেগুনবেড়ের জল মর্জাল-স্টেশনে পৌঁছতে সাত-আটটা গোন লাগে। কেতুচরণের হাজার দিকে সুলুক-সন্ধান। ছুকড়ির মতো একেবারে জঙ্গলের কিনার অবধি নয় যদিচ, কিন্তু ছুকড়ির পরেই আর কারো যদি নাম করতে হয়—সে তার সুযোগ্য সাকরেদ এই কেতুচরণের। বাদার মধ্যেই মিঠা জল আছে, ক-জনে তা জানে? ভাগ্যিস জানে না! সারা বেলা অপেক্ষা করে সেখান থেকে বিশ-পঁচিশ কলসি জল তুলতে পারা যায় বড় জোর। জানাজানি হয়ে লোকের ভিড় বাড়লে তখন বাওড়ের কাদা-মাটি দিয়ে কলসি ভরতি করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।

বর্ষার কয়টা মাস ছাড়া অন্য সময়ে কোদালি দিয়ে একটু গর্ত খুঁড়ে দিতে হয় বাওড়ের খোলে। জল চুইয়ে ক্রমে গর্ত ভর্তি হয়ে যায়। সেই জল প্রাণ ভরে খাও—দেহ জুড়িয়ে যাবে। চোখে দেখে বুঝবার জো নেই, এমন অমৃতের সঞ্চয় আছে মাটির তলে।

বনকেওড়া গাছ—প্রায় সমদীর্ঘ—ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে। সোজা গুঁড়ি, ঘনপত্র ডালপালা প্রসারিত হয়েছে ঠিক সমান উঁচু থেকে। দেখে মনে হবে ভেবেচিন্তে মাপ-জোপ করে কবি-প্রকৃতি গাছগুলো পুঁতেছে। গাছতলায় সযত্নে কাদা-লেপা পরিচ্ছন্ন অঙ্গন। একটি পাতা পড়ে নেই কোনখানে—হরিণের দল খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। খালের ধারে এখানে-ওখানে গোলঝাড় বাহার জমিয়ে চিক্কন পাতা দোলাচ্ছে। জল বাড়ে জোয়ারবেলা, ছলছল করে জল উছলে ওঠে। গোলবনের ভিতর চিকচিকে খরগুলো মাছ লাফায়। আবার পাশখালি পার হয়ে গিয়ে

ওদিকটায় দেখ, নিষ্পত্র স্বল্পশাখা মহাকালের মতো মহাবৃক্ষ বনবিটপীরা দূর-দূরান্তর অবধি শিকড় বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যাকুল থাবায় ধরণীকে আঁকড়ে ধরে। এ তল্লাটের প্রতিটি চর, প্রতি দাদা, প্রত্যেকটি খাল-দোখালা কেতুর জানা। এই এত রকমারি গাছপালার কোনটি কোনখানে, তা-ও বোধ হয় সে বলে দিতে পারে। বরঞ্চ সে দিশেহারা হয়ে পড়ে বাদার বাইরে মানষেলার মধ্যে গিয়ে পড়লে।

দক্ষিণমুখো তিনপো ভাঁটি বেয়ে গেলে নীলকমল। সোজাসুজি একটা গাঙ ধরে গেলে হবে না কিন্তু—এ-গাঙ থেকে ও-গাঙ, সেখান থেকে আর-এক গাঙ, এমনি অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় জটিল পথ। নতুন লোক কেউ মর্জাল থেকে চিনেই আসতে পারবে না।

নীলকমল সমুদ্র নয়। সমুদ্রের মতো নদী কূলহীন এখানে। প্রসন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরেই কেবল ওপারের তটরেখার অস্পষ্ট ক্ষীণ চিহ্ন নজরে আসে। জঙ্গল হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন দূরবিসারী বালুচর। বালুর পাহাড় জমে আছে জায়গায় জায়গায়। রুপোর গুঁড়ো ছড়ানো বুঝি বালুর সঙ্গে—ঝিকিমিকি করছে, চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

ঢোল-কাঁসির বাজনা কানে আসছে অনেক দূর থেকে। সে-সব বন্ধ হল। তারপরে শুধু এক ঢোলক। আরে, আরে—উমেশ তো নয়? তারই হাতের বাজনার মতো, সে যেমনধারা তেহাই মারে। অত্যন্ত কাছে এসে গেছে এখন, কিন্তু বালিয়াড়ির জন্য নজরে আসছে না।

দুটো বড় পানসি বাঁধা আছে। সোয়ারি-মাঝিমাল্লায় জন ত্রিশেক হবে। বেটাছেলেরা আছে, কিন্তু মেয়েলোকের সংখ্যা অনেক বেশি। নানাবয়সের—বুড়ো থেকে ছা-বাচ্চা অবধি।

তাদের পাশে এসে কেতুচরণ ডিঙি বাঁধল। কি কাণ্ড, সাঁইতলা থেকে এসেছে একদল। উমেশ আছে, টুনিও আছে। টুনি বেশ গিন্নিবান্নি এখন—পায়ে রূপার জলতরঙ্গ মল, হাতে রূপার বাউটি, এক কপাল সিঁদুর। মৌভোগ আর সাঁইতলা খুব বেশি দূর নয়। কিন্তু মাস্থধর মারা যাবার পর কেতুচরণ আর ওদিকে যায় নি। অনেক দিন পরে দুর্দান্ত নদীর কূলে আচমকা এতগুলো চেনা মুখ দেখে কেতুচরণের ভারি আনন্দ হল। ছোট বাচ্চা যাদের দেখে এসেছিল, তারা দিব্যি জোয়ান হয়ে উঠেছে। যারা সমর্থ যুবা ছিল, গাল বতুরে চুলে পাক ধরে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে তারা। এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেতুচরণের নতুন করে মনে হল, অনেকগুলো বছর কেটে গেছে বটে, চারিদিককার বিস্তর বদল হয়েছে।

পূজা দিতে এসেছে এরা। নীলকমলে পূজা দিলে বাঁজা মেয়ের ছেলেপুলে হয়। বালুচরের প্রান্তে বিশাল এক কেওড়াগাছ। সেই গাছের চতুর্দিকে পাক দিয়ে মানত করে ডালের উপর ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে দেয়। তা ছাড়া ফুল কলা চাল ইত্যাদি নিবেদন করে কলার খোলায় ভাসিয়ে দিতে হয় নীলকমলের জলে। বালিয়াড়ি পার হয়ে সর্বপ্রথম ন্যাকড়া-বাঁধা ঐ কেওড়াগাছের দিকে নজর পড়বেই—মনে হবে, গাছের ডালে শাদা শাদা ফুল ফুটে আছে অজস্র।

লোকে দল বেঁধে এই রকম পুজোয় আসে। খরচপত্র ভাগ হয়ে যায়, বিপদের ভয়ও এতে কম। এবার তিনটে মেয়ে এসেছে—টুনির ননদ কিরণ তাদের একজন। পাঁচ-ছ বছর বিয়ে হয়েছে, বয়স পুরোপুরি ষোল চলেছে, এখনো সন্তানসম্ভবা হল না মেয়েটা।

কি সর্বনেশে ব্যাপার, বিবেচনা করে দেখ! শ্বশুরবাড়ির লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক রকম তুকতাক করা হয়েছে, কিছুতে কিছু হয় না। অবশেষে এই দুর্গম স্থানে এসেছে। এই শেষ চেষ্টা। এতে যদি কিছু না হয়, কিরপার শাশুড়ি আবার ছেলের বিয়ে দেবে—ঠিক করে ফেলেছে।

উমেশ মাথা-পাগলা হোক, যা-ই হোক, তার মতো শিক্ষিত মানুষ সমাজের মধ্যে কে? পৌরোহিত্যে তারই অধিকার। তাকে ধরে নিয়ে এসেছে, নীলকমলে সে-ই কলার ডোঙা ভাসাবে। ঢোলক কেড়ে নিয়ে ছুঁড়িগুলো হাসতে হাসতে উমেশের হাত ধরে বসিয়ে দিল তাকে নদীর ধারে। একটু পরে কেতুচরণের ডিঙি এসে লাগল। উমেশ মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে পাথর হয়ে গেল যেন। হাতের খোলা তেমনি হাতে ধরা আছে।

হল কি মোড়ল?

কোন জবাব দিল না উমেশ। সামলে নিয়ে একমনে আবার নৈবেদ্য সাজাতে লাগল।

কেতুচরণকে দেখে সকলে কলরব করে ওঠে। অনেক দিন পরে অভাবিত ভাবে তাকে পেয়ে সত্যি বড় খুশি হয়েছে। বালি পার হয়ে তারা গাছতলায় এল। পাঁচ-সাতটা মাদুর পড়েছে। রান্নাবান্না হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া হবে। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের পর নৌকা ভাসাবে আবার ঘর-মুখো। আর কেতুচরণ যখন অনতিদূরে মিঠা জলের বাঁওড়ের সন্ধান দিল, হাঁড়ি-কলসি যা-কিছু সঙ্গে আছে, যথাসম্ভব জল ভরতি করে নিয়ে যাবে।

বোসো কেতুচরণ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো মাদুরের উপর। জুত করে বোসো, খাওয়া-দাওয়া করে তারপর ছাড়

পাবে। কোন কথা শুনছি নে। নয় তো ছোঁড়াগুলোকে বলে দি, চড়চড় করে তোমার ডিঙি বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে আস্থক। দেখি, চলে যাও তুমি ক্যামনে?

টুনি তো প্রায় মা-ষষ্ঠী হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে—একপাল ছেলেপুলে। পিঠোপিঠি তিনটিকে নিয়ে এসেছে, আর সব বাড়িতে আছে। এই তিনটি সামলাতেই হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে একটা পান মুখে দিয়ে ছোট মেয়েটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাছুরে কাত হয়ে পড়ে সে কেতুচরণের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল।

বিয়ে-থাওয়া করেছ?

যেমনধারা এলোকেশীকে বলেছিল, কেতু ঠিক সেই জবাব দেয়।

তুই ছাড়া আর মেয়ে নেই নাকি?

টুনি অপ্রতিভ ভাবে বলে, না—তাই বলছি। তা ছেলেপিলে হল কিছু?

একটা। না হলেই ভাল ছিল রে! দিনরাত ট্যাঁ-ট্যাঁ করে। বড্ড জ্বালায়। ঠ্যাং ধরে এক আছাড়ে মাথার ঘিলু ছিটকে দিতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ নজর পড়ল, হরিপদ সকলের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে বোধকরি একমনে স্বভাবের শোভাই দেখছে। তাকে ডাক দেয়, ওখানে কি হচ্ছে হরিপদ? ডাকছে এরা তোমাকে।....ওর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলছ না? সরকারি হেডগার্ড বাবু হরিপদ পুঁই—বাদারাজ্যের মুরুব্বি মানুষ—

উমেশ পুজোআচ্চার কাজ শেষ করে চলে এসেছে। চিরদিনের

বিনয়ী নির্বিরোধী মানুষ। কি হয়েছে আজকে তার—হি-হি করে হাসতে হাসতে হরিপদর কাছে গেল।

পদা তুমি বাবু হরিপদ হয়ে গেছ? বেশ—তা বেশ—

বাঁ-হাত বাড়িয়ে সে হরিপদর মুখ ঘুরিয়ে আনল নিজের দিকে। কঠিন কণ্ঠে বলে, পদ্ম কোথা?

নেই—

টুনি বলল, সে তো মরে গেছে। সবাই জানে, তুমিই কেবল শোন নি ওমশা?

উমেশ বলে, মরে গিয়ে পেত্নী হয়েছে। নাক কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

তার কথার ভঙ্গিতে সামনের ঘন অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দিনদুপুরেও সকলে মনে মনে কেঁপে ওঠে। উমেশের তো রাত্রিবেলা ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস—কি জানি, সত্যিই কিছু দেখেছে হয়তো!

এবং আশ্চর্য, উমেশ তাদের মনের কথা জেনেই বুঝি বলল, দেখাতে পারি তাকে পদা। যাবে দেখতে?

হরিপদর হাত এঁটে ধরল। পাগলটা হাত ধরে টেনে পেত্নী দেখাতে এখনই জঙ্গলে নিয়ে যাবে নাকি? হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারে না। এত জোর ঐ রোগাপটকা বুড়ো হাড়ে?

খাটাস মরেন তেলে
মানুষ মরেন মেলে—

খাটাস এক বুনো জন্তু—গায়ে চর্বি হলে আপনাআপনি মরে যায়; আর মানুষের সর্বনাশ হয় দলের মধ্যে পড়ে। বচনটা খাঁটি। এই দেখ না, নীলকমলের জমজমাট আড্ডায় যদি বেলা মাটি না

করত, জল নিয়ে—যেমন ঠিক করে গিয়েছিল—পৌঁছে যেত সন্ধ্যার পরেই। এ গল্প তা হলে বোধ করি আর-এক রকম হয়ে দাঁড়াত।

প্লাটফরমের পাশে ডিঙি বাঁধল, তখন চারিদিক রোদে ভরে গেছে। একটা বড় সাঙড় ঘাটে নতুন এসেছে, সুর করে তারা গঙ্গাবন্দনা ধরেছে। জলের ট্যাঙ্ক নামাবার ব্যবস্থায় হরিপদ তাদের কাছে গিয়ে ডাকাডাকি লাগাল। কেতু কাড়ালে বসে। ফালুক-ফুলুক করে তাকাচ্ছে যদি চোখোচোখি হয় এলোকেশীর সঙ্গে, ইশারায় যদি সে কিছু বলে দেয়। দুর্লভ বাসায় না থাকে এবং ইশারায় এলোকেশী যদি তাকে উপরে ডাকে।

হরিপদ চার মরদ যোগাড় করে নিয়ে এল।

তুমিও ধরো কেতুচরণ—ঘটকপূর্ব হয়ে বসে থাকলে হবে না। সকলে মিলে ধরে তুলে দিই। কাত কোরো না—আহা, নাড়া না লাগে—জল চলকে পড়বে। বিস্তর লজ্বালজ্বি করে নিয়ে আসা।

ট্যাঙ্ক উপরে তুলছে—কান্না শোনা গেল জ্যোৎস্নাভূষণের। সে কি কান্না! ঐ তো পুঁটকে ছেলে—কাঁদতে কাঁদতে দম আটকে যায় না গো! তা হলে আপদ চোকে, সর্বরক্ষে হয়। কালীদাসী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আড়কোলা করে দোলাতে দোলাতে একবার এদিকে এল, কিছুতে থামাতে পারছে না। অসহ্য! কেতুচরণ ভাবছে, আঁচল দলা পাকিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে না কেন ওটার?

হাত নেড়ে কালীদাসী হরিপদকে নিভৃতে নিয়ে গেল। কেতুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে—চলে যাবে কি থাকবে, ভেবে পাচ্ছে না।

ফিরে এসে ফিসফিসিয়ে হরিপদ বলল, ফুড়ুৎ—

সে কি রে?

পাখি পালিয়েছে। বাবুর কোলের মধ্যে থেকে বললেই হয়। ঘুম ভেঙে উঠে দেখতে পেলেন, খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে। সাঙড়খান কাল সন্ধ্যেয় এসে বেঁধেছে—ওরা বলছে, কোন নৌকো-ডিঙি রাত্তিরে ঘাটে আসে নি।

ভারি তাজ্জব! পালাল কি করে?

এক বিষখালি অবধি হেঁটে গিয়ে সেখান থেকে যদি নৌকোয় উঠে থাকে। তা-ই হয়েছে—উড়ে যেতে পারে না। আগে থেকে যোগ-সাজস ছিল।

কেতুচরণ বলে, গেল কোথায়!

খারাপ মেয়েমানুষ—জায়গার অভাব কি ওদের? বাবু, শুনলাম, পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছেন। হবে না? ঘর শূন্য, তার উপরে অপমানটা কত বড় ভেবে দেখ!

দিন চারেক পরে দুর্লভ পায়ে হেঁটে মৌভোগে এসে উপস্থিত। অভাবিত ব্যাপার। চেহারা দেখে কেতু স্তম্ভিত—পাগলই ঠিক! চশমা নেই চোখে, রুক্ষ চুল, খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, কাদা-মাখা ময়লা জামা-কাপড়। চারটে দিনের ভিতর যেন আলাদা আর এক-মানুষ।

কেতুর দিকে তাকাচ্ছে বারংবার। একটু ইতস্তত করে দুর্লভ তাকে একান্তে ডাকল।

শোন্, তোর কাজকর্ম জানি। ঢাকাঢাকি কিসের রে? উপকার করতে হবে। তুই ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। মাংনা বলছি নে—তোকে আর সায়ের চালিয়ে খেতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

বলছেন কি দেবতা?

অকারণে এদিক-ওদিক চেয়ে গলা খাটো করে দুর্লভ বলে, সবই তো শুনেছিস। কোন পাত্তা পাচ্ছি নে—যেন কর্পূর হয়ে বাতাসে উবে গেছে।

কেতু সহানুভূতি দেখিয়ে গালে হাত দিয়ে বলে, তাই তো!

মধু রায়ের কাজ কিনা, সেইটে বল দিকি বাবা—

হাত জড়িয়ে ধরল সে কেতুচরণের। বলে, তুই হয়তো জানতে পারিস। সেই ভরসায় ছুটে এসেছি! যদি কিছু জানা থাকে, বলে দে।

এই দেখেন, এখনো সন্দ গেল না। রায় বাবুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এইখানেই তো রয়েছেন তিনি—মৌভোগের কাছারিবাড়িতে। কানে-টানে কিচ্ছু আসে নি। ধম্মকথা বলছি হুজুর, কেন মিথ্যে বলব?

চুপ করে মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে দুর্লভ বলল, ঐ রায় ছাড়া কারো কথা ভাবতে পারছি নে। এত তোড়জোড় আর এমন সাফাই হাত তার কাউকে দিয়ে সম্ভবে না। তিন বছর ওর তাঁবেদারি করেছি, শালাকে হাড়ে-হাড়ে জানি। উঃ—আমারই মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বেটা ফুর্তি মারছে।

কেতুর ঠাণ্ডা রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। দুর্লভের ঘর ভেঙে গেছে—বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে, ধর্ম আছেন। মধুসূদনের

কাছারিবাড়িও সে আগুনে পোড়াবে যদি এলোকেশী ঐ চালের নিচে তাঁর সঙ্গে সত্যি সত্যি ঘর করতে উঠে থাকে।

দুর্লভ বলছে, কিনারা একটা করতেই হবে বাবা। কি চাস, খুলে বল। যাক প্রাণ, রোক মান। টাকা খরচে আমি পিছপাও নই। এবারে একবার পেলে মাগীর চুলের মুঠো ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একেবারে অঞ্চল-ছাড়া করব। চাকরিতে আমার দরকার নেই। এমন জায়গায় নিয়ে তুলব, কোন বেটা ভাগাড়ের-শকুনের নজর যেখানে না পেঁছিয়।

কেতুচরণ রাজি—খুব রাজি। নিশ্চয় সে খোঁজ করবে। খুঁজে বের করবে যেখানে আছে এলোকেশী। কিন্তু হয়েছে এখনো কি দুর্লভ হালদারের! এই অর্থদণ্ড ও মনস্তাপ দিয়ে শুরু—আরও অনেক ভোগান্তি আছে তার কপালে। ঐ যে চুলের মুঠি ধরবার কথা বলল—এলোকেশীর চুল ধরে দুটো-পাঁচটা পাক দেবার গরজ তো কেতুরও।

অনেক রকমে আশ্বাস দিয়ে কেতুচরণ বলে, মুখ বেঁধে মাল হুজুরে হাজির করে দেবো—টুঁ শব্দটি হবে না। রায়বাবুর লোকের কাজ দেখলেন—আমাদেরও দেখবেন। খুশি করে দিতে হবে কিন্তু দয়াময়—

দুর্লভ পিঠ ঠুকে দিয়ে বলে, আমি জানি—এ তল্লাটে কেউ যদি পারে, সে তুই। কিন্তু কাজ আরও একটা করতে হবে বাবা। সকলের আগে সেইটে। ছেলেটা রাখা যাচ্ছে না—কেঁদে অনর্থ করছে। ওটাকে আমার শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসতে হবে। ঝাঁপা চিনিস? ঝাঁপার বৈকুণ্ঠ ধর আমার শ্বশুর! আমি সঙ্গে গিয়ে রেখে আসবো। সে বেটা আর-এক খচ্চর—

নগদ টাকায় হিসেব মিটিয়ে দিয়ে আসতে হবে, তবে নাতিকে ঠাঁই দেবে। ছেলেটা হয়েছে কাল, নইলে কিসের ঝঞ্ঝাট বল্‌? ছেলের দেখাশুনো হবে বলেই তো নচ্ছার মাগীটাকে এমন তোয়াজে রেখেছিলাম। ছেলেটার হিল্লে করে এসে তখন দেখা যাবে কার বেশি মুরোদ—দুর্লভ হালদারের না ঐ হাঁড়ি-ঠনঠন ফুটো জমিদারের?

৩৪

ঝাঁপায় যাবার পথে বড় বড় গাঙ। বাচ্চা ছেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে—তাই ডিঙি-পানসি নয়, একখানা মেদিনীপুরে-নৌকা ভাড়া করে নিয়ে এল। এ এক বিচিত্র যান—জোয়ার-ভাঁটার অপেক্ষা রাখে না, বাতাস পেলেই হল। একেবারে উল্টো বাতাস হলে মুশকিল বটে—কিন্তু সামান্য এদিক-ওদিক হলে আর ভাবনা নেই, বাদাম তুলে তরতর বেগে নৌকা ছুটবে। দক্ষিণা বাতাসে ভর করে পুব-পশ্চিম-উত্তর কিম্বা বায়ু-ঈশান-অগ্নি-নৈঋত—কোন দিকে যেতে আটকায় না এ নৌকার। আর গোন পেলে তো কথাই নেই—স্টিমার বা মোটরলঞ্চের সাধ্য নেই এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে উঠবার। কল হার মেনে যায় মানুষের হাতের কৌশলের কাছে।

দুটো বড় নদীর মুখ—খোলপেটুয়া আর কদমতলী। নদী-খাল এ-সময়টা ভারি শান্ত, নির্মেঘ আকাশের নিচে রোদ পোহাতে পোহাতে ঘুমোয় যেন পড়ে পড়ে। কিন্তু কদমতলীর মোহানায়

এসে কেতুচরণ হেন লোকেরও বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে। দক্ষিণে অনেক দূরে অস্পষ্ট অতি-ক্ষীণ বনরেখা। আর সব দিকে কালো জল। জল ছলছল করছে নৌকার তলায়, ঢেউয়ের দোলায় নৌকা দুলে উঠছে মাঝে মাঝে। কোনদিন যে কূলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, এমনি জায়গায় এলে কেমন ভুলে যেতে হয়। ছল-ছল ছলাৎ-ছলাৎ অবিশ্রান্ত একটানা শব্দ। নৌকা দেখে ঘুমভাঙা ঢেউয়ের দল ছুটে এসেছে কথাবার্তা কইতে---আগে ছিল না বুঝি কোন রকম শব্দ! রূপার পাতের মতো দিগন্ত বিস্তার দূরের জলরাশি দেখে ঠিক তাই মনে হয়—ওদিকে ঢেউ নেই, ক্ষীণতম শব্দও নেই। কেতুচরণ অনেকবার এসব জায়গা অতিক্রম করে গিয়েছে, কখনো পথ ভুল হয় না তার, কখনো কিছু মনে আসে না। চুপচাপ হাল ধরে ঝিমোয়—কিছু অসুবিধা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি জাগ্রত হয়ে কঠিন হাতে ঘন ঘন বাইতে থাকে। সঙ্কট কাটিয়ে কলকেয় আগুন তুলে আবার ধোঁয়া ছাড়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে। এই তার চিরকালের অভ্যাস। যেমন আমরা সহজভাবে ডাঙায় পথ চলি, কেতুচরণের হাতে নৌকা বাওয়াও অবিকল তাই।

কিন্তু আজকে মন উতলা হচ্ছে ডাঙার স্পর্শ পাওয়ার জন্য। আরও কতক্ষণ বাইতে হবে, আরো কত জল অতিক্রম করতে হবে।

পড়ন্ত রোদ জলে চিক-চিক করছে। তিন-পো ভাঁটি সরে গেছে, অতএব অত্যন্ত সাবধানে এগুতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাইবার উপায় নেই। হরিপদও যাচ্ছে এই সঙ্গে—গলুয়ে বসে একটি মাত্র হাতে সে জল মাপছে, আর চেঁচিয়ে শোনাচ্ছে কেতুচরণকে। ঋষিবর আর গোল-পাঁচু দু-পাশের দাঁড়ে রয়েছে।

বিষম চড়া এদিকটায়। সমস্ত কেতুচরণের নখদর্পণে। তবু বলা যায় না—একটা বিপদ হতে কতক্ষণ!

হল তাই সেদিন। কেতুচরণ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ছেলেটা বিষম কান্না লাগিয়েছে। বোতলে করে দুধ এনেছিল—অনেকক্ষণ তা ফুরিয়ে গেছে। ক্ষিধে পেয়েছে। নেংড়ের হাটখোলায় পৌঁছতে পারলে দুধের চেষ্টা করা যেত—সেখানকার ময়রার দোকানে দুধ থাকে কখনো কখনো। কিন্তু পৌঁছনোর দেরি অনেক। কেতুচরণ ভাবছিল, এইরকম কাঁদতে কাঁদতে দম আটকে যদি ফৌত হয়, অনেক হাঙ্গামা মেটে—অত দূর ঝাঁপা অবধি নৌকা নিয়ে যাবার প্রয়োজন থাকে না। মরা ছেলে জলে ফেলে দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে তাহলে এলোকেশীর তল্লাসে তারা বেরিয়ে পড়ত এখান থেকেই। মধুসূদন রায় খপ্পরে নিয়ে ফেলেছে। গাঙ শুকোলেও সেটা খাল হয়ে থাকে। নেই, নেই—তবু লোকবল অর্থবল যা আছে, দু-দশটা দুর্লভ তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। এ হেন লোকের ব্যাপারে যা করতে হবে, অতি-দ্রুত করে ফেলা উচিত—তিলমাত্র সময়ক্ষেপ বিধেয় নয়। সময় পেলে এলোকেশীকে কোন রাজ্যে চালান করে দেবে, ঠিক কি? সমস্ত তখন পণ্ডশ্রম।

কিন্তু সে হবার জো নেই ঐ শুয়োরের বাচ্চার ঠেলায়। হ্যাঁ—শুয়োরের বাচ্চাই বলছে সে ছেলেটাকে মনে মনে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। রুষ্ট বিরক্ত দৃষ্টিতে কেতুচরণ তাকাচ্ছে একবার জ্যোৎস্নাভূষণ আর একবার দুর্লভের দিকে। দুর্লভ সঙ্গে না থাকলে কোন-একটা অতি-সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা করে ফেলত সে নিশ্চয়ই। ব্যবস্থা সেরে আজকে রাত্রের মধ্যেই গিয়ে পড়ত

কাছারিবাড়ি। লোলজিহ্ব প্রলয়াগ্নির আলোয় শেষবারের মতো সে হাত এঁটে ধরত এলোকেশীর—মরি মরি, কত রকম খেলাই খেললি কতজনকে নিয়ে! কত সাধ আমার পায়ে দলেছিস! ভালবাসিস তুই শুধু নিজেকে, নিজের সুখ-সম্পদ রূপের জৌলুষ আর ভোগ-কামনাকে। কেতুর অন্তরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ঠিক এমনি করেই সে ভাবতে পারে না—কিন্তু মনের কথাগুলো বোধ করি মোটামুটি এই।

কত কি ভাবছে? হরিপদ জল মেপে বলল, দেড় হাত—। তবু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে সে হাল ছুঁয়ে আছে। ঋষিবর মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে, করছ কি—হয়েছে কি তোমার? বাইরে ঘুরিয়ে দাও নৌকোর মুখ।

ততক্ষণে নৌকা চরের উপর উঠে গেছে! একদিকে কাত হয়ে পড়েছে—কোনক্রমে সিধা রাখা গেল না। কল-কল করে খোলে জল উঠছে। দুর্লভ লাফিয়ে পড়ল নৌকা থেকে। জল একহাঁটুও নয়। নোনা কাদায় পা এঁটে গেল। তলিয়ে যাচ্ছে নৌকা।

আসন্ন সন্ধ্যায় সেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুর্লভ চিৎকার করছে, খোকা আছে যে ছইয়ের মধ্যে! হায় মা কালী, হায় মা কালী! গাঁজায় দম দিয়ে এসেছিস হারামজাদা—সর্বনাশ করলি—একেবারে শুকনো ডাঙায় বানচাল করলি?

কেতুচরণ নৌকা থেকে গর্জন করে উঠল, গালমন্দ কোরো না বলছি, খবরদার!

দুর্লভ চমকে ওঠে। সীমাহীন জল—কোনদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই এদের এই ক'টি প্রাণী ছাড়া। মর্জাল-স্টেশনে যে

মেজাজ চলে, এখানে তা চলবে না। এদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে--বাঁচবার উপায় যদি কিছু থাকে, এরাই করতে পারবে।

কেতুচরণ পরম শান্ত, নির্বিকার। নৌকা থেকে এইবার চরে নামল। দেখে শুনে আস্তে' আস্তে নামছে। যেন নিরাপদ ঘাটে এসে ভিড়ছে, এমনি ভাব। কেতুর কোলে ভিজে কাঁথায় জড়ানো জ্যোৎস্নাভূষণ। কাঁদছে না, শব্দ-সাড়া নেই।

তুর্লভ হাত বাড়াল ছেলে নেবার জন্য।

বেঁচে আছে তো রে?

কেতু বলে, প্রাণের ভয়ে গাঙে লাফ দিলে, তখন তো এসব কিছু খেয়াল ছিল না!

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠ। অনেক জ্বালিয়েছে। অনেক দিনের বিস্তর রাগ পোষা আছে—কায়দায় পেয়ে সেসব বেরিয়ে আসছে এখন। তুর্লভের আগ্রহ সে আমল দিল না, তার দিকে এগোল না। আরও খানিকটা দূরে সরে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে দাঁড়াল। বারংবার তাকাচ্ছে সে জ্যোৎস্নাভূষণের দিকে।

কেঁদে কেঁদে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে—বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখতে কালো কদাকার—তবে গা-হাত-পা বেশ নরম। নিষ্ঠুর হাসি একবার খেলে যায় মুখের উপর দিয়ে। দেবে নাকি গাঙের জলে ছুড়ে শয়তান বাপটার চোখের সামনে? তুর্লভ কাঁদুক—দু-চোখ ভরে দেখে কেতুচরণ তৃপ্তি পাবে।

শেষ-ভাঁটা। জায়গায় জায়গায় চরের কাদা জেগেছে। চরে তারা আটকা পড়ে গেছে। কাতরকণ্ঠে তুর্লভ বলে, উপায় কি হবে কেতু?

ঋষিবরের দিকে চেয়ে কেতুচরণ বলে, দেখ দিকি ভাই, জল ছেঁচতে পারা যায় কিনা?

নৌকার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে, তারপর জলের নিচের কাঠে হাত বুলিয়ে ঋষিবর ঘাড় নাড়ে।

উঁহু—তলি ফেঁসে গেছে একেবারে।

কপালে করাঘাত করল দুর্লভ। আরে সর্বনাশ! উপায়—উপায় কি এখন?

সাঁতার জানো? উই যে—উই...অল্প-অল্প দেখা যাচ্ছে ডাঙার নিশানা।

ডাঙার জন্য দুর্লভ প্রাণপণে দৃষ্টি বিসারিত করে। কিছুই নজরে আসে না।

কই বাবা?

কানা নাকি?

এ অবস্থায়ও কেতু রসিকতা ছাড়ে না। তোমার সেই নীল চশমা চোখে পরো—তা হলে দেখতে পাবে।

ঋষিবর বলে, চোখে দেখেই বা মুনাফা কি হবে বাবু? এই কোণাকুণি পাড়ি ধরো। মাঝে মাঝে মাটি পায়ে ঠেকবে, তখন জিরিয়ে নিও। জোয়ার আসবার আগেই যাতে ডাঙায় উঠে পড়তে পারো, তাই করো।

ডাঙা কদ্দূর?

কেতু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

দড়ি ধরে মাপতে গেছে কে? ক্রোশ দুই-চার হবে আর কি!

ওরে বাবা! দু-ক্রোশ হতে পারে, চার ক্রোশও হতে পারে? দুর্লভের হাতে পায়ে খিল ধরে আসছে। কেতুচরণ ব্যঙ্গের

সুরে বলে, আমরা তাহলে এগুতে লাগি। জোয়ার এলে টান সামলানো যাবে না, কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ভাসিয়ে নেবে। দোষ নিও না—সবসুদ্ধ মরে মুনাফা কি? নাও—ধরো তবে তোমার জিনিস—

ছেলে এগিয়ে ধরল দুর্লভের দিকে।

দুর্লভ হাহাকার করে ওঠে।

তুই ধর্মবাবা কেতু। আমাদের প্রাণে বাঁচা—যা চাস, তাই দেবো।

গোল-পাঁচু কেতুচরণের হাত ধরে সজোরে টান দেয়! এতক্ষণে সে কথা বলল। বলে, চলো—মরুকগে ওরা। সবসুদ্ধ ডুবে মরুক।

পাঁচুকে সরিয়ে দিয়ে কেতু জবাব দিল, তোমাদের বাপ-বেটা দুটোকে নিয়ে সাঁতরাবো? তবেই হয়েছে! দেড়শ-মনি নৌকো ফেঁসে গেল, এখন আমি যাবো ঘাড়ে তুলে নিতে?

জল ছপ-ছপ করে তারা এগিয়ে চলল। হরিপদ পিছন থেকে অনুনয় করে, ছেলেটাকে নিয়ে যা অন্তত। বাবুর নিজের তাল দেওয়াই শক্ত। ছেলে আর কতটুকু ভারি—নিয়ে যা ভাই, তোদের গায়ে লাগবে না।

ফিরে দাঁড়িয়ে কেতুচরণ বলে, একশ' খানি টাকা লাগবে পুরোপুরি। ছেলে যখন আনতে যাবে, নগদ টাকা গণে দিয়ে আসবে। পাঁচ কুড়ি—একটি আধেলা কম নয় তার থেকে। দরদস্তুর করো তো পথ দেখি—

দুর্লভ বলে, তাই পাবি—বেকায়দায় পড়ে গেছি যখন।

ঋষিবর গা টিপে বলে, হাঙ্গামা জড়াস নে কেতু। দুর্লভ

হালদার না-ই যদি উঠতে পারে, তোর টাকা আদায় হবে কোত্থেকে শুনি ?

কেতুচরণ তার সদুপদেশে বিশেষ কান দিল না। হেসে উঠে বলে, কি হালদার মশায়, উঠতে পারবে গাঙ পাড়ি দিয়ে ? গতিক দেখে তো ভরসা হয় না। মরে যাও তো টাকার উপায় কি হবে, বলো। ঝাঁপার বৈকুণ্ঠ ধর নেবে তো একশ' টাকায় ছেলে ছাড়িয়ে ? না—চালাকি করে আমার ঘাড়ে গছাচ্ছ ?

ছেলেটাকে দুর্লভের হাত থেকে এক রকম ছোঁ মেরে নিয়ে কেতু কাঁধের উপর তুলল। বলে, ইঃ—হালকা যেন শোলা! খাওয়া-টাওয়াও না তো! একজনের জিম্মায় ফেলে রেখে এর কানাচে ওর কানাচে বিড়াল-কুকুর ডেকে ডেকে বেড়াও। তারও উড়ু-উড়ু মন—ছেলে খাওয়ানোর ফুরসৎ কখন ?

ঘোর হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী তিথি। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল। নির্নিরীক্ষ চারিদিক। বিষম নোনা এ সব জায়গায়। জলস্রোতে আগুনের আভা দেখতে পাওয়া যায়—ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দীর্ঘব্যাপ্ত আলো ফুটে ওঠে। হাতে জল নাড়লেও আলো ঝিলিক দেয়। ছেলেটাকে পুঁটলির মতো কাঁধের উপর রেখে কেতুচরণ আরও অনেকটা দূর পায়ে হেঁটে গেল—তারপর জল গভীর হলে সাঁতরাতে লাগল। ঋষিবর আর গোল-পাঁচুও কাছাকাছি কোন্ দিকে সাঁতার দিচ্ছে—জল-তাড়নায় টের পাওয়া যায়।

নিঃসীম বিপুল জলরাশির মাঝখানে হাত কয়েক কর্দমাক্ত জায়গায় দুর্লভ আর হরিপদ দাঁড়িয়ে। জোয়ার আসবে ঘণ্টা দুয়েক পরে—তখন আর চিহ্ন থাকবে না এই জায়গাটুকুর। ব্যাকুল

দুর্লভ বলছে, হাঁক দে রে হরিপদ—কাছাকাছি যদি কোন নৌকো থাকে।

চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে হরিপদ। জনমানবের সাড়া নেই। নৌকা খুব কমই এ অঞ্চল দিয়ে গতায়াত করে। দুর্লভ চোখ বুজল। চোখ মেলে থাকা আর চোখ বোজার মধ্যে তফাত নেই এ জায়গায় এমনি অবস্থায়। দেহ পরিশ্রান্ত, অবশ। ভাবনার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেছে। নিরুদ্যম সে থর-থর করে কাঁপছে। আর পাশে দাঁড়িয়ে হরিপদ অবিশ্রান্ত চিৎকার করছে, হোই গো—কে আছ কোন্ দিকে—আমাদের নিয়ে যাও। মারা পড়ি গাঙের মধ্যে—

৩৫

জ্যোৎস্নাভূষণকে বুকের উপর ধরে কেতুচরণ চলেছে। ঋষিবর ও গোল-পাঁচু কোন্ দিকে ভেসে গেছে। এসে পৌঁছবে নিশ্চয়। গাঙে খালে ডুবে মরার মানুষ ওরা নয়। ওদের দেহ জলতলে, শোলার মতোই, ডুবতে পারে না কখনো—সাঁতার না দিলেও ভেসে থাকবে। কিন্তু এখন অবধি পাত্তা নেই। কতদূর ভেসে গেছে, কে জানে ?

রাত দুপুর—কিম্বা তারও বেশি হয়তো। কুক্ষণের যাত্রা আজকে। বড় ধকল গিয়েছে নৌকা বানচাল হবার পর থেকে। হাঁটুভর কাদা, নোনা কাদা—যেন মনখানেক ভারী বুটজুতো পায়ে সে চলেছে। এই কাদা ধুয়ে ফেলে পায়ের নিজস্ব মূর্তি বের

করতে অন্তত আধঘণ্টা সময় ও ছ-সাত কলসি জলের দরকার হবে। ছেলেটাকে এক হাতে উঁচু করে ধরে তুলে আর এক হাতে জল কাটাতে হল দীর্ঘক্ষণ। হাত দু-খানা অসাড় হয়ে গেছে। বাসায় পৌঁছতে পারলে যে হয়! বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেবে। আর পারা যায় না—হাত-পা মেলে যেখানে হোক গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।

হন-হন করে চলেছে। পদে পদে ঠোক্কর খাচ্ছে উঁচু-নিচু পথে দ্রুত চলতে গিয়ে। বর্ষাকালে মাছ ধরার চারো-দোয়াড়ি পেতে তার উপর কাঁটা বিছিয়ে রাখে। সেই ছড়ানো কাঁটায় পা পড়ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু কেতুচরণ গ্রাহ্য করে না এসব। পায়ের তলায় চামড়া তো নয়, লোহা—সেখানে কাঁটা বেঁধে না। ঠোক্কর লাগলে চামড়ার উপ্পরটায় ঝনঝনিয়ে আওয়াজ হয় বোধহয়—ঠোক্কর লাগল এই পর্যন্ত; স্নায়ুতে তার কিছুমাত্র সাড়া জাগে না। আঘাতে কেতুর কোন ক্ষতি নেই—তবে ছেলেটার বেকায়দা না লাগে! একশ' টাকার ছেলে—যে মূল্যে একদিন টুনিকে নিয়ে সংসার পাততে পারত।

ক্ষিদেয় ও ঘুমে ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে, মাখনের মতো লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। ভারি হাল্কা—একটা কোমল তুলোর বালিস যেন কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে চলেছে।

তেমাথার কাছে ছায়ার মতো এক মূর্তি। ফাঁকা মাঠ—হু-হু করে গাঙের বাতাস বইছে। কোন দিকে একটি প্রাণী নেই। গা ছমছম করে ওঠে আচমকা এই জায়গায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দেখে।

কে?

উমেশ বাঁধের উপর এসে উঠল।

কেতুচরণ বলে, থানে চলেছ—আতরবালার ঘরে? আমরা যে এত ডাকাডাকি করি, খবর পৌঁছয় না?

জড়িত কণ্ঠে উমেশ বলে, হ্যাঁ—ডেকেছিলে বটে সেদিন!

তবে? থানের ঠাকরুন ছুটি দেয় না বুঝি? মেলা ভেঙে গেল, পাড়া খা-খা করছে, ও মাগী পড়ে রয়েছে কেন এখনো?

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে কেতু আবার বলে, আষ্টেপিষ্টে পিরীতের বাঁধন পড়ে গেছে—উঁ?

উমেশ হাসি-মস্করার ধার দিয়ে গেল না। সহজভাবে বলল, জমির টাকা পেতে দেরি হচ্ছে—তাই আটকা পড়ে আছে। টাকাটা হাতে পেলেই চলে যাবে!

কানাঘুষো কেতুচরণও কথাটা শুনেছে। কিন্তু অতখানি বিশ্বাস করে নি। আজকের স্পষ্টাস্পষ্টি কথায় সে স্তম্ভিত হল।

দু-বিঘের ঘেরিটা নাকি বিক্রি করে দিয়েছ?

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে উমেশ নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে, এর জন্য রাগের অন্ত নেই তার উপর। খরকণ্ঠে কেতু বলে, মোড়ল-বাড়ির এত জুতজাত—সমস্ত তো ঐ দু-বিঘেয় ঠেকেছিল। বছর-খাওয়ার ধানটা তবু পেতে। তা-ও ঘুচিয়ে দিলে? মেয়েজাতের যা রীত, টাকা হাতে পেলেই লাথি মেরে ছিটকে পড়বে। চিরকাল ধরে তোমায় খাওয়াবে, আদর-যত্ন করবে—স্বপ্নেও তা মনে জায়গা দিও না।

উমেশ বলে, বিস্তর ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়েছে। শোধ না হলে এক পা এখান থেকে নড়তে দেবে না। আমি জামিন হয়েছি টিকে সর্দারের কাছে। জমি না বেচে করব কি?

তার পরে—তোমার উপায় ?

উমেশ নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, সে যা হয় হবে। বুড়ো হয়ে গেলাম—আমি আর ক'দিন ?

কেতুচরণ বলে, আমিও তাই জিজ্ঞাসা করি। বুড়ো বয়সে এই ব্যারাম কেন ?

কথা বলতে বলতে কেতুচরণ হঠাৎ পা সরে পড়ে গেল। ছেলেটা ছিটকে পড়ছিল ভুঁয়ে—সামলে নিল। খুব সামলেছে। জেগে উঠে তখন কাঁদতে লাগল। সে কি কান্না! এক গলার ভিতর দিয়ে দু-পাঁচ গণ্ডা হাঁড়িচাচা ডাকছে, এমনি মনে হয়।

উমেশ প্রশ্ন করে, ছেলে না মেয়ে ? পেলে কোথায় ?

বিব্রত কেতু বলে, উড়ো-আপদ কাঁধে চেপেছে। কি করি যে একে নিয়ে!

আহা-হা, ও রকম বলে না। শিশু হলেন দেবতা—অনেক পুণ্যে ওঁরা আসেন।

আ-আ আ-আ—করে কেতুচরণ ছেলেটাকে তুলে ধরে দোলাচ্ছে। লোহার মতো হাতের চাপে কান্না বেড়ে যায় আরও।

উমেশ এগিয়ে এসে সাধুভাষায় কথকতার ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দেয়।

বলি, ভীত ত্রস্ত সন্তপ্ত কেন হে রাজকুমার ? কোন চিন্তা নাই—চিন্তামণির চিন্তা দেখে লাজে মরে যাই।

কথকতা কিছুই কাজে আসে না। তখন উমেশ ঢোলকে ঘা দিল। ভারি মজা তো—শিশু থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

স্ফূর্তি পেয়ে ঢপাঢপ বাজাতে লাগল উমেশ। চাঁদ উঠেছে,

ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখতে পাওয়া গেল, জলভরা চোখ মেলে শিশু ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।

হেসে উঠে উমেশ বলে, দেখছ কেতু, আমার এই আর-একজন নতুন সমজদার জুটে গেলেন—

আরও কয়েকবার জোরে জোরে বাজিয়ে উমেশ বাঁয়ে নেমে গেল। আতরবালার বাসা ঐদিকে। এত কথা রটেছে, তবু উমেশ একেবারে নিঃসঙ্কোচ। এতটুকু যে লজ্জার ব্যাপার আছে, চালচলনে তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই। বাঁয়ের পথে সে পাড়ার মধ্যে ঢুকছে।

বাজনা বন্ধ হতেই জ্যোৎস্নাভূষণ ডুকরে কেঁদে ওঠে। কি জ্বালা, দুর্লভ হালদারের বেটা এমন বাদ্যরসিক হয়ে উঠল কি করে? কান্নার চোটে দম ফেটে মারা যাবে নাকি? কেতুচরণ ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, হল না ওমশা—তুমি এদিকে এসো। সায়ের অবধি পৌঁছে দাও। সেখানে আর সকলে রয়েছে—তারপর যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যেও।

জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে সায়েরের ঘরের ভিতর। চাল তোলা হয়েছে, কিন্তু ছাওয়া পুরোপুরি এখনো হয়ে যায় নি। মেজে কিছু উঁচু করে বসা-ওঠার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। গোল-পাঁচু ও ঋষিবর অনেকক্ষণ এসে গেছে—ছেলে নিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার দরুন কেতুর পৌঁছতে এতটা দেরি হল। ঋষিবর এসেই বেরিয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে—সবাই শুকনো মুখে কাঠ হয়ে বসে আছে, তার কোন রকম ব্যবস্থা করা যায় কি না? আর আছে খুশাল ও গুলি-পাঁচু। গুলি-পাঁচু মাছের ব্যাপারি—ভাঁটা শেষ হয়ে জলের টান ফিরছে, মাছ ধরে ফিরবার বড় বেশি দেরি নেই—

লা-ভাঙার দিকে তাকিয়ে সে মেছো-নৌকার অপেক্ষায় আছে। অন্য ব্যাপারি আসবার আগে যদি মাছের ঝুড়ি নামে, সস্তায় কিছু দাঁও মারতে পারবে।

রীতিমতো শব্দ-সাড়া করে কেতুচরণরা এল। অনেক বাজনা বাজিয়েও উমেশ কান্না থামাতে পারে নি এবার। শিশু কাঁদছে—ব্যাপারটা অভূতপূর্ব এ জায়গায়। সবাই তাদের ঘিরে দাঁড়াল।

গুলি-পাঁচু বলে, আঃ—সরে দাঁড়াও না গো! কেমন ছেলে এনেছে, দেখি—

উমেশ একগাল হেসে বলে, রাজকুমারের মুখ দেখবে—তা নজরানা কই? কত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চতুর্দোলায় চড়িয়ে বলে নিয়ে এলাম—হেঁ-হেঁ—মাংনা হবে না।

ক্লান্ত কেতুচরণ হোগলার চাটাই-এর উপর ধপ করে ছেলে নামিয়ে দিয়েছে। খুশালের দিকে বাঁ-হাত বাড়িয়ে বলে, কই?

জল-ঝাঁপাঝাপি করে বড় কষ্ট হয়েছে, এক কলকে চড়াবে এবার। দেহ-মন চাঙ্গা না করে আর কিছু নয়। ফোঁটা কয়েক জলে ভিজিয়ে নিয়ে-বাঁ হাতের চেটোয় নিঃশব্দে সে গাঁজা টিপতে লেগেছে।

গুলি-পাঁচু বলে, ক্ষিধে পেয়েছে তাই অত কাঁদছে। খেতে-টেতে দে—

কেতু বলে, দে না। মানা করছে কে? আমি যে মরার দাখিল হয়েছি এদিকে—

নতুন এই হাঙ্গামা জোটানোয় খুশাল একেবারে খুশি নয়। বিরক্ত স্বরে সে বলে, বয়ে গেছে। আমরা আনি নি। আপদ জুটিয়ে আনলি কি জন্য?

টাকা দেবে।

গোল-পাঁচুর দিকে তাকিয়ে বলে, বলিস নি কিছু? একশ'খানি করকরে টাকা। তিন মাস সায়ের চালিয়েও অত হবে না।

ছেলে কাঁদতে লাগল। একটা দম দিয়ে কেতু কলকেটা দিল খুশালের হাতে।....ভুল করেছে, মোটা টাকার লোভে পড়ে বিষম অন্যায় করেছে সে। কত বড় দায়িত্বের ব্যাপার, বুঝতে পারছে এখন। দুর্লভের আর ডাঙায় উঠে আসতে হবে না কদমতলীর মুখ থেকে! কোথায় এখন বৈকুণ্ঠ ধরকে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে ছেলে গছাবার জন্য? দুর্লভ-শয়তানের কথা—হয়তো বৈকুণ্ঠ বলে মানুষই নেই ঝাঁপায়। আর কোনখানে নিয়ে চলেছিল, অন্য কি মতলব ছিল। ও যা লোক—ভাজবে ঝিঙে তো বলবে পটল। আগা-গোড়া না ভেবে ঝোঁকের মাথায় এই এক কাণ্ড করে বসল—কেতুচরণের এখন অনুতাপ হচ্ছে। একটা হাঁস পোষার ঝঞ্ঝাট পোয়াল না সে জীবনে—এ জলজ্যান্ত একটা ছেলে! কান্নার চোটে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিয়ে দিচ্ছে···কিন্তু সত্যি সত্যি তো গলা টিপে শেষ করে দেওয়া যায় না! নদীজলের নিশ্চিত সমাধি থেকে এত কষ্ট করে এত দূর তবে নিয়ে এসেছ কেন?

উমেশ বলে, ক্ষিধেয় চোখ উলটে পড়বে এক্ষুণি। টাকা নেওয়া তোমার বেরিয়ে যাবে।

কেতুচরণ অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকায়। তাই তো, কি করা যায়? কোন উপায় ভেবে পাচ্ছে না। আর সেইজন্য রাগ বেড়ে যাচ্ছে—নিজের গালে চড় খেতে ইচ্ছে করছে।

গুলি-পাঁচু বলে, ঢোক খানেক জল খাইয়ে দাও গে। গলাটা অন্তত ভিজুক।

কেতুচরণ বলে, দেখ না ভাই চেষ্টা করে—

গুলি-পাঁচু হেসে উঠল।

তুই টাকা মারবি, আর ছেলে খাওয়াতে বসব আমি? বয়ে গেছে।

রেগে উঠে কেতু বলে, যা—যা, বেরো তবে এখান থেকে। ভিড় বাড়াস নে। মাছের নৌকো এলে তখন এসে জুটবি, কাজ মিটলে সঙ্গে সঙ্গে আবার সরে পড়বি। আড্ডা দেওয়া চলবে না। পালা এখন—

গুলি-পাঁচুর কিন্তু চলে যাবার লক্ষণ নেই। হাসিও থামছে না। হাসির রকম দেখে কেতু কেমন অপ্রতিভ হয়ে যাচ্ছে। কি ভেবেছে এরা? ভালবেসে কাঁধে তুলে নাচাতে নাচাতে নিয়ে এসেছে, এই বুঝল নাকি? পোয়া পাঁচেক ওজনের বিকটদর্শন এক বাচ্চা—ভালবাসা কি করে আসে তার উপর? নিছক ব্যবসায়ের ব্যাপার। এই গুলি-পাঁচুই যেমন এখানকার মাছ বাদার বাইরে হাটে নিয়ে গিয়ে তিন-চার টাকা মুনাফা করে আসে। মোটা মুনাফার লোভেই তো সে দায়ে ঠেকেছে। গুলি-পাঁচু পুরানো ব্যাপারি হয়েও ব্যাপার-বাণিজ্যের এই সোজা কথাটা অন্য রকম ভাবছে কেন?

কলসির জল গড়িয়ে ফেরো মুখের কাছে ধরল। সে এক মুশকিল—জল খেতে পারে কি ফেরো থেকে? যেটুকু মুখের ভিতর যায়, তার দশগুণ গড়িয়ে পড়ে বাইরে। কান্না বন্ধ করে কেমন চুক-চুক করে খাচ্ছে দেখ। ক্ষিধে-তেষ্টায় বড্ড কাবু হয়ে পড়েছে সত্যি। কলকেয় নুড়ি ধরাবার জন্য টেমি জ্বেলেছিল, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন সেই আলো দেখা হচ্ছে। কি দেখছে অমন করে যে নজর ফেরে না?

উমেশ বলল, শুধু জল খেয়ে কতক্ষণ থাকবে? পেটে ভর হয়, এমনি কিছুর জোগাড় দেখ।

গোল-পাঁচু বলে, ঋষিবর রস আনতে বেরিয়েছে। তাই দু-চার ঢোক খাওয়ানো যাবে। সবুর করো একটু।

রস অর্থাৎ খেজুর-রসের তাড়ি। হি-হি করে হেসে খুশাল তারিফ করে, খাসা বলেছে। সেই বেশ ভাল হবে। মিঠে লাগবে, আর নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকবে।

উমেশ হাঁ-হাঁ করে ওঠে। আহা, শিশু—দেবতা। দুধের জোগাড় দেখ গো তোমরা। মাতার অভাবে সুরভি-মাতার শরণাপন্ন হও।

আবাদের চাষীরা দূরে দূরে এক-একটা ডাঙার উপর পাড়া বসিয়েছে—দুধ সেখানে দুষ্প্রাপ্য নয়। চাষের জন্য লোকে লাঙল-গরু আমদানি করেছে, বুদ্ধি করে গাই-গরুও এনেছে কেউ কেউ। চাষ চলে, দুধ খাওয়াও হয়। হিন্দু-চাষার মধ্যে অবশ্য অনেকেরই আপত্তি এই ব্যবস্থায়। মা ভগবতীর কাঁধে জোয়াল চাপানো—পরলোকে যমদূত ডাঙস মারবে যে এই অপরাধে। বুনোরা এসব মানে না। জিতু সর্দার গরু ছাড়া এক-জোড়া মহিষও এনেছে—মহিষ দিয়ে চাষ করায়, দুধ দেয় তার একটা।

উমেশ আজকে যাবে না আতরবালার কাছে—যাবার মন নেই। মাটির উপর জাবড়ে বসে বাঁ-হাতে ঢোলকে মৃদু ঘা দিচ্ছে—আর ডান-হাতে টেমি ঘোরাচ্ছে ছেলের মুখের উপর—ঠাকুর-প্রতিমার সামনে পঞ্চপ্রদীপের আরতি করে যে রকম। ছেলে হাত-পা নাড়ছে—আঁ-আঁ আওয়াজ করছে আলোর দিকে চেয়ে।

উমেশ মাথা নিচু করে ছেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে,

এই ঘরদোর পছন্দ নয় বুঝি রাজকুমারের ? অ[illegible] বসনের অতিরিক্ত অসুবিধা ?

গুলি-পাঁচুও দেখছিল নিষ্পলক চোখে। কেতুচরণের সে হাত ধরে টানে।

না খাইয়ে বাঁচাবি কেমন করে ? এখন ঠাণ্ডা আছে, আবার ক্ষেপে যাবে। চল্—

কেতু বলে, তুইও যাবি ? তোর ব্যাপার-বাণিজ্যের কি হবে ? মাছ এসে উঠবে তো এইবার !

যাকগে আজ। দায়ে-বেদায়ে যদি কাজ কামাই না করব, স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমেছি কেন ? রায়বাবুর জমি বন্দোবস্ত নিয়ে লাঙল ঠেললেই তো হত !

একটা মেটে-হাঁড়ি খুঁজে-পেতে নিয়ে চলল। উমেশকে কেতুচরণ বুঝসমঝ করে দিয়ে যায়, রয়ে গেলে তো ? তাই থাকো—খুশাল ওরা তো এখনি সায়ের নিয়ে মেতে পড়বে। তুমি কাছে বসে থেকো। ভুলিয়ে রাখবে, কাঁদে না যেন। আমরা দুধের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

হা-হা করে উমেশ হেসে উঠল। সবাই হাসে কেন আজ কেতুর কথায়—তার কি হয়েছে ? ফিরে দাঁড়িয়ে কেতু কৈফিয়তের ভাবে বলে, কেঁদে কেঁদে মরে গেলে টাকা দেবে না যে ! এদ্দূর এই বওয়াবয়ি সার হবে। হালদার হারামজাদা উল্টে আবার কোন্ ফ্যাসাদে ফেলে তারই বা ঠিক কি ?

বুনোপাড়াটা কাছাকাছিও বটে—ক্রোশ দেড়েকের মধ্যে। বুনো নামে পরিচিত এরা একদা পাহাড়-অঞ্চলের জঙ্গলে থাকত। এমন পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু জাত বড় দেখা যায় না। এক পাড়ায় ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের বসতি। গাঙের কটু জলে তারা স্নান করে। আবাদের উত্তর সীমানায় চাষীপাড়ার মধ্যে নতুন পুকুর কাটা হয়েছে—তারও জল নোনা, তবে নদীজলের মতো অত উগ্র নয়। বুনোরা সেই জল খায়, সেই জলে রান্নাবান্না করে। ডাল সিদ্ধ হয় না ঐ পুকুরের জলে—কিন্তু ডাল রান্নার প্রয়োজন হয় না। ডাল খাবার সঙ্গতি নেই তাদের।

বুনোপাড়ায় গিয়ে গুলি-পাঁচু ডাকাডাকি করে, ওরে মিঠু, দুধ আছে তোর ঘরে ?

কেতুচরণ তাকে টেনে উঠান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে।

খুব বুদ্ধি! কড়াই-ভরতি দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছে দই-ক্ষীর বানিয়ে খাবে বলে। আর থাকলেও দিচ্ছে ঘুমের মধ্যে উঠে এসে! চলে এসো—

তবে কি হবে ?

এসো না—

ঝাঁপ সরিয়ে সন্তর্পণে তারা গোয়ালে ঢুকে পড়ল। মশার কামড়ে পা ছুঁড়ছে গরুগুলো। ঠাহর করে করে দেখে, দুধাল গরু এ গোয়ালে নেই। কি মুশকিল!

এমনি তিন-চার বাড়ির গোয়াল খোঁজ করে ছুষ্ট বকনার চাটি খেয়ে হাঁড়ির তলায় অল্প একটু দুধ দুয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে তারা ফিরল।

এখন সায়ের লেগে গেছে। লোক জমেছে, নৌকা থেকে মাছের ঝুড়ি এনে এনে সারি দিচ্ছে, টাকা-পয়সার লেনদেন হচ্ছে। সকলে ব্যস্ত এইদিকে। একবার উঁকি দিয়ে দেখে কেতুচরণ অপর ঘরটায় তাদের বাসাঘরে গেল।

কা কস্য পরিবেদনা! না উমেশ, না ছেলে—কেউ নেই সেখানে।

গুলি-পাঁচু বলে, গেল কোথায়?

ভরা জোয়ার। জল বাঁধের কিনারা অবধি ছলছল করছে। বিষম অস্বস্তি লাগছে কেতুচরণের। রাগ করে বলে, মরেছে হয়তো ছেলেটা। ওমশা গাঙে ফেলে দিতে গেছে।

জ্যোৎস্নাভূষণ আবার কেঁদে উঠেছিল। খুশাল তখন বিষম ব্যস্ত সায়েরের কাজে। মুখে মুখে অনেক হিসাবপত্রের ব্যাপার—কান্নাকাটিতে মাথা ঠিক রাখা যায় না। সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিল, নিয়ে যা এখান থেকে আপদ-বালাইটাকে। সরিয়ে নে বলছি—

শিশু হলেন দেবতার অংশ—ভাগ্যবশে ঘরে আসেন। অমন করে কেউ বলে নাকি তাদের? উমেশেরও রাগ হয়। রাগে গজর-গজর করতে করতে সে ছেলে তুলে নিয়ে বেরুল।

কোলে উঠেই ছেলে চুপ।

যা ভাবো তা নয়—ছোট ছেলের অনেক বুদ্ধি। বুঝতে পারে, কোনটা তার আপন-জায়গা। পায়ে পায়ে উমেশ আতরবালার উঠানে গিয়ে উঠল। আতর ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্য দিন উমেশ থাকে—তখনও আতর দরজায় খিল এঁটে ঘুমায় এমনি। উমেশ উঠানের উপর গাছতলায় চুপচাপ বসে থাকে পাহারাদার হয়ে। পাহারা দেয়—কুসঙ্গী কেউ না জোটে। ঢোলক বাজায় না—ঘুম তাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে শুধুমাত্র দুটো-একটা ঘা দেয়। আজকে উমেশ আসে নি—তা সত্ত্বেও আতর যথারীতি দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে। বদ নেশা কেটেছে বোধ হয়। উমেশ বড় খুশি হল। ঘুমোচ্ছে আহা, ঘুমোক! উমেশ শব্দ-সাড়া দিল না—শান্ত হয়ে থাকুক ঘুমিয়ে পরম দুঃখিনী!

ফিরে এল সায়ের-ঘরের দিকে। খুশাল একাই একশ'। গোল-পাঁচুর কোন কাজ নেই—খুঁটি ঠেশ দিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল একপাশে। উমেশ পিছনে গিয়ে তার গায়ে হাত দিল।

মুখ ফেরাতে চোখের ইঙ্গিতে তাকে বেরিয়ে আসতে বলে। উমেশের সঙ্গে গোল-পাঁচুর মাখামাখি নেই। সেকালের সেই গোলমালের জের আছে মনে মনে। উমেশ ডাকছে তাকে কি জন্যে?

বাইরে এসে এসে দেখল, উমেশ গাঙমুখো চলছে হন-হন করে। ভারি মজা তো! ডেকে আবার ওরকম ছোটে কেন?

কি বলবে বলো—

উমেশ বলে, ইদিকে এসো। চেঁচিও না। চুপি-চুপি ক'টা কথা বলব। খুব দরকারি কথা।

হাঁটার যেন পাল্লা চলেছে। কত দূরে নিয়ে যেতে চায় ! গোল-পাঁচু রাগ করে বলে, আর যাব না—এক পা এগোব না এখান থেকে—

উমেশ দাঁড়িয়ে পড়ে। অকারণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বেশ, এখানেই তবে—

কয়েক পা হেঁটে সে-ই পাঁচুর কাছে ফিরে এলো, এসে তার মুখের দিকে চেয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। উমেশ কুঁজো হয়ে বেড়ায়—খাড়া হতেও পারে তবে তো !

আতরকে দেখেছ ?

গোল-পাঁচুর কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

আতর পেশাকার ?

উমেশ বলে, দেখ নি তাহলে তুমি। দেখলে অমন কথা বলতে পারতে না।

দেখেই বলছি ওমশা। হঠাৎ একদিন সামনে পড়ে গিয়েছিল। দেখতে ঘেন্না করে—তাই চোখ বুজে চলি ওদিক দিয়ে যাবার সময়। দেখতে হবে না বলেই শান্তিনগরে পালাই-পালাই করি।

উমেশ বলে, চিনতে পারো নি তা হলে—ও হল পদ্ম। তোমার বোন পদ্মমণি।

না—বলে পাঁচু হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বলে, পদ্ম মরে গেছে। তার জন্যে মা কেঁদে কেঁদে মরে গেল। তার শোকে সাজানো দোকান ফেলে দেশে দেশে ঘুরেছি, এখন খুশালের তাঁবেদারি করে বেড়াচ্ছি।

গোল-পাঁচুর স্বর কাঁপতে লাগল। উমেশ বুঝেছে তার ব্যথা। ভাই-বোনে বড় মিল ছিল—মিলেমিশে গৃহস্থালী পেতেছিল।

ছবির মতো তকতকে সেই ঘর-উঠান-গোয়াল উমেশের মনে পড়ে যায়।

শোন, ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখ কথাটা। সবাই ঝেড়ে ফেলে দিলে মেয়েটা এখন যায় কোথা?

গোল-পাঁচু বলে, তার বলে কত দিকের কত পথ খোলা! তোমার আমার মতন নাকি?...তা বেশ, এ-পথে অরুচি এসে থাকে তো আবার গিয়ে উঠুক পদার কাছে। আপন-জনদের সঙ্গে ঝগড়া করে, ভালমন্দ কোন-কিছু না ভেবে যার হাত ধরে একদিন সে বেরিয়ে পড়েছিল।

যেতে পারলে তো বর্তে যেতো—কথাবার্তার ভাবে বুঝতে পারি।

ম্লান হাসি হাসল উমেশ। বলে, ভারি পয়মন্ত এখন পদা। পদা নয়, হরিপদ—বাবু হরিপদ পুঁই। পদাকে বলেছিলাম আমি। সে-ও তোমার মতো ঐরকম ভারি ভারি জবাব দিল। হ্যাঁ পাঁচু-দা, দু-জনে তোমরা কি এক কথা মুখস্থ করে নিয়েছ?

বসে পড়ল সে বাঁধের উপরে। হাত ধরে পাঁচুকে টেনে বসাল পাশে। সমব্যথী দু-জন—মুহূর্তে ভাব জমে গেছে।

বলে, নীলকমলে দেখলাম পদাকে। আজকে যেমন তোমায় ডেকেছি, তাকেও ডেকে এই রকম হাত ধরে সমস্ত বললাম। কত বোঝালাম—

গোল-পাঁচু রাগ করে বলে, তোমার গায়ে হাত তুলেছিল—কত কাণ্ড তাই নিয়ে! সেই মানুষের হাত জড়িয়ে ধরতে অপমান হল না ওমশা? মানুষ, না কি তুমি?

উমেশ বলে, কদ্দিন বা আছি! তারপরেই তো গাঙের জলে যাবে শুকনো হাড় ক-খানা! আমার আবার মান-অপমান!

একটু চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে বলল, তবু তো পদ্মর কিছু করা গেল না! মরুক গে। চেষ্টা করলে কি হবে, কপালের লেখা খণ্ডানো যায় না।

কোলের উপর ছেলেটাকে উমেশ মৃদু মৃদু দোলাতে লাগল।

গোল-পাঁচু আপনমনে কি ভাবছে। ক্ষণ পরে বলল, পদা মহাপাষণ্ড—তা মানি। কিন্তু সে যখন তাড়িয়ে দিল, ভাইয়ের বোন হয়ে পদ্ম ফিরে এলো না কেন? এসে যদি কেঁদে পড়ত—কাঁদতেই বা হবে কেন—সংসারের সে কি কেউ নয়?—যেমন ছিল, তেমনি যদি আবার জায়গা করে নিয়ে বসত, আমি কি তাড়িয়ে দিতাম? সে তো হল না—চলে গেল ভিন্ন পথে, পাপের পথে। আমাদের মুখ তুলে পরিচয় দেবার উপায় রাখল না।

কৈফিয়ত যেন উমেশেরই দেবার কথা! তেমনি ভাবে সে বলে, বয়সটা খারাপ যে! বারো ভূতে জুটে মন্ত্রণা দেয়—কজনে সামলাতে পারে ও-বয়সে? কিন্তু এখন শিক্ষা হয়েছে। এখান থেকে চলে গিয়ে ভাল ভাবে থাকবে, আমার কাছে কিরে করেছে—

তারপর যে জন্য পাঁচুকে ডেকে নিয়ে এসেছে—সোজাসুজি সেই প্রস্তাব করল।

শান্তিনগর যাবো-যাবো করো—সেখানে গিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হওগে। বোনকে নিয়ে যাও সঙ্গে করে।

সংসারী তুমিই হও ওমশা, বিয়ে-থাওয়া করে—

ক্ষেপেছ? জিভ কেটে উমেশ সেই পুরানো রসিকতার পুনরাবৃত্তি করে, বনে আছ কেন ওহে শালবৃক্ষ? শূল হয়ে কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করো।

হাসতে লাগল উমেশ। ঘাড় নেড়ে গোল-পাঁচু বলে, উঁহু—
দটা কোন কাজের কথা নয়। ভেবে দেখছি, এই সবচেয়ে ভাল।
ুমি তার জন্য এত করছ—আর তারও টান আছে তোমার
ঁপর—

উমেশ হেসে হেসে বলে, আমার উপর নয় রে দাদা! জমি
বিক্রি করে টাকা পাচ্ছি, টানাটানি শুধু সেইগুলো নিয়ে।

তবে যে বললে, ভাল হয়েছে?

উমেশ বলে, অন্যায় দোষ দিলে হবে কেন? যার বোধ-জ্ঞান
াছে সে কি পছন্দ করতে পারে আমার মতো মানুষকে? এই
য রাজকুমার—বয়স হলে তখন কি এমনি চুপচাপ নেতিয়ে থাকবেন
কালের উপর? আঁতকে উঠে ভয়ে পালাবেন। ভগবান মেরে
দিয়েছেন যে চেহারায়!

আবার মিনতি করে, পদ্মর দেনা-পত্তোর শোধ হয়ে গিয়েও
নেক থাকবে। সমস্ত টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আবার দোকান
করো নতুন জায়গায় গিয়ে। ভাল দোকান হবে। মায়ের
পেটের বোন—গাঙের শেওলার মতো ভাসিয়ে দিও না।

পাঁচু নরম হল—আর বড় প্রতিবাদ করল না। বলে, তোমাকেও
যেতে হবে ওমশা। সব খুইয়ে তুমি দুয়োর-দুয়োর ভিক্ষে করে
বেড়াবে নাকি? সে হবে না। না যদি রাজি হও, এইখানে ইতি।
ভাইয়ের মতো তোমায় দেখব, সেইরকম ভাবে থাকবে। কথা
দাও, যাবে তুমি—

কেষ্টচরণ এই সময় এসে পড়ল। উমেশ কৈফিয়ত দেয়, বাবা
বাবা! সুতোশঙ্খ সাপ—সুতোর মতো চেহারা হলে কি হয়,
শাঁখের আওয়াজ বেরোয়। শেষটা এই গাঙের ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে

এনে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তবে শান্ত হলেন। উঃ, মাজা টনটন করছে এতক্ষণ হাঁটাহাটি করে।

কেতু বলে, জলের মধ্যে ফেলে দিলে না কেন? একেবারে আপদ চুকত।

বাসাঘরে নিয়ে এলো ছেলেকে। দুধ-খাওয়ানো হবে। এই আর-এক বিপদ। ঝিনুক নেই, হাঁড়ির কানায় দুধ খাবে কি করে? ক্লান্তিতে কেতুচরণের ঝিমুনি আসছে—হাত-পা ছড়িয়ে গড়াতে চায়। এখন কি ভাল লাগে এত সমস্ত হ্যাঙ্গামা?

গোল-পাঁচু বলে, বেশ তো ঘুমুচ্ছে। থাকুক অমনি। সকাল হোক—তারপর দেখা যাবে।

কেতুচরণ খেঁকিয়ে ওঠে।

তা বই কি! মরে পড়ে থাক, পাঁচ কুড়ি টাকা মাঠে মারা যাক আমার। তোদের কি—তোদের তো বোঝা ঘাড়ে করে কদমতলী পাড়ি দিতে হয় নি!

সমস্যার সমাধান হল অবশেষে। গুল-তামাক মুখে দেয় গুলি-পাঁচু। বেটাছেলের পক্ষে গুল-তামাক মুখে দেওয়া শোভন নয়, পাঁচুরও আগে এ অভ্যাস ছিল না। কিন্তু মাছের ভরা নিয়ে গাঙের উপর অষ্টপ্রহর ছুটোছুটি করতে হয়—এর মধ্যে মুহুর্মুহু তামাক সাজার সুবিধা হয় না। এই জন্য ভেবেচিন্তে সে এই নেশা ধরেছে। একবার তামাক-পাতা ছেঁকে শিলে গুঁড়িয়ে ছাই মিশিয়ে নিতে পারলে অনেক দিনের মতো নিশ্চিন্ত। এই গুল-তামাক খায় বলে তার নাম হয়ে গেছে গুলি-পাঁচু। আর পদ্মর ভাই যে পাঁচু—মোটাসোটা বেঁটে মানুষটি—গোল-পাঁচু বলে তাকে সকলে। দুই পাঁচুকে পৃথক করে বোঝাবার জন্য এই রকম নামকরণ।

গুলি-পাঁচু সুরাহা করে দিল। বড় আকারের গুলের কৌটা ঙ্গে নিয়ে সে বেড়ায়। গাঁটে ধরে না, কোমরের গাঁজিয়ায় টাকা য়সা থাকে, কৌটাও থাকে ঐ সঙ্গে। কৌটার মুখটা সে দিল ধ খাওয়াবার জন্য। প্রায় ঝিনুকের মতো হল। অনভ্যস্ত অপটু াতে কেতুচরণ দুধ খাওয়াচ্ছে। গালের ভিতর দুধ যাচ্ছে ামান্যই—পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

গোল-পাঁচু বলে, যা যা—মুরোদ বোঝা গেছে। পারিস কুস্তি াগতে আর নৌকো ঠেলতে। দুধ খাওয়াতে হলে হাত নরম ়রতে হয়। ও লোহার হাতে হবে না। সর্—

কেতুচরণ বেকুব হয়ে লজ্জিত হাসি হাসে। গোল-পাঁচুর দিকে াকা-চোখে চেয়ে বলে, ওরে আমার মাখনবালা রে!

জুত করে এবার ছেলে কোলে তুলে নিয়ে অতি-যত্নে দুধ াওয়াতে লাগল। হাসি পাচ্ছে তার নিজেরই—সত্যিকার মা য়ে যেন দুধ খাওয়াতে বসেছে! হাজার রকম শয়তানি ও াঙ্গাবাজিতে যার নাম-ডাক, সেই মানুষ ছেলে কোলে এমন াস্তভাবে বসতে পারে—কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে? াগছে ভারি চমৎকার—ঝিমুনি আর নেই, দেহ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ছলে-খাওয়াতে বসে। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে—ফুটফুটে জ্যোৎস্না ড়ে কালো ছেলের মুখ অপরূপ দেখাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে হাঁ ়রছে, আর কেতুচরণ সন্তর্পণে দুধ দিচ্ছে তার গালে। খুব ছলেবেলার কথা মনে নেই—তাকে কে এমন দুধ খাওয়াত, কিছু নে পড়ে না। কিন্তু জ্ঞান হবার পরে এমন কোমল উপলব্ধি হয় ি তার কখনো।

খাওয়ানো মিটল, দুশ্চিন্তার শেষ হল এতক্ষণে। উমেশেরও

মনে বড় শান্তি—দ্রুত-লয়ে ঢোলকের উপর একটা বোল তুলতে যাচ্ছে, কেতুচরণ ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

এইও—

উমেশ অবাক হয়ে তাকায়। আর কেউ নয়—কেতুচরণ বাজাতে মানা করছে, বিশ্বাস করতে পারে না ব্যাপারটা।

একটুখানি আসর হলে হত না? অনেকদিন বন্ধ আছে।

কেতু বলে, তোমার গানবাজনা—গজকচ্ছপের যুদ্ধ। ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে—এক্ষুনি আবার ক্ষেপে উঠবে।

আজকে উমেশের ভারি স্ফূর্তি হয়েছিল—আবার সে মুশড়ে পড়ে। দলের মধ্যে একমাত্র সমঝদার কেতুচরণ—সে-ও বিগড়াল বুঝি ছেলে নিয়ে এসে। কি করবে, মনে মনে ভাবছে। গলায় ঢোলক ঝুলিয়ে ফিরে চলে যাবে ফলুইমারি পার হয়ে? আতরবালা ওদিকে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—কাজ তো কিছুই নেই এত দীর্ঘ এই রাত্রিবেলাটায়।

কেতুচরণের কি মনে হল—উমেশের মুখের দিকে চেয়ে কোমল কণ্ঠে এবার বলল, আসর কি করে হয়—তুমিই বুঝে দেখ ওমশা। টাকার লোভে ছেলেটা নিয়ে এসে বিষম ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম। সুখ-সোয়াস্তি, আমোদ-ফূর্তি সমস্ত মাটি। আগে বুঝতে পারলে কে যেত এর মধ্যে?

উমেশ সোৎসাহে বলে, দিনমানে আসর হবে তাহলে। কুমার বাহাদুর শুনবেন। তোমরা কাজের মানুষ—বসে থাকতে পারবে না তো! খাইয়ে দাইয়ে রেখে যেও—আমি ওঁকে নিয়ে থাকব। বাজনা ওঁর ভারি পছন্দ। আমাকেও পছন্দ করেন। কেমন এক নজরে তাকিয়ে থাকেন আমার বাজনার সময়।

ঢোলক নামিয়ে রেখে উমেশ চাটকোল পেতে বসে পড়ল। রাত্রি শেষ হোক, মধুর হাসি হেসে খোকা জেগে উঠুক, তাদের নতুন আসর সেই সময়।

৩৭

খুশাল বিষম বিরক্ত। ঝিষির ছাড়া কাউকে বড় একটা কাজে পাওয়া যায় না। ওরা যেন আলাদা এক দল করেছে। বাসা-ঘরখানার ভিতরে আড্ডা। এত কষ্টের সায়ের জমে উঠছে, তা সায়ের-ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখবার কৌতূহলও কারো নেই। ছেলেটা হল যত নষ্টের গোড়া—দুর্লভ হালদারের ছেলে তো! ওদের হাড়ে ভেল্কি খেলে। একরত্তি অবোধ শিশু—দেখ না, এসেই অমনি খুশালকে সকলের থেকে পর করে দিয়েছে।

অসহ্য হয়ে উঠলে শেষকালে খুশাল একদিন দুম্-দুম করে মাটি কাঁপিয়ে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। কেতুকে বলে, পরের বাচ্চা কত দিন আর পুষবে শুনি? ঝাঁপায় দিয়ে আসবার কথা—চলে যাও না সেখানে। ছেলে দিয়ে পাওনাগণ্ডা আদায় করে নিয়ে এসো—

গোল-পাঁচু সায় দেয়, ঠিক বলেছ খুশাল। তাই উচিত বটে! টালবাহানা করা অন্যায় হচ্ছে। বলা যায় না—ছেলেটার ভালমন্দ কিছু হলে এক কাঁড়ি টাকা লোকসান।

কেতুর কিন্তু উৎসাহ দেখা যায় না। বলে, দুর্লভ হারামজাদার কথা—ফুক্কুড়ি মেরে ছেলে গছিয়েছে কিনা বলা যায় না। কষ্ট করে গিয়ে হয়তো দেখব, বৈকুণ্ঠ ধর বলে লোকই নেই সেখানে।

খুশাল বলে, না মরে ভূত হও কেন? গিয়ে দেখেই এসো। আগে থেকে হাত-পা কোলে করে বসলে হবে কেন?

উমেশ রাগ করে বলে, তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে, বলো দিকি খুশাল? তোমার ঘাড়ে কি চেপে বসে আছেন রাজকুমার? অত উতলা কেন? শিশু দেবতা। অমন দূর-দূর করতে নেই, দেবতা রুষ্ট হন।

আর এই এক উপগ্রহ—অকর্মার ধাড়ি উমেশটা এর মধ্যে জুটেছে। খুশাল দু-চক্ষে দেখতে পারে না লোকটাকে। রাগে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, তোকে কে ফোঁপরদালালি করতে ডেকেছে? দিন-রাত্তির পড়ে পড়ে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে? ঘরবাড়ি নেই? যা চলে সেখানে।

উমেশের রাগ নেই। হাসতে হাসতে সে বুড়ো-আঙুল নাড়ে। বলে, নেই, নেই—ফক্কা! ঘরবাড়ি জমাজিরেত সমস্ত বেচে দিয়ে শিব হয়েছি, শোন নি?

শিব—তবে শ্মশানে-মশানে যা। কষ্টেসৃষ্টে আমরা দেড়খানা কুঁড়ে বেঁধেছি, সে জায়গায় কেন?

গোল-পাঁচু জ্বলে উঠল।

আসে তা কি হয়েছে? শ্মশান বলে শাপ-শাপান্ত করো কেন? কেতুচরণ বলেছে বলেই আসে। ওমশা না থাকলে কার ক্ষমতায় আছে বাচ্চা ছেলের এত ঝক্কি পোহানো?

উমেশ বলে, আহা, কলহ কোরো না। যাচ্ছিই তো চলে। আর মোটে পাঁচ-সাত-দশ দিনের ব্যাপার।

কথা কেড়ে নিয়ে গোল-পাঁচু বলে, আমিও যাবো। একসঙ্গে চলে যাচ্ছি। যাবো না তো কি হক-নাহক তোমার ঐ মুখ-নাড়া খেতে পড়ে থাকব?

খুশাল ভ্রূকুটি করে। ভাঙন অনেক দূর গিয়েছে—ধ্বস নামছে তবে দু-দশ দিনের মধ্যেই, পুরন্দরে যেমন কূল ভাঙে? কেতুচরণও আবার গোল-পাঁচুর মতো অমনি একটা-কিছু বলে না বসে! ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

আবার একদিন একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল। আধ-ছাওয়া বাসাঘরের ভিতর জ্যোৎস্নাভূষণের গায়ে এক ফোঁটা জল পড়েছে কি না পড়েছে, সেই আক্রোশে উমেশ চালের উপর উঠে ছাউনি টেনে ছিঁড়ে তছনছ করে ফেলল। বিকালবেলা কেতুচরণ এবং আরও কে কে ডিঙি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে। খুশাল সায়ের-ঘরের মেজেয় পড়ে ঘুমুচ্ছিল গুঁটিসুটি হয়ে। ঘুম ভেঙে উঠে এসে সে উমেশের কাণ্ড দেখল।

কি হচ্ছে ওমশা? বলি, বাঁধন কেটে চাল দুখানাও নামিয়ে আনবি নাকি?

জল পড়ছিল—তাই দেখছি, মেরামত করা যায় কিনা!

কথা শুনে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে ওঠে। মেরামত একে বলে? চেঁচামেচি করল যতক্ষণ দমে কুলায়। কিন্তু গালিতে গায়ে ফোসকা পড়ে না। উমেশ শোনে, আর হেসে হেসে দেয়ালা করে ছেলের সঙ্গে। ভাল-মন্দ জবাব দেয় না। দম ফুরিয়ে খুশাল তারপর গজর-গজর করে। কেতুচরণের অনুপস্থিতিতে আর অধিক এগোতে ভরসা করে না। আসুক সে ফিরে, তখন দেখা যাবে।

সন্ধ্যার পর কেতুচরণ ফিরল। খুশাল ঘাট অবধি গিয়ে তাকে এগিয়ে আনল। গম্ভীরভাবে কেতু সকল বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আসছে।

ঘরের সামনে এসে কেতু হাঁক দিল, ওমশা।

কি ?

শুনে যাও ইদিকে—

উমেশ বলে, এখন পারব না। মশা ভনভন করছে, সাজাল দিচ্ছি।

ছাউনি কেটে বেছাপ্পর করেছ, সর্বনেশে মানুষ যে তুমি!

উমেশ সমান তেজে জবাব দেয়, বাইরে জল না পড়তে ঘর ভেসে যায়। নিজেরা মরবে মরো, বৃষ্টি খাওয়াতে অবোধ বালক একটা এনে জুটিয়েছে কেন ?

আশ্চর্য, কেতুর স্বর নরম হয়ে গেল। বলে, কতগুলো টাকার ফেরে ফেললে—হিসেব রাখ ?

উমেশ বলে, হাতি এনেছ—তাঁর পিলখানার খরচ তো লাগবেই। সে ভাবনা আগে ভাবলেই হত!

পায়ে পায়ে ইতিমধ্যে কেতু ছেলের পাশে এসে গেছে। ঝুঁকে পড়ে দেখছে। ঘুমিয়ে আছে। তেলচিটে ছেড়া একখানা কাপড়ে ঢেকে দিয়ে উমেশ এখন তুষ-ঘুঁটেয় আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া করবার চেষ্টায় আছে। ধোঁয়ায় মশা পালাবে। কেতুচরণের বুকের মধ্যে ছাঁত করে ওঠে, বৃষ্টি খেয়ে ছেলের এখন অসুখ-বিসুখ না করলে হয়!

খুশাল তাজ্জব। এত বড় ক্ষতি করেছে, একটা-দুটো কথায় হয়ে গেল তার ফয়শালা ? কেতু দাঁড়াল না, হনহন করে বেরিয়ে পড়ল তখনই। বুনোপাড়ায় গিয়ে দু-কাহন খড়ের দরুন নগদ বায়না দিয়ে এল। সকাল হতে না হতে মাথায় বয়ে আনল সেই খড়। উঠে পড়ে লেগেছে ঘরের কাজে। অমন সায়ের-ঘর কানা

করে দিয়ে বাসাঘরের নতুন খড়ের ছাউনি সোনা হেন ঝিকমিক করছে।

ছেলেটা যেখানে শোয়, তার মাথার দিকে একটু বেড়ামতো দেওয়া হয়েছে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির ঝাপটা ঠেকানোর জন্য। সেই বেড়ায় উমেশ গোবরমাটি লেপেছে; পিটালি-গোলা দিয়ে চালচিত্রের ছবি এঁকেছে তার উপর। দু-বেলা সে মেঝে ঝাঁট দেয়, এক কণিকা ধূলো থাকতে দেয় না। খাট-পালঙ্ক নেই, কাজেই মাটিতে রাখতে হয়। তা বলে তাদের মতো ধূলোয় ভূত হয়ে থাকতে পারেন কি কুমার বাহাদুর?

কেতুচরণ মাঝে মাঝে ভারি প্রসন্ন হয়ে বলে, আমরা বাউণ্ডুলে মানুষ। তুমি আছ ওমশা, বাচ্চাটা তাই বেঁচে রয়েছে। এমন আমরা পারতাম না। আমাদের হাতে থাকলে অক্কা পেয়ে যেতো। তা তুমি থেকে যাও ওমশাভাই, যদ্দিন ছেলের একটা গতি করতে না পারছি।

উমেশের আপত্তি নেই, সে উচ্চবাচ্য করে না। প্রায় সর্বক্ষণই সে এখানে পড়ে থাকে। কালেভদ্রে আতরের কাছে যায়। এখন গোল-পাঁচুর গতায়াত আতরের বাসায়। ভাই-বোনে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উমেশের জমিটা নিয়েছেন ওস্তাদ তারক বাঁড়ুজ্জে। সেই টাকার জন্য গোল-পাঁচু বাঁড়ুজ্জের কাছে দু-বেলা জোর তাগাদা লাগিয়েছে। অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাঁকে। উমেশ তার শিষ্য—তাকে ঠেকিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন, ধীরে সুস্থে দু-পাঁচ করে টাকা দেবেন। কিন্তু গোল-পাঁচুর হাত এড়াবার উপায় নেই।

কেতুকে গোল-পাঁচু জিজ্ঞাসা করে, খবরবাদ পেলে? হালদার মশায় কবে এসে ছেলে নিয়ে যাবে?

কেতু ঘাড় নেড়ে বলে, না, কিচ্ছু জানি নে—

রসিকতা করে বলে, জোয়ারের জল দুর্লভকে ভাসিয়ে দেশে ঘরে নিয়ে ফেলেছে ঠিক—আর ফিরবে না। নতুন ঘেরিবাবু এসেছে শুনছি। নিজে গিয়ে খোঁজখবর করব, তা অদ্দূর যাবার ফাঁক পাচ্ছি নে। বুদ্ধির ভুলে কি ল্যাঠায় জড়িয়ে পড়লাম, দুর্লভকে না পেলে তো সর্বনাশ।

গোল-পাঁচু বলে, বাঁড়ুজ্জের টাকা হাতে এসে গেলে আমরা কিন্তু একদিনও আর দেরি করব না। তার মধ্যে ব্যবস্থা করে নাও।

অনুনয়ের সুরে কেতুচরণ বলল—কেতুচরণের এমন কণ্ঠ আগে কেউ শোনে নি—দু-চারটে দিন রে ভাই। তার ভিতরে হয়ে যাবে একরকম। ছেলে-পোষার ব্যাপারে আমি তো একেবারে আনাড়ি ছিলাম, আমারও বেশ রপ্ত হয়ে আসছে। কি বলো ওমশা?

এরই মধ্যে ঋষিবর একদিন সুসংবাদ বয়ে আনল, দুর্লভ ফিরেছে মর্জালে, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কেতুচরণ চমকে ওঠে।

বেশ, বেশ! মারা যায় নি তা হলে? ভালো।

খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। হরিপদটার কিন্তু খোঁজ নেই—এক হাতে কদ্দূর সাঁতরাবে? সেটা বোধ হচ্ছে ফৌত!

আবার বলে, বাদাবনের ঘুঘু—অখণ্ড পরমায়ু দুর্লভ বেটার। তোমার পক্ষে জুত হল কেতুচরণ, কিন্তু বাওয়ালিদের আরও বিস্তর জ্বালাবে। ডুবছিল, ভাসছিল, নোনা জল খেয়ে পেট ঢাকের মতো—সেই সময় এক ধানের নৌকো দেখতে পেয়ে তুলে নেয়।

এদ্দিন খুলনের হাসপাতালে পড়েছিল। দু-এক দিনের ভিতর এসে বুঝসমঝ করে ছেলে নেবে, আমায় দুর্লভ বলে দিয়েছে।

কেতুচরণ বলে, যাক বাবা, রক্ষে পেলাম। কম ঝঞ্ঝাট একটা ছেলের ঝক্কি নেওয়া ?

ঋষিবরের কাছে উল্লাস জানিয়ে কেতুচরণ ঘরে ঢুকল। শিশুকে উদ্দেশ করে বলে, শুনছিস রে শূয়োরের বেটা, বাপ তোর বেঁচে আছে। অমন কদমতলীর টান, তা-ও ভাসিয়ে নিতে পারল না। আসছে সে তোকে নিয়ে যেতে। খিল-খিল! হেসে যে গড়িয়ে পড়লি ওরে হাসকুটে! বড্ড ফুর্তি—উঁ? তা হাসবি বই কি এখন, কেমন অজাতের ঝাড়।

৩৮

দুর্লভ এসে হাজির। উঠেছে সায়ের-ঘরে। খুশাল খাতির করে বসিয়েছে। কথাবার্তা হচ্ছে। হি-হি করে হাসতে হাসতে ঋষিবর এসে কেতুচরণকে খবরটা দিল।

টাকাকড়ি নিয়ে এসেছে, বলল। চুকিয়ে দিয়ে ছেলে নিয়ে যাবে। খুশালের কাছে দরবার করছে, একশ টাকা বড্ড বেশি—ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি, কিছু কম-সম হলে উচিত হয়।

এক টুকরা বাঁশ জোগাড় করে কেতু শলা চাঁচছে বাঁধের উপর বসে। কাজ বন্ধ করে চোখ তুলে বলে, কি? কি বলছে ?

ঐ এক পুঁটকে ছেলের পোষানি একশ টাকা—তা গায়ে লাগে বই কি!

কেতুচরণ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, দরাদরি নেই। বল্‌গে যা, ওর সিকি-পয়সা কমে আমি ছাড়ব না।

ঋষিবর রাগ করে বলে, রেখেই বা কোন চতুর্ভুজ হবে? হাঙ্গামা টের পাচ্ছ না? বিদেয় করতে পারলেই তো বেঁচে যাও।

কেতুচরণ বলে, জল ঠেলে নিয়ে আসতে কি কষ্টটা হয়েছিল—তার হিসেব করছিস? দু-কথার মানুষ আমি নই। যা বলেছে, তাই দিতে হবে। তুই দালাল হয়ে এসেছিস। ভালর তরে বলছি, সামনে থেকে চলে যা।

বলতে বলতে খুশাল ও দুর্লভ এসে পড়ল। উঁচু গলার বাগ-বিতণ্ডা কানে যাবারই কথা।

দুর্লভ বলে, কি হচ্ছে তোমাদের গো? অত শলা চেঁচে কাঁড়ি করছ কেন?

কেতু বলে, দোয়াড়ি বানাবো—

খুশাল বলে, নেই কাজ তো খই ভাজ। জাল ফেললে খালুই বোঝাই হয়ে যায়, দোয়াড়ি পেতে কষ্ট করে মাছ ধরার কি গরজ?

ঋষিবর ভালমানুষের ভাবে সুপারিশ করে, পুরো টাকাটাই দিয়ে দেনগে হালদার মশায়। ওতে আর কাটাকাটি করবেন না। অনেক কষ্ট করে সাঁতরে সাঁতরে নিয়ে এসেছে। টাকা তো অঢেল রোজগার করেন, খরচও করে থাকেন। কিন্তু বুঝে দেখেন, ছেলে গেলে আর ছেলে হত না।

দুর্লভ একটু ইতস্তত করে বলল, তা-ই না হয় হল। একশই দিচ্ছি। কেতুচরণকে চটাবো না। আরো তো কাজ রইল।

কেতু সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

চলো তা হলে। ছেলে কোথা? ছেলে দাও, পাওনা বুঝে নাও—

কেতু বলে, ছেলে কি বাইরে রাখা যায়? এক্ষুনি সর্দি লাগবে। বলছিলেন, একশ টাকা বেশি। কত তোয়াজে রাখতে হয়, কি ঝক্কি পোহাতে হয়, জানেন না তো!

রান্নাঘরের দিকে চলেছে সকলে। দেখা গেল—দুর্লভ পিছনে পড়ে গেছে, আতরবালার বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

কেতু বলে, মেলা ভেঙে গেল, আতরটা আজও পড়ে রয়েছে দেবতা।

দুর্লভ বলে, মধু রায় আটকেছে বুঝি? তা ছাড়া আবার কে? হ্যাক-থুঃ! যা বেটার রীত-প্রবৃত্তি!

মুখ টিপে হেসে কেতুচরণ বলল, একা মধু রায় কেন—খদ্দের কি একটা-দুটো? বলেন কেন! অঢেল পশার ও-মাগীর। যাই-যাই করেও যেতে পারছে না।

ঢুকে পড়ল কেতুর সঙ্গে গোবরমাটি-লেপা দেয়ালচিত্র-করা ঘরের ভিতর। উমেশ যথারীতি হাজির আছে। জ্যোৎস্নাভূষণ হাত-পা নেড়ে খেলা করছে উমেশের সঙ্গে, আঁ-আঁ করছে। শিশু ও বুড়োয় আলাপন হচ্ছে অবোধ্য ভাষায়। কত স্ফূর্তি!

দুর্লভ হাত বাড়িয়ে নিতে গেল। আসে না। ড্যাবড়েবে চোখ মেলে তাকাচ্ছে শুধু।

হেসে দুর্লভ বলে, হারামজাদার কাণ্ড দেখ! এই কদিনে পর হয়ে গেছে। বড্ড গছে গিয়েছে তোমাদের কাছে!

হাততালি দেয় ছেলের সামনে।

এসো—লক্ষ্মীধন, সোনামাণিক—

টেনেটুনে নিয়ে নিল কোলে। রকম দেখ ছেলের—ঠোঁট ফোলাচ্ছে, কেঁদে পড়ে আর কি!

শুষ্ক মুখে কেতু জিজ্ঞাসা করে, এখনি নিয়ে যাবেন দেবতা ?

হ্যাঁ, দেরি আর কেন ? ফাঁকা ঘরে তিষ্ঠানো যায় না—কাজকর্ম করতে পারি নে—মন হু-হু করে। চাকরি ছাড়ব বলেছিলাম, তা নিজের আর ছেড়ে দিতে হবে না—ওরাই ছাড়িয়ে দেবে আর কিছুদিন এইরকম অবস্থা চললে।

কেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, সং ন হল কিছু ? এই একশ টাকা পাচ্ছিস। ওটা হয়ে গেলে ার এক দফায় একশ....যাকগে, কাজটা গোলমেলে আছে—ডবল ধরে দেবো ওটার দরুন। তা হলে একুনে তিনশ টাকা দাঁড়াচ্ছে, বুঝে দেখ্।

কেতুচরণ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। নির্ভাবনায় থাকুনগে—তারও ব্যবস্থা হচ্ছে!

তবে যেন কিছু হদিস পেয়েছিস ?

দুর্লভ চোখ পিটপিট করে তাকাল। কেতুচরণ জলজ্যান্ত মিথ্যাকথা বলে, নয় তো এতখানি জোর দিয়ে বলছি কি করে ? শিগগিরই পেঁীছে দিয়ে আসব, দেখতে পাবেন। তবে—

সশঙ্কে দুর্লভ বলে, তবে আবার কি রে ?

কেতুচরণ কাতর হয়ে বলে, আজকের দিনটে খোকাকে নেবেন না দয়াময়। জলে ভিজে ওর শরীর বেজুত হয়েছে। দু-বার বমি করেছে! তার উপরে নৌকোয় সেই মর্জাল অবধি যাওয়ার ধকল সইতে পারবে না। একটু সামলে উঠলে কদিন পরে এসে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু ছেলের চেহারা বা ভাবভঙ্গিতে অসুখের কোন লক্ষণ নেই। তবু দুর্লভ রাজি হয়ে যায়।

বেশ ফিরে যাচ্ছি আজকে। হাসপাতাল থেকে শ্বশুরকে খবর দিয়েছিলাম। জবাব এসেছে দু-তিন দিনে এসে পড়বে। তার জিম্মায় দিয়ে দেবো। তা থাক—এই কটা দিন থাকুক তোর কাছে।

আঙুলের কর গুনে বিড়-বিড় করে হিসাব করে। সোমবার অবধি কাজের বড্ড চাপাচাপি। তার মধ্যে সময় হবে না। মঙ্গলবারে আসব—মঙ্গলবারে এমনি সময়। আর এর মধ্যে ওদিককারও পাকা-খবর পেয়ে যাবি, কি বলিস? খেয়াল রাখিস বাবা, তোর ভরসায় আছি।

রাত্রি গভীর হল। কেতুচরণ বাঁধের উপর ফিরে এসে একাকী আবার কাজে লেগেছে। আঁধারেও হাতের আন্দাজে শলার কাজ করতে পারে, কাটারিতে হাত কাটে না।

গোল-পাঁচু এসে উত্তেজিত ভাবে বলল, দুর্লভ শয়তান আজকে আবার এসেছিল।

এসেছিল ছেলে নিতে—তা দিলাম না। মঙ্গলবারে আসবে বলে গেছে।

মঙ্গলবারের আগেই তবে সরে পড়ব। বাঁড়ুজ্জে টাকা দিক, আর না দিক।

খরকণ্ঠে কেতুকে সে বলে, দিলে না কেন ছেলে? ঐ ছুতোয় আবার আসবে। ও আপদ না এলেই ভাল। ওকে দেখলে পিত্তিনাড়ি জ্বলে যায়।

কেতু সায় দেয়, তা ঠিক। দেখ না, কদমতলীতে পড়েও মরল না। বাদাবনে এত বাঘ-সাপ-কুমির—মা বনবিবি একটা-কোন ব্যবস্থা করে দেন না!

টাকা দিয়েছে ?

খেদের সুরে কেতু বলে, দিল আর কই ? গাঁটের টাকা গাঁটে নিয়ে সরে পড়ল। বেবাক লোকসান।

গোল-পাঁচু আশ্চর্য হয়ে বলে, হয়েছে কি তোমার—বলো দিকি ? কোন বুদ্ধিতে ছেলে দিলে না ?

অসুখ করেছে যে ! দিই কেমন করে ?

তোমার কি তাতে ? তোমার হল টাকা নিয়ে কথা। অসুখ করেছে বলেই তো তাড়াতাড়ি লেনদেন চুকিয়ে ফেলা উচিত। এমন-তেমন হয় তো ওর কাছে গিয়েই হোক।

কেতুচরণ রাগ করে বাঁধের খানিক মাটি ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

দূর,—দূর হয়ে যা। চামারের ঘরে জন্মাস নি কেন তুই ?

তাড়া খেয়ে গোল-পাঁচু আরও কাছ ঘেঁসে বসে।

তোমায় বলতে কি, হারামজাদা আজ আবার পদ্মর ওদিকে ঘুরঘুর করছিল। পাড়ার সকলে উঠে গিয়ে একদম ফাঁকা হয়েছে, এদিকে-ওদিকে দেখবার কেউ নেই—ওর ভারি জুত। আমি ঘরের ভিতর বসে বসে দেখছিলাম কাণ্ড। যেতে আর চায় না—কেবলই পায়তারা মেরে বেড়ায়। কিছুতে যখন উঠলাম না, শেষটা গোন মারা যায় দেখে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

বলতে বলতে পাঁচুর গলা আটকে আসে। কেশে গলা ঝেড়ে বলল, নরকের সাথী—ওরা ডোবাতে আসে। বোনটিকে আর ওদিকে তাকাতে দিচ্ছি নে। তাড়াতাড়ি পালাব।

কেতুচরণ উঠল। কাজ শেষ হয়েছে। দোয়াড়ি নয়, ছুলভকে মিথ্যে বলেছিল—একটা খাঁচা বুনেছে এতক্ষণ বসে বসে। রণ-

রঙের পাখি ধরে খাঁচায় পুরবে। পাখিরা কিচ-মিচ করবে, একটু বা উড়বে। জ্যোৎস্নাভূষণ কত আহ্লাদ করবে পাখি দেখে। হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাবে একেবারে খাঁচার কাছে।

ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর সকালের রোদ ঝিকমিক করছে। কেতুচরণের শরীরটা বেজুত লাগছে, মনও ভাল নয়। খপখপ করে পা ফেলে অন্যমনস্ক ভাবে সে যাচ্ছে। দূর দিগন্তের হাওয়া এসে গায়ে লাগে! ভাবছে, ভালই তো, নিয়ে যাক এসে মঙ্গলবারে। মঙ্গলের আগে এলে আরও ভাল। এক গাদা টাকা পাওয়া যাবে—উঃ! এর উপরে এলোকেশীর যদি সন্ধান মেলে, তবে তো টাকার পাহাড় হবে। এক সময় টাকার যখন বড় দরকার ছিল, আনি-দুয়ানি পয়সা গেঁথে গেঁথে একশ-র আধাআধিও পৌঁছতে পারে নি।

বাঁধে নতুন মাটি দিয়েছে। তরঙ্গাকুল নদী আস্ফালন করছে, যেন বাঁধের মাটি হাজার বাহুতে তুলে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে জলে ভাসিয়ে দিতে চায়! পেরে ওঠে না, পারবার কোনই সম্ভাবনা নেই। ভাঁটার টান যত বাড়ছে, জল দূরবর্তী হচ্ছে ততই। মাঝখানের চর ঝিকিমিকি হেসে উপহাস করছে নদীস্রোতকে।

উন্মুক্ত চরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কে যেন বনপলাশ ছড়িয়ে গেছে। অথবা চরের রূপালি শাড়ির উপর থোপা থোপা গোলাপি বুটি। কাঁকড়া ওগুলো। গর্ত থেকে উঠে এখন সকালবেলার রোদ পোহাচ্ছে। খুব ছোট, একখানা মাত্র দাঁড়া—সর্বাঙ্গের মধ্যে দাঁড়াটাই উল্লেখযোগ্য।

কাঁকড়াই ধরা যাক না! পাখি এখনো একটাও ধরতে পারে

নি। খাঁচা খালি। পাখি ধরা বড্ড কঠিন, বিস্তর তোড়জোড় করতে হয়।

কাদায় নেমে পড়ল কেতু। চটচটে কাদা, আঠার মতো লেপটে যায়। সর্বাঙ্গে ছিটকে ওঠে। তারই মধ্যে সে ছুটাছুটি করছে।

আরে আরে কেতুচরণ যে। ওখানে কি করো?

গোল-পাঁচু যাচ্ছিল এই দিক দিয়ে। দেখে সে অবাক হয়ে গেছে।

ক্ষেপে গেলে নাকি কেতু? কি হবে ও-কাঁকড়া? খাওয়া যায় না, কোন কাজে লাগে না।

কেতুচরণ জবাব দিল না। মহা ব্যস্ত, মুখ ফিরিয়ে তাকালই না। এই জাতের কাঁকড়া অতি সতর্ক। কুল্যো, চিল, মাছাল, ঢালিবক গাছের উপর ওত পেঁতে থাকে কাঁকড়া ধরে খাবার জন্য। তাই এমন হয়েছে, ক্ষীণতম আওয়াজ হলেই কাঁকড়া গর্তে ঢুকে পড়ে।

এক প্রহর বেলা অবধি অনেক চেষ্টা করে কাদা মেখে ভূত হয়ে কেতুচরণ দুটো কাঁকড়া ধরল। সেই দুটো দু-হাতের মুঠোর পুরে, যেন মুঠি ভরে মণিমাণিক্য নিয়ে বাড়ি এসেছে, এমনিভাবে চিৎকার করে—

দেখ খোকা, কি আনলাম তোমার জন্যে—দেখ একবার চেয়ে।

কাঁকড়া দুটো ছেড়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। দাঁড়া তুলে তারা ছোটে। কেতুচরণ হাততালি দিয়ে তাড়া করে। জ্যোৎস্নাভূষণ অবাক হয়ে দেখে। তারপর শাদা দুধে-দাঁতগুলো মেলে হাসে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে কেতুচরণ। এ জিনিস একেবারে নতুন—এই বন-সীমান্তে এমন হাসি কেউ হাসে নি আজ অবধি। ছোট ছোট হাত দুটি বাড়িয়ে কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছে—কি সর্বনেশে

ডাকাত ছেলে! হবে না, শুয়োরের বাচ্চা শুয়োরের মতোই গোঁয়ার হবে তো!

হি-হি করে কেতুচরণ একাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, দেবে আঙুল কামড়ে—কুট করে কেটে নেবে। থাকিস সারা জন্ম আঙুল-কাটা হয়ে।

টিকে এসে উপস্থিত। বাইরে থেকে হাঁক দিচ্ছে, কেতুচরণ আছ নাকি? ওরে কেতু!

ঘরের মধ্যে গলা বাড়িয়ে টিকে বলল, বাবু ডেকেছেন তোমাকে—

কেতু অন্যমনস্ক ভাবে বলে, কোন বাবু?

বাবু আবার কজন আছে কাছারিবাড়ি? সুকুমার তো ভেগে পড়েছে। অমন বাবু-ভেয়ে মানুষ আবাদে পড়ে থাকতে পারে? বাবুর যেমন কাণ্ড, ছাগল দিয়ে মলন মলাতে গিয়েছিলেন।

কেতুচরণ তাকিয়ে দেখল না একবার তার দিকে। কথা কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। গুলি-পাঁচু কিছু জালের সুতো পাকিয়ে রেখেছিল। তারই খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে সে পরম মনোযোগে কাঁকড়া দুটোর দাঁড়া বাঁধছে।

টিকে বলল, যাবে কখন?

কেতু বিরক্তস্বরে জবাব দেয়, যাওয়া যাবে একসময়—

বড্ড জরুরি। আজকেই যেও। সন্ধ্যার সময় যাবে, তাই বলিগে। কেমন?

হুঁ—

কাঁকড়া সুতোয় বেঁধে চালের সঙ্গে টাঙিয়ে দিল। মজা মন্দ নয়। খোকার কান্নাকাটি বন্ধ, হাত-পাও নড়ে না বুঝি! একনজরে ঐ দিকে তাকিয়ে আছে।

পরের দিন টিকে আবার এসে পড়ল।

কই, যাও নি তো ?

পেরে উঠি নি—

টিকে রাগ করে বলে, কাজ তো দেখি নে। কাল দেখে গেলাম, আজও দেখছি। এই দু-পা গিয়ে কথাটা শুনে আসতে পারলে না ?

হুঁকো থেকে মুখ তুলে কেতুচরণ চোখ পাকাল তার দিকে। বলে, আমার কাজের নিকেশ তোকে দিতে গেলাম কেন রে ? রায়বাবুর কেনা গোলাম আমি ? বলে দিস, যেতে পারব না।

নরম হয়ে টিকে বলে, রাগ করো কেন ? রাগের কথাটা কি হল ? রায়বাবু বাদায় যাচ্ছেন—বাদার শেষ অবধি যাবেন এবার। তাই ডাকাডাকি করছেন। দস্তুরমতো পাওনাগণ্ডা আছে, এমনি নয়। বাদাবনে চলাচলের ব্যাপারে, বুঝে দেখ, দুকড়ির পরেই হলে তুমি। দুকড়ি বুড়ো হয়েছে, গায়ে বল-শক্তি কম, নিজের উপর ভরসা রাখতে পারে না। সে-ই বলেছে তোমায় খবর দিতে। সেইজন্যে ছুটোছুটি করছি।

দুকড়ির নামে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল।

তিনি পাঠিয়েছেন ? সে-কথা বলো নি কেন ? আজকেই যাবো। নির্ঘাত যাবো, তাঁকে বোলো। কাছারিবাড়ি থাকবেন তো তিনি ?

না থাকে, বাড়ি থেকে খবর দিয়ে আনানো যাবে। আজকে যেন ভুল হয় না কেতুচরণ।

টিকে চলে গেল। কেওড়াফুল ফুটেছে অজস্র। ঘরের পাশেই গাছ। কেতুচরণ কোনদিন ঘাড় তুলে এসব তাকিয়ে দেখে নি। আজকে কি মনে হল, গাছের মাথায় সে উঠে পড়ল। কোঁচড় ভরে ফুল এনে খোকার গায়ের উপর ঢেলে দেবে, ফুল নিয়ে কি করে সে দেখা যাক। ছিঁড়ে কুচিকুচি করবে, না গন্ধ শুকবে বিলাসিনী এলোকেশীর মতো?

ফুল পাড়তে গিয়ে মনে হল, চাক ভাঙবার মরশুম তো এসে পড়ল! মাছি ওড়া শুরু হয়েছে আকাশে। ঝাঁক বেঁধে ঐ উড়ছে কতকগুলো। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে কেতুচরণ মাছি লক্ষ্য করে ছুটল। পায়ের দিকে লক্ষ্য নেই। উড়ন্ত মাছির ঝাঁক থেকে বেশিক্ষণ নজর সরানো চলে না, তা হলে মাছি হারিয়ে যাবে। আকাশে চোখ রেখে অভ্যাসবশে ডিঙি বাইতে লাগল লা-ভাঙার উপর। খাল পার হয়েই আবার ছোটে। শুলোর আঘাতে পা রক্তাক্ত হচ্ছে। জল-কাদা মেখে কাপড় ভিজিয়ে অগভীর নালা দ্রুতবেগে পার হয়ে যাচ্ছে। এমনি বেপরোয়া ভাবে ছুটতে হয় বলে কত মউল যে ফিবছর বাঘের কবলে পড়ে, তার সংখ্যা নেই।

চাকের সন্ধান মিলল অবশেষে। কেতুচরণ দেখে রাখল। দিনমানে সে চাক ভাঙতে সাহস করে না। মন্ত্রতন্ত্র কিম্বা গাছগাছড়ার রস যা হাতে মেখে চাক ভাঙতে হয়, কিছুই তার জানা নেই। রাত্রিবেলা মৌমাছি অন্ধ হয়ে যায়, সেই সময় এসে ভাঙবে। বিচালির বোঁদা বেঁধে নেবে। দুই কাজ হবে এতে—

আগুন দেখে বড়-শিয়াল কাছে আসবে না, আর ঐ বোঁদার ধোঁয়ায় মৌমাছি চাক ছেড়ে উড়ে পালাবে।

চাক ভেঙে মধু-ভরা অংশ গামছায় বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। খালের ধার দিয়ে ফিরে চলেছে।

রায়বাবুর নীল-পানসি যেন চরের উপর! জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। নতুন তক্তার জোড় লাগাচ্ছে—ঠক-ঠক আওয়াজ করে এই রাত্রিবেলাও কাজ করছে ছুতোর-মিস্ত্রি।

কে ওটি? ভুকড়ি মাঝি যে! উঁচু জায়গায় বসে ভুকড়ি হাত ঘুরিয়ে মিস্ত্রিকে নির্দেশ দিচ্ছে। উঠে কাছে এসেও দেখছে এক-একবার—আবার বসে পড়ছে। ভুকড়ির বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার বল নেই।

গড় করি ওস্তাদ—

সুখে থাকো।

আশীর্বাদ করল ভুকড়ি। বলে, তোমায় ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি কেতুচরণ।—তা এখানে নয়, কাছারিবাড়ি চলো—একেবারে বাবুর মুকাবেলা কথাবার্তা হোক।

মিস্ত্রিকে বলল, এই অবধি থাকুক। এখন রাঁধাবাড়া করে খাওগে যাও। কালকের মধ্যে হয়ে যাবে তো? তারপরে বাকি রইল তলিতে আচ্ছা করে আলকাতরা লাগানো।

ভাগ্যিস কেতুচরণ এই পথে ফিরে যাচ্ছে। নইলে আজকেও আসা হত না। ভুলে গিয়েছিল একেবারে। রাতদিন যা করছে ছেলেটা, তার মধ্যে মাথার ঠিক থাকে?

ভুকড়ি বক-বক করে আপন-কথা বলতে বলতে চলেছে। এত

আস্তে যাচ্ছে—হাঁটছে কি দাঁড়িয়ে আছে, বোঝা যায় না। বাদাবনের শেষে—আজ অবধি যেখানে মানুষ যায় নি—সেইখানে এবার নিয়ে যাবে ডুকড়ি। মরবার আগে তার জীবনের সকল অভিজ্ঞতা কেতুচরণকে দেখিয়ে বুঝিয়ে উজাড় করে দিয়ে যাবে। সে সুযোগ এসে গেছে রায়বাবুর অনুগ্রহে।

জ্যোৎস্নার মধ্যে মধুসূদন কাছারিবাড়ির উঠানে পায়চারি করছিলেন। শান্ত অচঞ্চল চারিদিক। একটু বাতাস নেই, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। আকাশ-প্রান্তে ক্ষীণ চাঁদ পৃথিবীর দিকে এবং মধু রায়ের দিকে চেয়ে হাসছে যেন।

এই চাঁদ—কতকালের চাঁদ! কালে কালে জাতি-বংশ-সম্প্রদায়ের পথ ধরে বিচিত্র চেহারা ও চরিত্রের নরনারী জন্ম নিয়েছে। অনন্তযৌবনা ধরিত্রী অকুণ্ঠ রূপ-সম্পদ অবারিত করে দিয়েছে তাদের কাছে। তারাও ভেবেছিল, এ-পৃথিবী আর ঐ চাঁদ তাদেরই। তাদেরই একান্তভাবে, আর কারো নয়। তারা অতীত হয়ে গেছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। এতটুকু পায়ের দাগ পড়ে নেই এত সাধের পৃথিবীর কোনখানে।

কদিনেরই বা কথা! মহারাজ প্রতাপাদিত্য নগর গড়লেন এই মৌভোগেরই অনতিদূরে। ধূমঘাট—জাহাজঘাটা—কালজয়ী সুবিপুল দুর্গ। সতর্কতার অন্ত ছিল না। আজকে করাল নদী খল-খল ক্রূর হাসি হেসে ভগ্ন-নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শোভন সুন্দর হর্ম্যগুলার ইটের গাঁথনি কঙ্কালের উলঙ্গ দংষ্ট্রাপংক্তি মাত্র হয়ে মনে আতঙ্ক জাগায়। দুর্গ-প্রকারের নিবিড় অরণ্যছায়ে রয়্যাল-বেঙ্গল-টাইগার শান্ত আস্তানা পেতে আছে।

মধুসূদনেরও চিরযাত্রার সময় এবার। সকল আকাঙ্ক্ষা ও

উদ্যমের অবসান। দেনায় চুল বিকিয়েছে। সুকুমারের উপর শেষ ভরসা করেছিলেন, সে পালিয়ে গেল। বিস্তর খাজনা বাকি—খাজনা দেবার সঙ্গতি কোথায়? রায়গাঁ ও মৌভাগের সমস্ত জমাজমি নিলাম হয়ে যাবে অচিরেই। তারপর পৃথিবীতে শুধু থাকবে অতিরিক্ত এক বোঝা দেনা আর দুর্নাম। পাওনাদার-গুলোর আশ্চর্য অধ্যবসায়—দুর্গম আবাদ জায়গায় এসেও দশ কথা শুনিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা এতদিন অনেক কৌশলে ঢেকেঢুকে রেখেছিলেন—এখন সকলে জেনে ফেলেছে। সর্বসাধারণের আলোচনা ও করুণার পাত্র এখন তিনি।

পালাতে হবে। ভেবেছিলেন, পালাবেন জগৎ থেকেই—মৃত্যু ছাড়া এ সঙ্কটের অবসান নেই। কিন্তু—দুকড়িকে মনে পড়ল। আছে বটে আর-এক জায়গা, মৃত্যু ও জীবন যেখানে একাকার। চোখের সামনে ঐ যে অরণ্যের আরম্ভ, তারই নিভৃততম অন্তরালে সান্ত্বনা খুঁজবেন তিনি পালিয়ে গিয়ে।

যাবেন শেষ সীমা অবধি। নীল-পানসি, দুকড়ি মাঝি, আর তিনি। আর যদি কৌতূহলী কেউ সঙ্গে যায়—কেতুচরণ পাওয়া যায় যদি! খানিক পায়ে হাঁটবেন, খানিক বা চলবেন নৌকায় নৌকায়।

অগণ্য নদী-খাল। যত দক্ষিণে যাবে, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ছে ততই। গোনা-গুনতি নেই—জরিপ করে হিসাব আসে না। অবিরল জলধারা—জানা অজানা সহস্র পথ বেয়ে বিশ্রামহীন জল ছুটছে। ভাঁটায় কল-কাকলি তুলে ছুটে যায় সমুদ্রের পানে, জোয়ারের তাড়ায় আবার ঘরমুখো ফেরে। এর মধ্যে দশ-বিশটা মোটা রকমের পথ মাত্র মানুষের জানা। মালবাহী স্টিমার কদাচিৎ

সেই সব পথে চলাচল করে, ফরেস্ট-অফিসারের লঞ্চ দ্রুত অতিক্রম করে যায় কালেভদ্রে। জলে আর জঙ্গলে, জঙ্গলে আর পশুপাখি-কীটপতঙ্গে ভারি মিতালি—শত শত বৎসরের দিনরাত্রির প্রতি-মুহূর্তে তাদের উদ্দাম কথাবার্তা ও মেলামেশা চলছে। কোন সতর্কতার প্রয়োজন নেই। দূর-দূরান্তের জলস্রোত হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্থলভূমে, গাছের তলায় তলায় ঢুকে পড়ে দূরবর্তী ঘন জঙ্গলের ভিতর। ছলছল হাসি-রহস্য হয় সুগোপন ছায়াচ্ছন্নতায়। সূর্য দেখতে পায় না, চাঁদ-তারা দেখে না। সৃষ্টির পরিপূর্ণ বার্তা আজও পৌঁছয় নি সেখানে। মানুষ এখানে নিতান্ত অবান্তর। মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব-সীমার বাইরে রহস্যময় বাদাবন—জ্ঞানবুদ্ধি সমস্ত উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে কেউ যদি এখানে এসে পড়ে। আর হরিণ-বানরগুলো বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে প্রথম-দেখা সেই দু-পেয়ে আজব জীবটার দিকে।

সেই অঞ্চলে যাচ্ছেন মধুসূদন। অলক্ষ্য আকর্ষণে অরণ্য টানছে তাকে। পুরানো দিনের চেনা-জানা—প্রাগৈতিহাসিক কালের তাঁর পুরানো আবাস। একশ-দুশ পুরুষ অতিবাহন করবার পর আবার পুরানো গৃহে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানকার নিয়ম-নীতি একেবারে আলাদা। মানুষ ও জীব-জানোয়ারে তফাত নেই—তারা নিতান্ত আপনা-আপনি। মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যার সম্বন্ধে ভেবেছিলে, হঠাৎ হয়তো দেখতে পাবে তাকে। দেশ-দেশান্তর আর যুগ-যুগান্তরের মানুষ সকল ভিন্নতা ভুলেছে। প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের লড়াইয়ে মরেছিল যে মহিমান্বিত সেনাপতি, আর নগণ্য যে কাঠুরে কুমিরের কবলে পড়েছিল—হয়তো দেখতে পাবে, তারা গলাগলি হয়ে বেড়াচ্ছে নিরালা

বনভূমিতে। ব্যবধান নেই দেশ ও কালের, জীবন্ত ও বিগতের। দিগন্ত-বিস্তার নদীজলে উদার সূর্যোদয় আর সুপ্রসন্ন সূর্যাস্ত। জ্যোৎস্নায় প্লাবন তুলে হু-হু হু-হু আওয়াজে দুরন্ত বাতাস দাপা-দাপি করে, জোয়ার-জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে স্নান করে আরণ্য বৃক্ষেরা। ফুল ফুটছে—ঝরে পড়ছে ফুলদল। আদি মানুষের শুদ্ধান্তঃপুরের নিকানো আঙিনার মতো ভাঁটা-সরে-যাওয়া চরভূমি। বাঘ ঘুরে বেড়ায় সেখানে, কুমিরে রোদ পোহায়, হরিণ-শিশু খেলা করে।

ভাগ্যে মধুসূদন সমস্ত হারিয়েছেন, বনের ডাক তাই শুনতে পেলেন। মৃত্তিকার আদিতম সন্তান, মানুষের প্রথম আশ্রয়দাতা—বনের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কিসের? ঘরবাড়ি, মাঠ-গ্রাম, নদী-নালার বৈচিত্র্যে বুনন-করা বাংলাভূমি—তারই সবুজ পাড় এই বাদাবন বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে। সমুদ্রের আক্রোশ প্রতিরোধ করেছে অগণিত বৃক্ষ-সৈন্যের অতন্দ্র প্রহরায়, আহ্বান করে আনে আকাশের জলদপুঞ্জ, পাতায় পাতায় সঞ্চিত রাখে অফুরন্ত অমৃত-ভাণ্ডার।

এরাই মধুসূদনের সঙ্গী-সাথী। এদেরই কারো স্নেহ-ছায়াতলে তিনি শেষ ঘুম ঘুমিয়ে পড়বেন একদা।

৪০

কথাবার্তা ফয়শালা করে কেতুচরণ বেরুল। 'না'—বলা চলে না দুকড়ির কোন কথায়। দুরন্ত লোভও রয়েছে বাদায় বেড়াবার। মঙ্গলবারে খোকাকে যদি নিয়ে যায়, তার পরেই বেরিয়ে পড়বে এদের সঙ্গে।

কাছারিবাড়ির বিস্তীর্ণ আঙিনা, ধান তোলার খোলাট—সমস্ত জনশূন্য এখন, ঘাসবনে ভরতি। রায়-এস্টেটের দুর্দিনে কেউ বড় একটা আসে না এদিকে। সারি সারি শূন্য গোলা—জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে খোপ্‌-কাটা চিত্রবিচিত্র গোলকধাঁধার পথ।

তারই মধ্য দিয়ে কেতু ভাবতে ভাবতে চলেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এলোকেশী যেন? হ্যাঁ—এলোকেশীই। ঝানু দুর্লভ ঠিক ধরেছে—কাছারিবাড়ি সত্যিই এনে তুলেছে এলোকেশীকে।

এলোকেশী যেন মায়ারাজ্য থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও ও কেতু—শোন আমার কথা। আমায় উদ্ধার করো—

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে কেতুচরণ প্রশ্ন করে, তোমায় আটকে রেখেছে?

তা নয় ঠিক—দুর্লভের ভয়ে লুকিয়ে আছি। শুধু দুর্লভ কেন —বাপ-বেটা দুটোরই ভয়ে। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। বাপ ঠেঙানি দেয় আর ছেলেটাও এই দেখ—দুধ খাওয়াতে গিয়াছিলাম—কচ করে আঙুল কামড়ে দিয়েছে! কামটের মতো দাঁতের ধার। রাতে ঘুম নেই, দিনে সোয়াস্তি নেই। পঞ্চাশ বার বিছানা বদলাতে হয়। ঐরকম দাসীবৃত্তি পোষাবে না আমার দ্বারা।

কেতু রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল এলোকেশীর মুখের দিকে। রাত্রিবেলা ভাল ঠাহর হয় না। এলোকেশী বলতে লাগল, তোমাকে সেই বলেছিলাম তো—তার আগেই সুকুমারের নৌকো গিয়ে পড়ল। তিলার্ধ তিষ্ঠোতে পারছিলাম না ওদের জ্বালায়। যেখানে হোক না পালিয়ে উপায় ছিল না। তাই চলে এসেছি।

—দুর্লভের চর খুব খবরাখবর নিয়ে বেড়াচ্ছে শুনতে পাই। খপ্পরে পেলে এবার জবর আটকান আটকাবে কেতু, তুমি নিয়ে যাও আমায় এখান থেকে।

কেতু উদাস ভাবে বলে, ভালই তো আছ রায়বাবুর কাছে। আবার ছটফটানি কেন?

উনি মানুষ নাকি? গাছপালার সামিল। সুকুমার লোভ দেখিয়েছিল—কলকাতায় যাবার লোভে বেরিয়ে এলাম। তা সে পালিয়ে গেল। শহুরে ঠক—যাবার দিন সন্ধ্যেবেলাও একটা কথা বলে নি আমায়।—বাঁচাও আমায় কেতু, চিরজন্ম জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারব না।

বিরক্ত স্বরে কেতুচরণ বলে, সুকুমার নেই বলে ঘুরে ফিরে আমার উপর নেক-নজর। কিন্তু আমি তো কলকাতায় নিয়ে রাখতে পারব না।

চাইনে যেতে। যেখানে রাখবে, সেই আমার গয়া-কাশী-বৃন্দাবন। যদি গাছতলায় রাখো, সে-ও স্বীকার—

সুর বদলে আবার বলল, গাছতলায় থাকতে যাব কেন? একেবারে খালি হাতে আসি নি—

কেতু বলে, তা জানি। দুর্লভ আমায় বলেছে।

বলে ফিক্-ফিক করে সে হাসে।

এলোকেশী বলে, হাসছ কেন?

এক খেলা আর কতবার আমায় দিয়ে খেলাবে?

আমার হাজার দোষ। ঘাট মানছি। সেসব মনে গেঁথে রেখো না কেতু। রায়বাবুও বিদায় হয়ে যাচ্ছে। পিরথিমে আমার কেউ নেই। তুমি ছাড়া আর কার মুখে তাকাব, বলো?

তার পা জড়িয়ে ধরল।

কেতু নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে। এলোকেশীর পায়ে ধরাটা বুঝি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করল খানিকক্ষণ।

ওঠো দেখনহাসি—

একটা কিছু বলো—নয়তো উঠব না, মাথা খুঁড়ে মরব এখানে।

ভাল রে ভাল! এখনই নিয়ে যাই কোথায়? ওঠো—ভেবে-চিন্তে যা-হোক কিছু করা যাবে।

ফাঁকি দিচ্ছ না?

নিজের কথা ভেবে বললে বুঝি এলোকেশী?

এলোকেশী উন্মাদিনীর মতো মাথা ঠোকে মাটির উপর, চুল টানে দু-হাত দিয়ে।

কেতুচরণ বলে, ওঠো—ঠাণ্ডা হও। দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই আসব—এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, কবে আসি নি বলো তো? তোমার ব্যাপারে কোনদিন কি ফাঁকি দিয়েছি? বলো।

চোখ মুছে এলোকেশী উঠল। কেতুর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছে।

রাত্তিরবেলা এসো। জানাজানির ভয়ে দিনমানে ঘরের বের হই নে। দেখে যাও—এই ঘরে থাকি আমি। পাইক-দরোয়ান কেউ থাকে না আজকাল কাছারি, সোজা এসে দরজায় টোকা দিও।

হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে কেতুচরণকে সে ঘর দেখিয়ে দিল।

জলকাদার ভিতর দিয়ে এতটা পথ চলে এলো, পায়ে তবু কোমল ছোঁয়া লেগে রয়েছে। এলোকেশী কেতুর পা জড়িয়ে

ধরেছিল। বনবাসী সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সংসার যেন পা বেঁধে ফেলল। ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়েছে দু-পায়ে—ঝাড়া দিলেও যায় না।....কে ?

ছুটছিল লোকটা—পাশ কাটিয়ে সরে পড়বার মতলবে ছিল। সন্দেহবশে কেতু তাকে আটকে ফেলে হাত চেপে ধরল। হাত ছেড়ে দিল তখনই।

দয়াময় ইদিকে কোন কাজে ? মঙ্গলবারের এখনো তো চার দিন দেরি।

দুর্লভ বলে, মন আনচান করে উঠল রে! ছেলে হল কিনা অপত্য—অপথ্য-কুপথ্য—বুকের নাড়ি টনটনিয়ে ওঠে। সেই যে অসুখ শুনে গিয়েছিলাম—সেরেছে ? কেমন আছে আজকে ?

দুর্লভকে বলে দেবে নাকি এলোকেশীর খবর—এলোকেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেই কথা ? না—কেতু তার চিরকালের সাধ মেটাবে ঘর বেঁধে ঘরণী নিয়ে ?

সহসা গোল-পাঁচু ও গুলি-পাঁচু এদিকে দৌড়ে এল। হাতে এক-এক লাঠি। গোল-পাঁচু গর্জন করে ওঠে, রাত বিরেতে আর কখনো যদি মৌভোগের পারে দেখতে পাই, মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো—এই তোমায় বলে দিচ্ছি দুর্লভ।

খাল অদূরে—দুর্লভের ডিঙি সেখানে। ডিঙিতে তার লোকজন রয়েছে। সেই সাহসে দুর্লভ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে—

কেন রে ? মৌভোগে তোদের বাপের তালুক ? হাট বসিয়েছে —রাতে দিনে যখন খুশি এসে হাট-বাজার করব।

গুলি-পাঁচু বলে, বাড়ির উঠোন-হাতনেয় তো আর হাট নয়—।

গোলমাল শুনে দুর্লভের ডিঙি থেকে একজন-দুজন করে নেমে

আসছে। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে দুর্লভ বলে, সে-ও হাটেরই একটা দোকান। দোকানে চাল-ডাল, নুন-তেল বেচে, আতরবালাও বেচে—কি বেচে রে?

হি-হি করে হাসতে লাগল। এলোকেশী নেই—বাসা শূন্য। দুর্লভ একেবারে বেপরোয়া। বলে, উঠোন-হাতনেয় কি বলিস—মন করলে কড়ি গুনে দিয়ে ঘরের মাচায় উঠে বসতে পারি। সেটা অবিশ্যি প্রবৃত্তিতে আসবে না।

গোল-পাঁচুর মুখ চূন হয়ে গেছে। খুশাল তাড়াতাড়ি এসে মধ্যস্থ হয়।

আঃ, কি লাগালে তোমরা? ডিঙির মাঝের কাঁধে হাত দিয়ে বলে, যাও বাপধনেরা, ঠাণ্ডা হয়ে নৌকোয় ওঠোগে। এখানে হাঙ্গামা হতে দেবো না। আমার সায়েরের নাম খারাপ হয়ে যাবে।

গোল-পাঁচু বলে, ছেলে আজকেই দিয়ে দাও কেতু-ভাই। মঙ্গলবার বলে কি কথা? দেখি, তারপর কোন্ ছুতোয় মৌভোগে আসে!

তা দিয়ে দে—ভালই তো! তবে—

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে দুর্লভ বলে, টাকাকড়ি নিয়ে আসি নি। একশ টাকা কে গাঁটে করে বেড়ায়? টাকাটা আজ বাকি থাকবে।

কেতু বলল, একশ টাকায় কিন্তু হবে না। আগে-ভাগে বলে দিচ্ছি।

সকলে আশ্চর্য হয়ে গেছে। দুই পাঁচু ও খুশাল অবধি।

ছেলে তো এদ্দিন পোষবার কথা নয় হালদার মশায়। তার কোন একটা বিবেচনা হবে না?

দুর্লভ জ্বলে উঠল।

টাকা মাটির চাড়া—উ? এক পয়সাও দেবো না—দেখি, কি করিস। ছেলে আটকে রাখবি? কর্ না তাই। ঘুঘু দেখেছিস, ফাঁদ দেখিস নি। খুলনে গিয়ে এক নম্বর ফৌজদারি ঠুকে দিয়ে ঘরে শুয়ে থাকব—পুলিশ দলসুদ্ধ পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ছেলে আমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নৌকার লোকগুলো হাঁকডাক করে, তার কি দরকার? হুকুম দেন হুজুর, ছেলে এক্ষুনি নৌকোয় নিয়ে তুলি। কোন্ শালা কি করতে পারে দেখি। মামলা করতে হয়—ওরাই করুকগে।

কেতুচরণ চারিদিকে তাকায়। মাত্র চারজন তারা। এমন দিনে ঋষিবরটাও কোথায় বেরিয়েছে। উমেশ আছে অবশ্য রান্নাঘরের মধ্যে—কিন্তু সে মানুষ ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

খুশাল মাঝে পড়ে থামিয়ে দিল। যা গতিক—ছেলে জোর করে যদি নৌকায় তোলে, ঐ একশখানি টাকাও তো মাটি!

আপনি আসবেন বাবু মঙ্গলবারে। যা কথা ছিল—একশই নিয়ে আসবেন। আমি দায়িক থাকলাম। যান, নৌকোয় উঠুন গে। হুটকো মরদ—জ্ঞান-বোধ নেই—এদের কথায় কান দেবেন না। এরা কি কথা বলতে জানে ভদ্দরলোকের সঙ্গে?

ডিঙি চলে গেল, গোল-পাঁচু তার পরেও গজর-গজর করছে। ভদ্দোরলোক না কচু! কাঁথায় আগুন ভদ্দোরের! ঘুরঘুর করে পাক দিয়ে বেড়ায়। আর একদিন যদি দেখতে পাই—

গোলমাল মিটে গেলে কেতু এসে ঘরে ঢুকল। না ছেলে, না উমেশ—কেউ নেই কোনদিকে। গেল কোথায়? খুশাল, গুলি-

পাঁচু, গোল-পাঁচু সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলতে পারে না। এদিক-ওদিক অনেক দূর ঘুরে এসে দেখল, উমেশ ফিরেছে—ঘরের মেঝেয় যথারীতি ছেলে নিয়ে বসে আছে। হাত বুলাচ্ছে সে ছেলের গায়ে।

কোথায় গিয়েছিলে ?

কেড়ে-কুড়ে নিয়ে যাবে—তাই আমি উই হোদোবনের ভিতরে গুড়ি মেরে বসেছিলাম। মশায় বাছার অর্ধেক রক্ত শুষে খেয়েছে, গায়ে চাকা-চাকা দাগ হয়েছে এই দেখ।

কেতুচরণ তাড়াতাড়ি তেলের ভাঁড় নিয়ে এল। তেল মাখাতে বসবে সে। মশার জ্বলুনি থাকবে না, আর তৈলাক্ত দেহে মশায় কামড়াবেও না। নরম হাতে সে বেশ তেল মাখাতে পারে এখন।

ছেলে আরামে চোখ বুজল।

৪১

টিপিটিপি কাছারিবাড়ি ঢুকে কেতুচরণ দরজায় টোকা দিল। এলোকেশী জেগে ছিল—দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখে।

এসে গেছ ? দাঁড়াও—

এক লহমার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। লম্বা ঘোমটা টানা—তার উপর আলোয়ান জড়িয়েছে সর্বাঙ্গে। ক্যাশবাক্সটা বুকের খাঁজে বাঁ-হাত দিয়ে চেপে নিয়েছে। ক্যাশবাক্সর ভিতর সকল সঞ্চয়। রায়বাবুর দেওয়া গয়নাগুলোও এর মধ্যে।

শুক্লাষ্টমী। চাঁদ ডুবে গেছে—তারার ক্ষীণ আলো। চলেছে

দু-জনে—একটি কথা নেই। পাছে লোকের নজরে পড়ে সেজন্য উপর দিয়ে নয়,—বাঁধের আড়াল দিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ ধরে এমনি চলল তারা। চলেছে তো চলেছে।

গা ছমছম করে ওঠে এলোকেশীর। কেতুর ভাবভঙ্গি ভাল লাগে না। সেদিন থেকেই এই রকম দেখছে। যেন অনেক দূরের মানুষ, অচেনা মানুষ। অনেক কাল আগে যে কেতু একদা তার বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল, কিংবা এই সেদিনও যে তাকে নৌকায় করে মেলা থেকে মর্জাল-স্টেশন পৌঁছে দিয়েছিল—এ যেন সে মানুষ নয়। আগাগোড়া বদলে গেছে—কিসে বদলাল এমন?

একবার থমকে দাঁড়ায়—ইতস্তত করে, আর যাবে কিংবা যাবে না এর সঙ্গে।

ডাকল, কেতুচরণ!

মনে ভাবল, ডাকছে নাম ধরে—কিন্তু অস্পষ্ট একরকম আওয়াজ বেরুল। স্বপ্নের ঘোরে মানুষের যেমন হয়।

কেতু পিছন ফিরে তাকাল। মুহূর্তকাল থামাল গতি। জবাব দিল না। ডাকলেও সাড়া দেয় না—এ কোন রীতি? একনজর চেয়ে কেতু আবার চলেছে। অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধা আছে এলোকেশী। সে-ও চলতে লাগল।

বুকের ভিতর এলোকেশীর কি-রকম করছে। এমনও হতে পারে, কেতুচরণ মরে গেছে ইতিমধ্যে। মরে ভূত হয়ে এসেছে। এলোকেশী অন্ধবিশ্বাসে বেরিয়ে পড়েছে—আর সে তাকে নিয়ে চলেছে নিয়তির নিবিড়তম গহ্বরে। কত দূরে পুরন্দর—পুরন্দরের খাঁড়ি? সদ্য মেরামত-করা নীলপানসি আজ সন্ধ্যার পরে সে

নাকি চুপি-চুপি সরিয়ে খাঁড়ির মধ্যে রেখে এসেছে। সেই পানসিতে পালাবে।

পথ মোটে ফুরোয় না—যত চলছে পথ যেন বেশি হয়ে যাচ্ছে মায়ামন্ত্রে। ওদিকটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা চর, এখানে ধান-জমি—মাঝখানে বিসর্পিল বাঁধ অন্ধকারের মধ্যে অনন্ত দীর্ঘ অজগরের মতো পড়ে আছে। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এলোকেশীর। অথচ এই সমস্ত পথে কতবার চলেছে। হেঁটে নয়—বুঝি নেচে চলত মতিরাম সাধুর মেয়ে সেকালের এলোকেশী দেখনহাসি। বনবিবিতলায় পুজোর দিন কেতুর কাছ থেকে এই সব মাঠ-জঙ্গল ভেঙে সে ছুটেছিল এমনি রাত্তিরবেলা। গাঙে আসতে এত সময় তো লাগবার কথা নয়!

অবশেষে এসে পৌঁছল বাঁকের মুখে। হেঁতাল ও ওড়ার জঙ্গল; তার ওদিক শ্মশান। ভাঙা কলসি ও আধ-পোড়া কাঠ পড়ে আছে। কেতুচরণ সেই দিকে চলল। মতলব কি, নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? কাঁদো-কাঁদো হয়ে এলোকেশী বলে, হাঁটতে পারছি নে। কদ্দূর গো?

কেতুচরণ আঙুল তুলে দেখাল। ঝোপের মধ্যে জোয়ারের জল উঠেছে—নীল-পানসি সেখানে অল্প অল্প দুলছে ঢেউয়ের তাড়নায়। আঙুল দিয়ে দেখাল—নইলে সহজে কেউ ঠাহর করতে পারবে না, নৌকা রয়েছে ওর মধ্যে।

বাঁচা গেল! এলোকেশীর মনে এতক্ষণে ভরসা এসেছে।

উহুঁ, কামরায় ঢুকছ কেন? খাটতে হবে। হালে গিয়ে বোসো—

অদ্ভুত গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আজকে যেন সবই অদ্ভুত কেতুচরণের।

এলোকেশী ভাল বুঝতে পারে না। কেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শুনতে পাচ্ছ না? কাড়ালে বসে হাল ধরোগে। জমিদারের ভাত খেয়ে ভুলে মেরেছ নাকি?

সেই ছবি! মোহনার মুখে উলটোপালট ঢেউ। ডিঙি এপাশ-ওপাশ করছিল। এলোকেশী হালে বসে—তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত দৃষ্টি, কিন্তু অচঞ্চল। আঁচল কোমরে ফেরতা দিয়ে বাঁধা। ডিঙি যদি ডুবে যায়, জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সাঁতরে গাঙ-খাল পাড়ি দেওয়া বেশি কথা কি—কাপড় ভিজে যাবে, এই জন্য যা একটু দ্বিধা।

এলোকেশী হেসে উঠে আবহাওয়া লঘু করতে চায়।

তুমি কি করবে, কেতুচরণ? আমি হাল বাইব, আর বাদাম তুলে তুমি বুঝি তামাক টানবে বসে বসে?

বাতাস থাকলে তো তাই হত। এতটুকু বাতাসে এত উজান কাটানো যাবে না।

এলোকেশীও সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে, তবে? হাল ঠেলেও যাওয়া যাবে না এই উজানে। আমি পেরে উঠব না। গায়ে কি সে জোর আছে? বয়স হয় নি? বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নে?

কেতু গাঙের অবস্থা নজর করে দেখে বলল, বলেছ ঠিক। নৌকো ঠিক রাখা শক্ত—টানের সঙ্গে ছুটে না বেরোয়! আচ্ছা, ধরো তো হাল—আমি গুণ টানব।

অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে এলোকেশী শিউরে উঠল।

বলো কি?

কাদা মেখে আর বেকুবি করছি নে। সেয়ানা হয়ে গেছি। ডাঙায় ডাঙায় চলব। হি-হি-হি—

কেতুচরণ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

আবার বলে, উঃ—কতবার তোমায় বওয়াবয়ি করলাম, বলো দিকি দেখনহাসি?

এই শেষ বার—

হ্যাঁ—শেষ এইবার। আর নয়।

গুণের রশি খুলতে খুলতে কেতুচরণ ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। এলোকেশী সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, তুমি পাগল নাকি? এই রাত্রে বাদায় বাদায় দড়ি টেনে চলবে—সাপখোপের ভয় আছে, বড়-হরিণও সামনে পড়ে যেতে পারে।

বাদাবনের বাঘ হল কেতুচরণ। হরিণ তার সামনে আসবে কোন্ সাহসে?

আদিখ্যেতা রাখো। ঢের হয়েছে।

এলোকেশী তাড়া দিয়ে উঠল। তার বুক কাঁপে। বলে কি? বাদারাজ্যে বাঘের নাম না করে বড়-হরিণ, বড়-শিয়াল, বড়-মিঞা, ভোঁদড়—এই সমস্ত বলে। বহুপ্রচলিত বড়-হরিণ কথা না বোঝার ভান করে কেতু স্পষ্ট কিনা রাত্রিবেলা জঙ্গলের মধ্যে সেই নিষিদ্ধ নাম উচ্চারণ করে বসল! এটা বাহাদুরি—কেতুর জীবনের অসংখ্য দুঃসাহসিকতার মধ্যে এটি অন্যতম।

হিত-কথা শুনে কৌতুক করে, ভয়-ভাবনা বা জীবনের মমতা নেই—সেই মানুষকে নিয়ে পারবে কে? এলোকেশী হালে বসে আছে, কেতুচরণ গুণ টেনে গাঙের কূলে কূলে যাচ্ছে। চলেছে—কতক্ষণ চলেছে এমনি ভাবে। জঙ্গল এখানে নদীজলের মধ্যে অনেকদূর অবধি নেমে গেছে। সর-সর আওয়াজে জঙ্গল মাথা

নোয়াচ্ছে পানসির সামনে। কোন দিকে একটি প্রাণীর সাড়া নেই, ঝিঁঝিরাও ডাক বন্ধ করেছে বুঝি।

এলোকেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—কি ভাবছিল, কে জানে! ঝুপসি জঙ্গল। হঠাৎ যেন মানুষের গলায় কথা বলে উঠল, মাল তুলে নাও কেতু—

ও কি?

এলোকেশীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। স্বর বেরুল কান্নার মতো। কেতুচরণ থেমে দাঁড়িয়েছে। দড়ির টান বন্ধ হয়ে নীল-পানসিও থেমেছে অনতিদূরে।

একখানা ডিঙি—কেতুদেরই সেই ডিঙিখানা জঙ্গল ভেঙে ঠেলতে ঠেলতে ডাঙায় এনে লাগাল। গোল-পাঁচু ও গুলি-পাঁচু ডিঙি থেকে নেমে চলে আসে কেতুর কাছে। ফিস-ফিস কথাবার্তা একটু—তারপর তিন জনের ছ-খানা হাত মিলে গুণের দড়ি টেনে টেনে পানসি অতি-দ্রুত পাড়ে নিয়ে আসছে। এলোকেশী আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, ও কি? জঙ্গলের ভিতর নিচ্ছ কেন? কি মতলব তোমাদের?

হাল আড় করে ধরে সর্বশক্তিতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু পেরে উঠবে কেন তিন মরদের গায়ের জোরে? কেতুচরণ বলে, কি হয়েছে? অমন করো কেন? একটা মাল তুলে নিয়ে এক্ষুনি আবার ছেড়ে দেবো।

কি মাল?

চোখেই দেখো—ফুর্তি হবে। কত বার তো কত জায়গায় নিয়ে গেলাম—আজকে এমন ভয় পাচ্ছ কেন দেখনহাসি?

কিন্তু এতকাল যাকে দেখে আসছে, আজকে কেতুচরণ সে

মানুষ নয়। বাদাবনের কেতু আর একলোকে চলে গিয়েছে। এই সর্বপ্রথম-দেখা একেবারে অপরিচয়ের কেতুচরণ।

পানসি ডিঙির পাশে চলে এল! দুই পাঁচু মুখ-বাঁধা বস্তার দু-পাশ ধরে তুলে দিল পানসির গলুয়ের দিকটায়। হাল ঘুরিয়ে এলোকেশী আবার মাঝ-গাঙে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণে প্রাণ ফিরে এসেছে দেহে।

আবার চলেছে নীল-পানসি। নদীকূল ফাঁকা-ফাঁকা এদিকটায়। ক্ষীণ আলোয় কেতুচরণ তেমনি মন্থর অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছে। সারি সারি গোলঝাড়—সেই গোলবনের কিনারে এসে পড়ল। কখনো ছায়ান্ধকারে একেবারে বিলুপ্ত হচ্ছে, কখনো আবার ফাঁকায় আসছে। হঠাৎ এলোকেশী লক্ষ্য করল, দড়ির টান নেই। গুণের দড়ি জলের ভিতর পড়েছে, শুধু হালের জোরে অত-বড় পানসি এগুতে পারছে না।

কি হল? টানছ না কেন কেতু?

গোলঝাড়ের আড়াল থেকে জবাব আসে, দড়ি হাত ফসকে পড়ে গেছে।

এলোকেশী বলে, পাড়ে লাগাচ্ছি। ধরে নাও।

আমি পারব না।

না পারো, উঠে এসো। দাঁড় ধরো—যা এক-আধ রশি যাওয়া যায়। একটু ভাল জায়গা পেলে চাপান দেবে।

হঠাৎ স্ফূর্তির প্রবাহ এসে যায় শুকনো গলায়। বলে, সেই ভাল কেতু। অনেকটা তো আসা গেল! গোন এলে তখন ছাড়া যাবে। ততক্ষণ গল্পগুজবে কাটিয়ে দিই। তুমি নৌকোয় এসো।

ভয়াল উচ্চ কণ্ঠ দূর থেকে আদেশের মতো শোনা যায়, খালে

ঢুকে পড়ো—গোন পেয়ে যাবে। বিষখালি ঐ সামনে। বিষখালি থেকে পথ তোমার ভাল করে চেনা—অসুবিধা হবে না।

এলোকেশী আঁতকে ওঠে।

উঠে এসো কেতুচরণ। নৌকো লাগালাম।

লাগিয়ে কি হবে? দৌড় দেবো, ধরতে পারবে না। আর শোন—নীলপানসি ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো রায়বাবুর কাছে। পরশু ওঁরা বাদায় যাবেন। ওঁদের যাওয়া বরবাদ না হয়।

এলোকেশী ব্যাকুল স্বরে বলে, একা-একা ফেলে পালাচ্ছ? তোমার দুটি পায়ে পড়ি কেতু, এসো—চলে এসো—

একা কেন, হুলো-বেড়াল দিয়ে যাচ্ছি বস্তার মধ্যে। আর কত ধন-সম্পত্তি!

হো-হো প্রবল হাসির আওয়াজ উঠল বনান্তরালে। আওয়াজ দূরবর্তী হচ্ছে। দৌড়চ্ছে কেতুচরণ। খাল-দোখালা, জল-কাদা, কাঁটাবন—কিছু মানে না। সাপ-বাঘের ভয় নেই। গুণের দড়ি গুটিয়ে পানসির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যেন এলোকেশীর ভয়েই তীরবেগে ছুটেছে! কায়ক্লেশে এলোকেশী নৌকা হয়তো পাড়ে নিয়ে আসতে পারে—কিন্তু লাভ কি? পথচিহ্নহীন রাত্রির বাদাবনে কেতুচরণকে দৌড়ে ধরবে, তার কোন সম্ভাবনা নেই। সাপের মতন এরা পিছলে পিছলে বেড়ায়। বন্দুক ও রকমারি সাজপোশাক নিয়ে জলপুলিশের দল হানা দিয়ে এঁটে উঠতে পারে না—আর সে নিঃসহায় একলা মেয়েমানুষ বই তো নয়!

ভয়ে-ভাবনায় এলোকেশী কুক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

কেতু, কেতুচরণ—

জবাব পাওয়া গেল না।

আরও জোরে ডাকে। ঝিম-ঝিম করছে রাত, জোনাকি ঝিকমিক করছে গাছে গাছে। এতটুকু শব্দ নেই, একটা বনচর প্রাণী ডাকছে না আজকে এ সময়। হাল ধরে রাখবে—হাত একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। পানসির মুখ ঘুরে গেল। যাক—যেদিকে খুশি চলুক। ডুবে যায় তো আরও ভাল।

বাতাস উঠেছে। জোর টান আর পিঠেন বাতাস পেয়ে ছুটেছে মধু রায়ের শৌখিন নীল-পানসি। বিষখালি কোন সময় পার হয়ে এসেছে—অত খেয়াল ছিল না। দূরে সহসা আলো দেখতে পেল। মর্জাল-স্টেশনের আলো। তাই তো, ঘুরে ফিরে সেই পুরোনো জায়গায় এসে পড়ল যে!

মন্দের ভালো, যাই হোক। দুর্লভ পিটুনি দেবে—তো হোক, পিটুনির পরে আশ্রয়ও দেবে। এলোকেশীর এ সম্বন্ধে সংশয় নেই। বাদাবনে থেকে থেকে দুর্লভের রীতি-প্রকৃতি আলাদা হয়ে গেছে। পোষা জীব বেড়া ভেঙে পালালে কি করো? ভালমতো শিক্ষা দিয়ে আরও শক্ত বেড়ায় আটকাবে—তা ছাড়া উপায় কি? এবারে অনেক দিন আলাদা হয়ে আছে দুর্লভের কাছ থেকে। মর্জালের বাসার কাছাকাছি এসে দুর্লভের আদর-সোহাগের অনেক পুরানো স্মৃতি এলোকেশীর মনে উঠছে।

কি ধন-সম্পত্তি কেতুচরণ তার জন্য রেখে গেছে, নেড়ে-চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হল। পানসি কিনারে লাগাল। বস্তাটা টিপে টিপে দেখে। মানুষের মতো। মানুষ বস্তায় পুরেছে? কি সর্বনাশ, দুর্লভ হালদার যে!

দুর্লভকে দিয়ে গেল কেতুচরণ। এলোকেশীকে সে ঘৃণা করে, আর দুর্লভকেও অনাবশ্যক আবর্জনার মতো বস্তাবন্দি ফেলে দিয়ে

গেল। বস্তার পাশে বাণ্ডিলে আলাদা করে বেঁধে দিয়ে গেছে—দুর্লভের সিল্কের পাঞ্জাবি, ফুলপাড় ধুতি, শিঙের ছাতা, লপেটা জুতো। আর খেরোর থলিতে নোটে ও খুচরায় কতকগুলি। সবই যেন অস্পৃশ্য কেতুচরণদের কাছে। এলোকেশীও।

দুর্লভের মুখে কাপড়-গোঁজা—মরে গেছে? মেরে ফেলেছে তাকে? বুকে হাত দিয়ে দেখল, ধুকধুকানি আছে। বেঁচে যাবে নিশ্চয়—লোকজন ডেকে তাড়াতাড়ি বাসায় তুলে প্রাণপাত সেবায় সে ভাউত করে তুলবে। কদমতলীর জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে উঠেছে, বাদায় কতবার হিংস্র জন্তুজানোয়ারের সামনাসামনি পড়ে পালিয়ে এসেছে—এ মানুষ এত সহজে মরবে না। দুর্লভ হালদারকে মরতে দেবে না এলোকেশী।

কেতুও সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, মারা যায় নি তো রে?

গোল-পাঁচু রুষ্ট কণ্ঠে বলে, সন্দ আছে। রাক্ষসের প্রাণ একটা-দুটো তো নয়--সাতশ। তাই তো বস্তায় পুরে গাঙের নিচে দিচ্ছিলাম। কোন দিন যাতে আর কারও ঘরে উঠে পড়তে না পারে! একেবারে নিশ্চিন্ত। তা তুমি কেতুচরণ এসে পড়লে এই সময়—তোমার সাড়া পেয়ে দয়ালহরিদের দয়া উথলে উঠল।

গুলি-পাঁচু বলে, দিনক্ষণ দেখে ছেলে আর বোন নিয়ে ভাল জায়গায় আশা-সুখে যাচ্ছি—এর মধ্যে খুন-খারাপিটা কি ভাল?

হেসে উঠে বলল, রোগের খুব ভাল রকম চিকিচ্ছে হয়েছে। প্রাণে বাঁচলেও ঠ্যাং নেড়ে আর এ জন্মে ঘোরাঘুরি করতে হবে না।

কেতুচরণ তার দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু দলে জুটে তুমি চললে কোন বিবেচনায়? এখনো ভেবে দেখ—এমন জমানো মাছের ব্যবসা তোমার—

গুলি-পাঁচু নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, স্বাধীন ব্যবসার ঐ তো মজা! পাঁচ টাকা সাত আনা গাঁটে। যেখানে পুঁজি ছাড়ব, সেইখানে ব্যবসা জমবে। দেখ না, কি কাণ্ডটা করি শান্তিনগরে গিয়ে। ঘর নয়, দালান-কোঠা বানাবো।

গায়ের সমস্ত শক্তিতে টান দিল বোঠেয়। ডিঙিটা শুধু নয়—ইস্পাতের মতো দেহগুলোও যেন কড়-কড় করছে ঐ সঙ্গে। এপাশে-ওপাশে দুই পাঁচু, আর কাড়ালে কেতুচরণ।

কুড়ু-কুড়ু—অতিশয় ক্ষীণ আওয়াজ উঠছে এক-একবার ছইয়ের ওধার থেকে। কিন্তু কারো কানে পৌঁচচ্ছে না, কান দেবার অবস্থা এখন নয়।

তালে তালে ফেল বোঠে। উড়ে যাও। সাবাস!

তিন বোঠের তাড়নায় ডিঙি উড়েই চলেছে একরকম। তবু সোয়াস্তি নেই। আরও—আরও জোরে যেতে পারলে হত! বাদার সীমানা ছেড়ে তবে ঠাণ্ডা হবে।

কুড়তাং-কুড়তাং—ঢোলকের আওয়াজ উঁচু হয়েছে এক পর্দা। কেতু বলে, শুয়োরের বাচ্চা ঘুমোয় নি বুঝি?

উমেশ জবাব দেয়, না—

কান্না শুনছি নে তো?

হাসছেন, আহ্লাদ করছেন। হাসি শুনতে পাচ্ছ না?

গুলি-পাঁচু বলে, পদ্মমণির কাছে বড্ড গছে গেছে।

ওমশার চেয়ে?

তোমার চেয়েও। মেয়েলোক আর বেটাছেলেয় তফাত বোঝ মন ভোলাবার ওরা গুরুমশায়।

আচ্ছা নিমকহারাম তো! হবে না—কেমন হারামজাদার বংশ! তা তুমি বসে বসে কি করছ ওমশা?

ঢোলকের দল ছিঁড়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ ধরে বাঁধলাম বাজাবো?

শুধু বাজনা কেন—গানও ধরো ভাল দেখে। উই যে—দেখতে পাচ্ছ বনবিবিতলা? বাদা ছেড়ে চললাম—মা-জননীকে একখান গান শুনিয়ে যাও।

ঢপাঢপ—মনের সুখে উমেশ ঢোলে ঘা দিতে লাগল। গানের গৌরচন্দ্রিকা এই বাজনা! বনবিবির নাম শুনে পদ্ম ছেলে কোলে ছঁইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে এল। বনবিবিতলা দুর আছে এখান থেকে। এই খাল দিয়েই এরা বেরিয়ে পড়বে; বেশি কাছে যাওয় হবে না। যেতেও নেই—ফিরে যাওয়ার মুখে দেবীস্থানে গেলে বিপত্তি ঘটে। শুধু মুখে-মুখে বলে যেতে হয়।

কেশে উঠল একবার জ্যোৎস্নাভূষণ। কেতুচরণ চমকে ওঠে।

কিঁ, ও কি? অমন করে কেন?

উমেশ বলে, কিছু না। কেওড়ার ফুল পড়েছে। বজ্জাত আছেন তো—ফুল নিয়ে মুখের মধ্যে পুরেছিলেন।

ব্যাকুল কেতু এ-সব শুনছে না। বনবিবির কাছে মনে মনে প্রার্থনা করছে। বিষম পাপী সে। চুরি-ছ্যাঁচড়ামি অনেক করেছে। এই শেষ। কাঠ-চুরি, নৌকা-চুরি—সর্বশেষ এই ছেলে চুরি। চিরজন্মের মতো এই একবার চুরি করে বাদা থেকে তার

বিদায় নিচ্ছে। দোহাই মা, দোষঘাট নিও না—ছেলের যেন ভালমন্দ কিছু না হয়!

আবার কৈফিয়তও তৈরি করছে।

চুরিই বা হল কি করে? এলোকেশীর অত ঘৃণা ছেলের উপর—মরে যেত ওদের কাছে থাকলে। বৈকুণ্ঠ ধরের কাছে গছিয়ে দিয়ে আসত—তার চেয়ে কেতুরা নিয়ে বিদায় হচ্ছে। দুর্লভ খুশিই হবে—মাসে মাসে খরচা পাঠাতে হবে না, উলটে মুনাফা হয়ে যাচ্ছে তার। দু-শ টাকার মাল এলোকেশীকে দিয়ে এই এক-শ নিয়ে যাচ্ছে। দু-শর বেশি—শুধু এলোকেশী তো নয়, ক্যাশবাক্স ভরতি গয়না ও টাকাকড়ি। সমস্ত জুড়ে গেঁথে হিসাব দেখ। দু-শর অনেক বেশি।

ছেলে সযত্নে পাটায় নামিয়ে রেখে পদ্ম বনবিবিতলার দিকে উপুড় হয়ে প্রণাম করল। উমেশ ঢোলকের উপর মাথা নোয়াল। দেখাদেখি নৌকার আর তিনজনও প্রণাম করে। ছেলের কি স্ফূর্তি হল হঠাৎ—পাটার কাঠে পা ছুঁড়ছে দুম-দুম করে। আর আঁ-আঁ করে অজানা দিব্য ভাষায় কত কি বলছে খালের ঝুঁকে-পড়া কেওড়াগাছগুলোর সঙ্গে। তারার আলো পত্রপুঞ্জের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে ছেলে ও পার্শ্ববর্তিনী পদ্মকে ঘিরে। বাতাসে ঝুর-ঝুর করে কেওড়াফুল ঝরে পড়ছে···

গগন হাসেন, পবন হাসেন, হাসেন গহীন নদী।
আর হাসেন মায়ের বালক চক্ষে নাহি নিদি॥
বনবিবি বনের মাতা হাসেন রইয়া রইয়া।
গোকুলে যান যশোমতী নীলমণিরে লইয়া॥